

Live MCQ™

৪৯তম স্পেশাল বিসিএস (শিক্ষা) বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বিষয়: দর্শন(২১১)

Compendium PDF

(সিলেবাস অনুসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও এমসিকিউ-এর সমন্বয়ে রচিত)

Mentor:

Md. Shahduduj Zaman

Lecturer, Department of Philosophy,

Joypurhat Government College.

43, 44 BCS General Education (Philosophy, Merit: 02)

মুখবন্ধ: বহু বছর পরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষার একটি স্পেশাল বিসিএস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যেখানে ১০০ নম্বরের জেনারেল অংশের সাথে ১০০ নম্বরের বিষয়ভিত্তিক অংশের mcq থাকবে। Live mcq আয়োজিত দর্শনের বিষয়ভিত্তিক অংশের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১২ টি ক্লাস ও ১৩ টি লেকচার পিডিএফ Live mcq app এ আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও ২০ টি বিষয়ভিত্তিক ও মডেল টেস্ট পরীক্ষা চলমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দর্শনের বিষয়গুলো এতটাই বিস্তৃত যে এত কম সময়ে সবগুলো টপিক পুরোপুরি কাভার করাটা কষ্টসাধ্য। তথাপি আমাদের ক্লাস, লেকচার পিডিএফ, পরীক্ষার মাধ্যমে সিলেবাসের প্রতিটা টপিকের যথাযথ ধারণা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। এই Compendium পিডিএফটিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাব টপিক সমূহ, গুরুত্বপূর্ণ ২০০+ mcq, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কলাকৌশল ও পরামর্শ যুক্ত করা হয়েছে, এছাড়াও ক্লাস লেকচারে কিছু বিষয় বাদ পড়েছিলো - সেগুলোও সংযোজন করা হয়েছে, যা আপনাদের প্রস্তুতি আরোও গোছালো করতে সহায়তা করবে। সর্বোপরি বিসিএসের মত তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষায় নিজেকে এগিয়ে রাখতে প্রস্তুতির পরিসর বিস্তৃত করাটা জরুরি। তাই যথাসম্ভব চেষ্টা করুন সিলেবাসের প্রত্যেকটা টপিকের স্বচ্ছ ধারণা রাখার।

সূচীপত্র

Contents

সিলেবাসের টপিকসমূহ :	3
Introduction :	3
Logic:	3
Epistemology:	4
Topic 04 :	27
Topics 05 :	35
Topic 06 :	43
Topic 07 :	54
Topics 08 :	63
Topics 09 :	76

✚ মুখবন্ধ

✚ পিএসসি প্রদত্ত সিলেবাসের টপিক সমূহ

✚ ধারাবাহিকভাবে টপিকসমূহের বিশ্লেষণ, গুরুত্বপূর্ণ টপিকের আলোচনা ও সোর্স প্রদান:

Topic 01 - Introduction

Topic 02- Logic

Topic 03 - Epistemology, Theories of Reality

Topic 04 - Materialism, Theories of Evolution

Topics 05- Freedom of the Will, Philosophy of Mind, Immortality of the Soul

Topic 06- Value, Truth, Philosophy of Religion

Topic 07 - Major Trends in Contemporary Western Philosophy

Topics 08 - Modern Philosophic Trends in Bangladesh, Philosophic Approach to Certain Problems of Practical Life.

Topic 09 - Moral standard, Right and Duty, Moral Pathology

Topic 10 - Individual & Society, Muslim Philosophy

Topic 11 - Indian Philosophy

✚ গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকগণের গ্রন্থসমূহের তালিকা

✚ শেষ মুহূর্তের করণীয়, পড়ার কৌশল ও পরামর্শ

✚ ২০০+ গুরুত্বপূর্ণ

সিলেবাসের টপিকসমূহ:

Introduction (পরিচিতি)

The nature ,scope , methods, and aims of Philosophy. Is Philosophy Useful in Life? Relation of Philosophy to Religion, Science and Commonsense.

দর্শনের প্রকৃতি, পরিধি, পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দর্শন কিভাবে বাস্তবিক জীবনে কার্যকর? দর্শনের সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক (ধর্ম, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান)

Logic and Epistemology:(যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্ব)

Logic:

Logic as a normative science. The nature of Deductive and Inductive arguments.

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে যুক্তিবিদ্যা। আরোহমূলক ও অবরোহমূলক যুক্তির প্রকৃতি ।

Epistemology:

What is knowledge? Theories of sources of Knowledge: Rationalism, Empiricism, Criticism (Kant) and Intuitionism. Realism and Idealism.

জ্ঞান কী? জ্ঞানের উৎস হিসেবে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, স্বজ্ঞাবাদ। বাস্তববাদ ও ভাববাদ

Theories of Reality: (সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদ)

Materialism and Idealism.(জড়বাদ ও ভাববাদ) Monism, Dualism and Pluralism.(একত্ববাদ, দ্বৈতবাদ, বহুত্ববাদ)

Theories of Evolution:(বিবর্তনবাদ)

Creation and Evolution. Types of Evolution: Mechanical(যান্ত্রিক), Teleological (উদ্দেশ্যমূলক), Emergent(উন্মেষমূলক), and Creative(সৃজনমূলক) Evolutions.

Freedom of the Will(ইচ্ছার স্বাধীনতা)

Cause, Determinism(নিয়ন্ত্রণবাদ) and Freedom.

Philosophy of Mind:(মনোদর্শন)

Mind as a spiritual substance(আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে মন), the empirical concept of the self(আত্মার অভিজ্ঞতামূলক মতবাদ), Theories of mind-body relationship.(দেহ ও মন সম্পর্কীয় মতবাদ)

Immortality of the Soul: (আত্মার অমরত্ব)

Its meanings and implications, Classical proofs for immortality, Kant's ethical proof স্বরূপ ও ব্যবহারিক তাৎপর্য, অমরত্বের চিরায়ত প্রমাণ, আত্মা বিষয়ক কান্টের নৈতিক প্রমাণ।

Value: (মূল্য)

Fact and Value, Intrinsic and Extrinsic Values, Three cardinal values: Truth, Beauty and Goodness, Subjectivity and objectivity of values.

ঘটনা এবং মূল্য, পরতঃমূল্য ও স্বতঃমূল্য। তিনটি আদর্শিক মূল্য: সত্য, শিব ও সুন্দর। মূল্যের বিষয়ীগততা ও বস্তুনিষ্ঠতা।

Truth: (সত্য)

What is truth? Three main theories of truth: Correspondence(অনুরূপতাবাদ), Coherence (সঙ্গতিবাদ) Pragmatic (প্রয়োগবাদ).

Philosophy of Religion: (ধর্মদর্শন)

What is meant by God? Three concepts about God: Pantheism(সর্বেশ্বরবাদ) Deism(দ্বীশ্বরবাদ) and Theism(আস্তিকবাদ), Proofs for God's Existence(ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণসমূহ), God and the Problem of evil (কল্যাণ ও অকল্যাণ সংক্রান্ত মতবাদ)

Major Trends in Contemporary Western Philosophy(সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের প্রধান ধারা সমূহ):

Existentialism (অস্তিত্ববাদ), Logical Positivism (যৌক্তিক দৃষ্টবাদ), Pragmatism (প্রয়োগবাদ), Neo-Idealism (নব্য ভাববাদ), Neo-Realism(নব্য বাস্তববাদ)

Intuitionism (স্বজ্ঞাবাদ) and Analytical Philosophy (বিশ্লেষণী দর্শন)

Modern Philosophic Trends in Bangladesh(বাংলাদেশের আধুনিক দর্শনের কয়েকটি ধারা):

Materialism , Idealism, Humanism, Mysticism.

বস্তুবাদ, ভাববাদ, মানবতাবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ/মরমীবাদ/অধ্যাত্মবাদ।

Philosophic Approach to Certain Problems of Practical Life(ব্যবহারিক জীবনে কিছু সমস্যার প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি)

Suicide (আত্মহত্যা) , Abortion(ঋণহত্যা) Environmental Pollution(পরিবেশ দূষণ)

Terrorism (সন্ত্রাসবাদ), Hoarding(অবৈধ মজুদকরণ), Corruption in Profession (কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতি), and Dealings with Lower Animals.(পশুর প্রতি নৈতিক আচরণ)

Moral Standard: (নৈতিক মানদণ্ড):

Evolution of moral standard.(নৈতিক মানদণ্ড /আদর্শের ক্রমবিকাশ), The nature of moral standard(নৈতিক আদর্শের স্বরূপ), Theories of moral standard: Hedonism (সুখবাদ), Perfectionism (পূর্ণতাবাদ) and Law (Categorical Imperative).(শর্তহীন আদেশ)

Right and Duty: (অধিকার ও কর্তব্য)

Mutual involvement of right and duty. Duties towards one's fellow-human beings.

অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক। অপরাপর মানব জাতির প্রতি কর্তব্য।

Moral Pathology(নৈতিক অবক্ষয়)

Wrong-doing and punishment. Main theories of punishment:(শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদ)

The Retributive Theory(প্রতিকারমূলক), the Deterrent(প্রতিরোধমূলক) Theory and the Reformatory(সংশোধনাত্মক) theory.

Individual and Society:(ব্যক্তি ও সমাজ)

Egoism(আত্মবাদ), Universalism (সর্ব স্বার্থবাদ)

Altruism(পরার্থবাদ), Justice and Beneficence.(ন্যায় ও পরোপকার)

Muslim Philosophy:

Four great medieval Muslim philosophers: Al-Farabi, IbnSina, Al-Ghazali and Ibn Rushd.

মধ্যযুগের চারজন বিখ্যাত দার্শনিক: আল ফারাবি, ইবনে সিনা, আল গাজালি এবং ইবনে রুশদ।

Modern Muslim Philosophers:

Shah Waliullah Dehlawi and Muhammad Iqbal.

আধুনিক যুগের মুসলিম দার্শনিক: শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী এবং আব্দুল্লাহ ইকবাল।

Indian Philosophy:

Buddhism, Sakhya, Naya and Vedanta Schools,

Swami Vivekananda and Aurobindo ghosh

ভারতীয় দর্শনঃ বৌদ্ধ দর্শন, সাংখ্য দর্শন, ন্যায় দর্শন, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ।

(সিলেবাসের উপর্যুক্ত টপিক গুলো ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ক্রমিক নম্বর যুক্ত করা হলো)

Topic – 01 : Introduction

The nature ,scope , methods, and aims of Philosophy. Is Philosophy Useful in Life? Relation of Philosophy to Religion, Science and Commonsense.

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- দর্শনের স্বরূপ ও সংজ্ঞা (প্রখ্যাত দার্শনিকগণের)
- থেলিসের দর্শন
- দর্শনের পরিসর/আলোচ্য বিষয়সমূহ
- দর্শনের পদ্ধতি সমূহ
- দর্শন ও বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের সম্পর্ক

সোর্স সমূহ:

- সংশ্লিষ্ট টপিকের Live mcq Lecture pdf
- দর্শনের কথা- আব্দুল বারী
- Introduction to philosophy – Jadunath Sinha

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ (Topic 01)

Philosophy & Philosopher

ইংরেজি 'Philosophy' এবং 'Philosopher' শব্দ দুটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'দর্শন' ও 'দার্শনিক'। গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস সর্বপ্রথম 'Philosophy' শব্দের ব্যবহার করেন। 'Philosophy' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Philos' এবং 'Sophia' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'Philos' শব্দের ইংরেজি অর্থ 'Loving' এবং বাংলা মানে 'অনুরাগ'। 'Sophia' শব্দের ইংরেজি অর্থ 'knowledge' এবং বাংলা মানে 'জ্ঞান'। কাজেই 'Philosophy' শব্দের ধাতুগত অর্থ হয় 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'। আবার এর অর্থ 'সত্যের প্রতি অনুরাগ' 'জ্ঞান-সন্ধান' 'সত্য-সন্ধান' ইত্যাদিও করা হয়। কাজেই 'Philosopher' বলতে আমরা বুঝি সে ব্যক্তিকে যিনি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী বা সত্যের প্রতি অনুরাগী; যিনি জ্ঞান-সন্ধানী বা সত্য-সন্ধানী।

Thales (থেলিস)

থেলিস হলেন দর্শনের জনক। জন্মগ্রহণ করেন গ্রিসের মাইলেটাসে। চারিদিকে সুবিশাল পানি দেখে এবং স্থলভাগের স্বল্পতা লক্ষ্য করে বিস্ময়ে তিনি পানিকে বিশ্বের আদিমতম ও মূল উপাদান বলে ঘোষণা করেছিলেন, যেটি পানি দর্শন নামে পরিচিত।

থেলিস সম্পর্কে যা জানা জরুরি-

- একাধারে দর্শন ও বিজ্ঞানের জনক।
- তিনি বলেছিলেন পানিই সকল কিছুর উৎস।
- সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত প্রথম ধারণা দেন।
- পৃথিবী রয়েছে এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে সমগ্র মহাবিশ্বেরই ধ্বংস নেমে আসবে। (অর্থাৎ গ্রিসে থেলিস-ই হলো ভূ-কেন্দ্রিকতা মতবাদের প্রবক্তা)

Definitions of Philosophy

- "নিত্যের এবং বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাই দর্শনের লক্ষ্য।"- প্লেটো
- "দর্শন আকস্মিক কিছু নয় অলৌকিক কিছু নয় বরং অনিবার্য ও স্বাভাবিক" - দার্শনিক পেরী "দর্শন সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি"- পলসন
- "দর্শন সাধারণ সত্যের সর্বোচ্চ ধাপের জ্ঞান"- হার্বার্ট স্পেনসার।
- ইমানুয়েল কান্ট বলেন, "দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা।"
- ফিক্টে বলেন, "দর্শন হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান।"

- “দর্শন হলো ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী একটি অনধিকৃত প্রদেশ(No mans land)”-----বার্ট্রান্ড রাসেল
- “সকল মানুষ দার্শনিক, জীবন এবং এর প্রয়োজন থেকেই উৎপত্তি হয় দর্শনের”- কানিংহাম

Scope of philosophy (দর্শনের পরিসর)

যেসব বিষয় নিয়ে দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত, সেগুলো মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো : (১) বিশ্বতত্ত্ব, (২) তত্ত্ববিদ্যা, (৩) মনোদর্শন, (৪) জ্ঞানবিদ্যা এবং (৫) মূল্যবিদ্যা বা মূল্যসম্পর্কীয় দর্শন। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology) : বিশ্বতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘কসমলজি’ শব্দটি গ্রিক শব্দ ‘কসমস’ (kosmos) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ‘কসমস’ শব্দটির অর্থ সুশৃঙ্খল বিশ্বজগত (ordered universe)। দর্শনের এই শাখায় বিশ্বজগতের পরিদৃশ্যমান দিকের অনুসন্ধান করা হয়। দর্শনের এই শাখা রূপবিজ্ঞান বা জগত দর্শন নামেও আখ্যায়িত হয়ে থাকে। বিশ্বজগত, দেশ, কাল, জড়, প্রাণ, বিশ্বজগতের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ, অর্থাৎ সৃষ্টি, বিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে এই শাখায় আলোচনা করা হয়।

তত্ত্ববিদ্যা (Ontology) : অনেকে তত্ত্ববিদ্যাকে দর্শনের প্রাণস্পন্দন বলে আখ্যায়িত করেন। বিশ্বজগতের প্রকৃত সত্তাসম্পর্কীয় আলোচনাকেই সাধারণত তত্ত্ববিদ্যা বলা হয়ে থাকে। ‘অনটলজি’ শব্দটি গ্রিক শব্দ ‘অনটজ’ (ontos) এবং ‘লগজ’ (logos) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ‘অনটজ’ শব্দটির অর্থ সত্তা এবং ‘লগজ’ শব্দটির অর্থ বিজ্ঞান। তাই ‘অনটলজি’-র অর্থ হচ্ছে সত্তাসম্পর্কীয় বিজ্ঞান (science of being)। তত্ত্ববিদ্যাকে অধিবিদ্যা (metaphysics) বা সত্তাসম্পর্কীয় দর্শন-ও (philosophy of reality) বলা হয়ে থাকে। তত্ত্ববিদ্যায় বহুত্ববাদ, দ্বৈতবাদ, একত্ববাদ, জড়বাদ, অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদ ইত্যাদির আলোচনা করা হয়ে থাকে। তত্ত্ববিদ্যায় বিশ্বজগতের আদি বা মূলসত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মনোদর্শন (Philosophy of mind) : মনোদর্শনে প্রধানত মন বা আত্মার স্বরূপ, দেহ ও মনের সম্পর্ক, ইচ্ছার স্বাধীনতা ও আত্মার অমরত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই মনোদর্শন সাম্প্রতিককালে দর্শনের একটি বিশিষ্ট শাখা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) : জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞানসম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রশ্ন, অর্থাৎ জানা বা জ্ঞান কি? জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু, জ্ঞানের ক্যাটিগরি, সত্যের মানদণ্ড ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই পদ্ধতিগত আলোচনার গুরুত্ব দর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট রয়েছে। দর্শনের এই শাখাকে পদ্ধতিবাদ-ও (methodology) বলা হয়ে থাকে।

মূল্যবিদ্যা বা মূল্যসম্পর্কীয় দর্শন (Axiology or Philosophy of values) : দর্শনের আরেকটি প্রধান শাখা হচ্ছে মূল্যবিদ্যা বা মূল্যসম্পর্কীয় দর্শন, একে মানবিদ্যা/আদর্শবিদ্যাও বলা হয়। জগত ও জীবনের মূল্যাবধারণ করতে গিয়ে দর্শনে মূল্য বা আদর্শ কি, মূল্যের স্বরূপ কি, মূল্য ব্যক্তিগত, না বস্তুগত, মূল্য ও সত্তার সম্পর্ক কি, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে কোন যুক্তি দেয়া যায় কি, জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি, ঈশ্বরের ধারণা বলতে কি বুঝা যায়, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল বলতে কি বুঝা যায়, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্মীয় মূল্য, নৈতিক মূল্য, সৌন্দর্যগত মূল্য ইত্যাদি মূল্য নিয়ে মূল্যবিদ্যায় আলোচনা করা হয়।

Methods of philosophy :

দর্শনের ইতিহাস পাঠ থেকে আমরা যে কয়টি প্রধান পদ্ধতির উল্লেখ করতে পারি সেগুলো হলো- ১. নির্বিচারবাদী পদ্ধতি ২. বিচারবাদী পদ্ধতি ৩. সংশয়বাদী পদ্ধতি ৪. দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি

নির্বিচারবাদ (Dogmatism)

জ্ঞানের উৎপত্তি, শর্ত, সীমা ও বৈধতা সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন না তুলে বরং পূর্ববর্তী কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে নির্বিচারে দার্শনিক সমস্যাবলির সমাধানের প্রয়াস পায় তাকে তাকে হয় নির্বিচারবাদ। এ পদ্ধতির মূলে যে তিনটি বিষয় কাজ করে তাহলে- অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পূর্ব পরিকল্পিত ধারণা।

সংশয়বাদী পদ্ধতি (Scepticism)

আমরা জানি সন্দেহ বা সংশয় থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রীসের গ্রীকিং সম্প্রদায় থেকে শুরু করে আধুনিক কালের দার্শনিক রেনে দেকার্ত, অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক এবং ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউমের দর্শন সংশয়বাদদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংশয়বাদদের মূলকথা হলো কোন ধরনের বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই জ্ঞানের অসারতার প্রতিপাদন করা। এক্ষেত্রে নির্বিচারবাদের সাথে সংশয়বাদের পার্থক্য হলো নির্বিচারবাদ কোন বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ছাড়াই জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করে প্রতিপন্ন করে, এবং সংশয়বাদীরা বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই জ্ঞানের অসারতা প্রতিপন্ন করে। দুটি পদ্ধতিই জ্ঞান উৎপত্তির জন্য ব্যর্থ পদ্ধতি।

বিচারবাদী পদ্ধতি (Criticism or Critical Theory)

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এই বিচারবাদের প্রধান প্রবর্তক। তিনি নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদের ত্রুটি দূর করে সমন্বয় করার চেষ্টা করেন। তার মতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দুটোই প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপকরণ দেয়, আর বুদ্ধি দেয় জ্ঞানের আকার। সুতরাং জ্ঞানের উপকরণ আসে বস্তু থেকে আর আকার আসে ব্যক্তি থেকে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে জ্ঞান হয়। অতীন্দ্রিয় বিষয় (ঈশ্বর, আত্মা) কখনই অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়না তাই এদের জ্ঞান হয়না।

দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি (Dialectic method)

দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি হিসেবে দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিকে একটি অন্যতম পদ্ধতি। কেননা এর মাধ্যমে যথার্থ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিটি মূলত জার্মান দার্শনিক হেগেলের নামের সাথে সর্বাধিক সূত্র। তার মধ্যে আমাদের যাবতীয় চিন্তা দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। দ্বন্দ্বিক পদ্ধতির কাজই হলো পরস্পর বিরোধী ধারণাগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। হেগেলের মতানুসারে দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ রয়েছে যেমনঃ বাদ (Thesis), প্রতিবাদ (Antithesis) এবং সমন্বয় (Synthesis)। একে বলা হয় দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ার ত্রয়ী (Triad)। হেগেলের মতে দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি কেবল মাত্র চিন্তার পদ্ধতিই নয়, এটি সমস্ত জগতের পদ্ধতিও। তার মতে জড় জগৎ, ইতিহাস, জীবগু, নীতি, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই ক্রমোন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটেছে এই দ্বন্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে। বলা যায় দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিই জগতের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম কারণ। ইতিহাসে এ দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়া “হেগেলীয়ান দ্বন্দ্বিক” (Hegelian Dialectic) পদ্ধতি নামে সুপরিচিত।

এখানেই এই একই পদ্ধতি গ্রীক দার্শনিক সফ্রেটিসেরও প্রয়োগ করতে দেখা যায় নৈর্ব্যক্তিকভাবে। সফ্রেটিস এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তৎকালীন সফিস্টদের খণ্ডন করতেন। এ পদ্ধতিতে তিনি এতোটাই গুরুত্বারোপ করেন যে, এটি ‘সফ্রেটিস পদ্ধতি’ (Socratic Method) নামেও সমধিক পরিচিতি লাভ করে। সফ্রেটিসের মতবাদের বিরোধিতা করে তা খণ্ডন করার এ প্রক্রিয়া হলো নেতিবাচক দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি। আর সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা হচ্ছে ইতিবাচক দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দ্বন্দ্বিকতা বা দ্বন্দ্বিক ও পদ্ধতি দুই ধরনেরই

১. নেতিবাচক দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি ও ২. ইতিবাচক দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি।

বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি (Analytic Method)

সনাতনী দর্শনের স্বরূপ, পদ্ধতি ও প্রকৃতি নিয়ে সমালোচনা ও বিরোধিতা করে সমকালীন দার্শনিকগণ বলেন বিশ্লেষণই দার্শনিক সমস্যাবলির আলোচনার আসল পদ্ধতি। বিশ্লেষণধর্মী দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করেন যথার্থ জ্ঞান অন্বেষণই যদি দর্শনের কাজ হয় তবে দর্শনের আলোচনায় অবশ্যই বিশ্লেষণের সাহায্যে নিতে হবে এবং তারা দার্শনিক সমস্যাবলির সমাধান যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করতে প্রয়াস পান। সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী দার্শনিক মূলত ভাষার সাধারণ ব্যবহার, অর্থাৎ ভাষা বিশ্লেষণ এবং শব্দ ও ধারণার বিশ্লেষণের উপরেও গুরুত্বারোপ করেন। ভিটগেনস্টাইন, মার্সেলিক, এ. জে. এয়ার প্রমুখ।

Topic 02 – Logic :

Logic as a normative science. The nature of Deductive and Inductive arguments.

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- যুক্তিবিদ্যার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- যুক্তি ও যুক্তিবাক্য (গঠন, প্রকারভেদ)

- আরোহ ও অবরোহ যুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য
- আরোহ ও অবরোহ যুক্তির প্রকারভেদ, প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ
- সহানুমান ও অনুপপত্তি

সোর্স সমূহ:

- সংশ্লিষ্ট টপিকের Live mcq Lecture pdf
- উচ্চ মাধ্যমিক যুক্তিবিদ্যা (১ম পত্র)

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ (Topic 02)

What is Logic?

যুক্তিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Logic শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে গ্রিক শব্দ Logike/Logos হতে। Logos অর্থ হলো চিন্তা বা শব্দ বা ভাষা। তাই উৎপত্তিগতভাবে যুক্তিবিদ্যাকে ভাষায় প্রকাশিত চিন্তার আলোচনা বলা হয়। আক্ষরিক অর্থে বাংলায় যুক্তিবিদ্যা বলতে আমরা বুঝি যুক্তির বিদ্যা বা যুক্তি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। অর্থাৎ যে বিষয় পড়াশুনা করলে যুক্তি ও যুক্তির নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায় তাই যুক্তিবিদ্যা।

যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Logic) : যুক্তিবিদ এল.এস. স্টেবিং তাঁর A Modern Introduction to Logic বইয়ের শুরুতে বলেন, “সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রশস্ততম অর্থে যুক্তিবিদ্যা অনুধ্যানমূলক চিন্তার সাথে সম্পর্কিত।” (Logic, is the most usual and widest sense of the word, is concerned with reflective thinking. p-01)

কোহেন ও নেগেল তাঁদের An Introduction to Logic and Scientific Method গ্রন্থে বলেন, “যুক্তিবিদ্যাকে প্রতিপাদন বা বৈধ অনুমানের বিজ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।” (Logic may be defined as the science of implication or of valid inference. P-13)

হাওয়ার্ড কোহেন তাঁর Logic and Philosophy বইয়ে যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেন, “যুক্তিবিদ্যা সঠিক (বৈধ) ও অসঠিক (অবৈধ) যুক্তির মধ্যে পার্থক্য করণের চেষ্টা করে।” (Logic attempts to distinguish between correct (valid) and incorrect (invalid) arguments. P-2)

মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবী যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেন, “সত্য থেকে মিথ্যা পার্থক্যকরণের উপকরণ হলো যুক্তিবিদ্যা।” (The study of logic is an instrument to distinguish the true from the false.)

যুক্তিবিদ মিলের মতে, “যুক্তিবিদ্যা হলো এমন বিজ্ঞান যা বিচার বা প্রমাণের মাধ্যমে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক ক্রিয়ার সহায়ক মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে।”

যুক্তিবিদ কপি ও কোহেন তাঁদের Introduction to Logic বইয়ে যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, “যুক্তিবিদ্যা হলো যথার্থ যুক্তি থেকে অযথার্থ যুক্তি পার্থক্য করার সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ও নীতিমালা বিষয়ক বিদ্যা।” (Logic is the study of the methods and principles used to distinguish good (correct) from bad (incorrect) reasoning. p-03)

Logic as normative science (আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে যুক্তিবিদ্যা)

বিষয়বস্তুকে আলোচনা করার পদ্ধতির ভিত্তিতে বিষয় দু'রকম হয়। এক, বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, দুই, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। বস্তুর স্বরূপের নিছক বর্ণনা প্রদান বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানের কাজ। আর আদর্শের দিকে লক্ষ রেখে কোনো বিষয়ের আকার কেমন হওয়া উচিত তার নির্দেশ প্রদান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের কাজ। বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বর্ণনামূলক (descriptive); আর আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান মূল্যায়নমূলক (evaluative)। যুক্তিবিদদের মতে, যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। কারণ, যুক্তিবিদ্যা সত্যের আদর্শকে সামনে রেখে মানুষের চিন্তার বৈধতা ও যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করে। যুক্তিবিদ্যার তাত্ত্বিক দিকের উপরে গুরুত্ব দিয়ে যোসেফ, টমসন, হ্যামিলটন প্রমুখ যুক্তিবিদ্যাকে বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অন্যদিকে অ্যালড্রিচ ও তার অনুসারীরা একে কলাবিদ্যা বলেছেন। আর এই দুই চরম মতের সমন্বয় করে যুক্তিবিদ মিল ও হোয়েটলি যুক্তিবিদ্যাকে একই সাথে বিজ্ঞান ও কলা -উভয়রূপে চিহ্নিত করেছেন

যুক্তি ও যুক্তিবাক্য

একটি যুক্তিতে ব্যবহৃত বাক্যগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক. আশ্রয় বাক্য (Premise)

খ. সিদ্ধান্ত (Conclusion)

যে বাক্য বা বাক্যসমূহের উপর ভিত্তি করে কোন একটি বাক্যকে নিঃসৃত বা প্রতিপাদন করা হয় সে বাক্য বা বাক্য সমূহকে বলা হয় আশ্রয়বাক্য। যে বাক্যটি নিঃসৃত বা প্রতিপাদন করা হয় তাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত। নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ করুন :

সকল মানুষ হয় মরণশীল।

সকল শিক্ষক হয় মানুষ।

সুতরাং, সকল শিক্ষক হয় মরণশীল।

এ উদাহরণটিতে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এবং 'সকল শিক্ষক হয় মানুষ'-এ বাক্য দুটির উপর ভিত্তি করে 'সকল শিক্ষক হয় মরণশীল' বাক্যটি নিঃসৃত করা হয়েছে। এখানে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এবং 'সকল শিক্ষক হয় মানুষ' হলো আশ্রয়বাক্য এবং 'সকল শিক্ষক হয় মরণশীল' হলো সিদ্ধান্ত।

একটি যুক্তিবাক্য গঠিত হয় ৩ টি অংশ নিয়ে; যথা-

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. সংযোজক

ক. উদ্দেশ্য: কোনো যুক্তিবাক্যে কোনো পদ সম্পর্কে যা কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন- 'স্কুল শিক্ষক হন দায়িত্ববান' এবং 'কিছু সৈনিক নয় ভীরা' এ যুক্তিবাক্য দুটিতে 'শিক্ষক' ও 'সৈনিক' হলো উদ্দেশ্য।

খ. বিধেয়: কোনো যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বলে বিধেয়। যেমন- 'সকল ফুল হয় সুন্দর' এবং 'কোনো মানুষ নয় দেবতা' যুক্তিবাক্য দুটিতে 'সুন্দর' ও 'দেবতা' হলো বিধেয়।

গ. সংযোজক: যে শব্দের সাহায্যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হয় তাকে বলে সংযোজক। যেমন- 'সকল ফুল হয় সুন্দর' এবং 'কোন মানুষ নয় (হয় না) দেবতা' যুক্তিবাক্য দুটিতে 'হয়' ও 'নয়' হলো সংযোজক।

বাক্য ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য :

ক. বাক্যের একক হলো শব্দ। আর যুক্তিবাক্যের একক হলো পদ।

খ. বাক্যে মোট দুটি অংশ থাকে; উদ্দেশ্য ও বিধেয়। কিন্তু যুক্তিবাক্যের চারটি অংশ থাকে; যথা— উদ্দেশ্য, বিধেয়, সংযোজন ও পরিমাণ।

গ. একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকতে হয়; যথা- আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা। একটি যুক্তিবাক্যের আবশ্যিক গুণ হলো সত্য বা মিথ্যা হওয়ার যোগ্যতা।

ঘ. বাক্যে গুণ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। যুক্তিবাক্যে গুণ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন- 'মানুষ মরণশীল' বাক্যের যুক্তিসম্মত আকার হলো 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'।

ঙ. ব্যাকরণসম্মত বাক্যে সংযোজকটি সকল সময় উল্লিখিত হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যুক্তিবাক্যে সংযোজকটি অনিবার্যরূপে চিহ্নিত হতে হয়।

চ. ব্যাকরণে বাক্য পাঁচ রকমের হয়; কিন্তু বিবৃতিমূলক বাক্যই কেবল যুক্তিবাক্য বলে স্বীকৃত। অন্যান্য বাক্যগুলোকে যুক্তিবাক্যের কাঠামো অনুসারে রূপান্তর করলেই কেবল তাদেরকে যুক্তিবাক্য বলা যায়।

যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ :

গুণ অনুসারে ২ প্রকার:

সদর্থক : সকল কবি হয় ভাবুক

নঞর্থক : কোনো কাক নয় সাদা

পরিমাণ অনুসারে ২ প্রকার:

সার্বিক : সকল মানুষ হয় মরণশীল

বিশেষ : কিছু মানুষ হয় সৎ

গুণ ও পরিমাণ অনুসারে ৪ প্রকার

- সার্বিক সদর্থক : সকল মানুষ হয় মরণশীল – A
- সার্বিক নঞর্থক: কোনো কাক নয় সাদা- E
- বিশেষ সদর্থক : কিছু মানুষ হয় সৎ - I
- বিশেষ নঞর্থক : কিছু মানুষ নয় সৎ- O

এছাড়াও সম্বন্ধ অনুসারে যুক্তিবাক্য ২ প্রকার:

- নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য: কোনো শর্ত থাকেনা
- সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য : শর্ত যুক্ত হয়, এটি আবার ২ প্রকারের-
 1. প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য: যদি...তবে দ্বারা গঠিত (যদি বৃষ্টি হয় তবে মাঠ ভিজবে)
 2. বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য: হয়-নয়,বা,অথবা,কিংবা দ্বারা যুক্ত (লোকটি হয় বোকা নয় অসৎ)

অনুমান (Inference) : অনুমানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Inference উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Inferre থেকে। inferre শব্দের অর্থ হলো bring in বা উপস্থাপন করা। কোনো বিষয়ের আলোকে কোনো বিষয় উপস্থাপন করা। আরো পরিষ্কারভাবে, কোনো জানা বিষয়ের আলোকে কোনো অজানা বিষয় উপস্থাপন করা। অনেক ক্ষেত্রে (inference) এর মানে হলো কোনো প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; a conclusion reached on the basis of evidence. আমাদের জানা বিষয় থেকে বা সত্য বলে গৃহীত আশ্রয়বাক্য থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া হলো অনুমান। • মানসিক প্রক্রিয়ার ফলাফল বা সিদ্ধান্ত হলো অনুমান। বাস্তব জ্ঞান বা সামান্য প্রমাণ থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করাই হলো অনুমান।

যুক্তিবিদ জনসন তাঁর লজিক বইয়ে অনুমানের ক্ষেত্রে দু'টি শর্তের কথা বলেছেন।

ক. গঠনমূলক শর্ত

খ. জ্ঞানমূলক শর্ত

অনুমান ২ প্রকার:

১. অবরোহ অনুমান(Deductive)

২. আরোহ অনুমান(Inductive)

Deductive Inference (অবরোহ অনুমান)

যে অনুমানের সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে কোনোক্রমেই ব্যাপক হতে পারে না, তাকে অবরোহ অনুমান বলে। সহজভাবে বলতে গেলে, সার্বিক বাক্য থেকে বিশেষ বাক্যে আসার নাম অবরোহ। যেমন :

A- সব মানুষ হয় চতুর

I- কিছু চতুর প্রাণী হয় মানুষ।

উপরিউক্ত যুক্তিটিতে আশ্রয়বাক্যটি সার্বিক কিন্তু সিদ্ধান্তটি বিশেষ বাক্য। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্যের তুলনায় কম ব্যাপক।

অবরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Deductive Inference)

- > এর সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে ব্যাপক হয় না।
- আমরা সার্বিক থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হই।
- > আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হয় না
- > অবরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্য মিথ্যা হলে সিদ্ধান্ত সত্য হয় না।
- > আশ্রয়বাক্যের সাথে সিদ্ধান্তের একটি অনিবার্য সম্পর্ক থাকবেই

আরোহ অনুমান(Inductive Inference)

Induction শব্দটি ল্যাটিন Epagogue থেকে এসেছে। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক বাক্য স্থাপন করার মানসিক প্রক্রিয়াকে আরোহ অনুমান বলে। আরও সহজভাবে বলা যায়, বিশেষ বিশেষ বাক্য থেকে সার্বিক বাক্যে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে আরোহ অনুমান বলে। এ অনুমানে সিদ্ধান্তটি সব ক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্যের চেয়ে ব্যাপক হবে। আরোহ অনুমান = বিশেষ :→ সার্বিক। বিশেষ থেকে সার্বিকে গমনের ব্যবধান অতিক্রম করাকে আরোহমূলক লক্ষ্য (Inductive leap) বলে। আরোহ অনুমান দুটি নীতির উপরে নির্ভরশীল: প্রকৃতির একরূপতা নীতি ও কার্যকারণ নীতি।

যেমন :

সক্রেটিস হয় মরণশীল

প্লেটো হয় মরণশীল

অ্যারিস্টটল হয় মরণশীল

সকল মানুষ হয় মরণশীল

এখানে বাস্তবে কিছু মানুষের মরণশীলতার অভিজ্ঞতা থেকে সকল মানুষের মরণশীলতার কথা বলা হয়েছে। এ জন্য সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে ব্যাপক হয়েছে।

আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Inductive inference)

উপরিউক্ত উদাহরণ থেকে কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত > আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত বা অনুমিত হয় না। কারণ এর সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যের চেয়ে নতুন তথ্য প্রকাশ করে। নতুন তথ্য উপস্থাপন করে।

দ্বিতীয়ত > আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে কোনো সত্য প্রমাণ করে না। সিদ্ধান্ত যে তথ্য প্রকাশ করে তা পরবর্তী সময়ে অভিজ্ঞতার আলোকে ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে পারে, আর নাও হতে পারে। হবেই এমন কোনো শর্ত নেই।

তৃতীয়ত > আরোহ অনুমানে বস্তুগত সত্যতার দিকে লক্ষ রাখা হয়, আকারগত সত্যতার দিকে নয়। অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত বাস্তবের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না, তা বিচার করা হয়। সত্যকে খুঁজে বের করাই লক্ষ্য থাকে।

চতুর্থত > আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত কোনো ক্ষেত্রেই আশ্রয়বাক্যের চেয়ে কম ব্যাপক হয় না।

পঞ্চমত > আরোহ অনুমানে আশ্রয়বাক্যকে স্বীকার করেও সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা যায়।

অবরোহ অনুমান ২ প্রকার:

১. অমাধ্যম অবরোহ অনুমান: একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়।

সক্রেটিস হলেন প্লেটোর শিক্ষক

.. প্লেটো হলেন সক্রেটিসের ছাত্র।

অমাধ্যম অনুমান ১০ প্রকার:

১. আবর্তন ২. প্রতিবর্তন ৩. প্রতি- আবর্তন ৪. অন্তরাবর্তন ৫. বিরোধানুমান ৬. নিশ্চয়তাঘটিত অনুমান ৭. সম্বন্ধ পরিবর্তন ৮. গুণ যোগাত্মক ৯. গুণ বিয়োগাত্মক ১০. জটিল ধারণা যোগাত্মক

২. মাধ্যম অবরোহ অনুমান : দুই বা ততোধিক আশ্রয়বাক্য থাকবে।

সব মানুষ হয় মরণশীল

সব শিক্ষক হয় মানুষ

..সব শিক্ষক হয় মরণশীল

আরোহের প্রকারভেদ :

যুক্তিবিদ মিল আরোহকে প্রথমত ২ ভাগে ভাগ করেছেন :

যুক্তিবিদ Mill আরোহের যে চূড়ান্ত শ্রেণিবিভাগ দেখিয়েছেন তা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ লাভ করেছে। Mill প্রথমত আরোহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

যথা : ১। প্রকৃত আরোহ বা যথার্থ আরোহ (Proper Induction);

২। অপ্রকৃত আরোহ বা অযথার্থ আরোহ (Improper Induction)।

প্রকৃত আরোহ বা যথার্থ আরোহ : যে সকল আরোহে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ আরোহমূলক লক্ষ বা অনির্দেশ যাত্রা উপস্থিত সেগুলোকে তিনি 'প্রকৃত আরোহ' বলেছেন।

প্রকৃত আরোহকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা :

(ক) বৈজ্ঞানিক আরোহ (Scientific Induction): প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নীতির ভিত্তিতে পরিবেশের কিছু বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে একটি সার্বিক সংশ্লেষক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হলে তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে

(খ) অবৈজ্ঞানিক আরোহ (Unscientific Induction): জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন কোনো বিষয় সম্পর্কে যা সত্য বলে জানা গেছে তা যদি সমজাতীয় সকল বিষয় সম্পর্কে সত্য হয়, তাহলে সেই সত্যের ভিত্তিতে একটি সার্বিক সত্যবাক্য প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়াই অবৈজ্ঞানিক আরোহ

(গ) সাদৃশ্যানুমান বা উপমানুমান (Analogy): যে আরোহ অনুমানে দুই বা ততোধিক বস্তু বা শ্রেণির মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে দেখে অন্য বিষয়েও সাদৃশ্য আছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে সাদৃশ্যানুমান বলে, এটি দুই প্রকার:

১. সাধু সাদৃশ্যানুমান : মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত স্থাপন

২. অসাধু সাদৃশ্যানুমান: সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক, অপ্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য বিবেচনা করা হয়

অপ্রকৃত আরোহ/অযথার্থ আরোহ : যেসব যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে আরোহ বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু তাদের মাঝে 'আরোহমূলক লক্ষ' বা অনির্দেশ যাত্রা অনুপস্থিত তাদের অপ্রকৃত আরোহ বা অযথার্থ আরোহ বলে।

অপ্রকৃত আরোহকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : (ক) পূর্ণঙ্গ আরোহ (Perfect Induction); (খ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (Induction by parity of Reasoning); (গ) ঘটনা সংযোজন (Colligation of Facts)।

সহানুমানের গঠন

যেকোনো সহানুমানে তিনটি যুক্তিবাক্য থাকে। এদের মধ্যে দুটি আশ্রয়বাক্য এবং তৃতীয়টি হলো সিদ্ধান্ত যা আশ্রয় বাক্য দুটি থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। আমরা জানি যে, একটি যুক্তিবাক্যে দুটি পদ থাকে। সুতরাং একটি সহানুমানে তিনটি যুক্তিবাক্যে মোট ছয়টি ভিন্ন পদ থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে একটি সহানুমানে শুধুমাত্র তিনটি পদ থাকে। এদের প্রত্যেকটি দুবার করে ব্যবহৃত হয়।

উক্ত তিনটি পদের মধ্যে সিদ্ধান্তের বিধেয়কে প্রধান পদ (Major Term) বলে। এ পদটি প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত হয়। সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যকে অপ্রধান পদ (Minor Term) বলে। এ পদটি অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত হয়। আর যে পদটি উভয় আশ্রয়বাক্যে থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তে থাকে না তাকে মধ্যপদ (Middle Term) বলে।

সহানুমানের আশ্রয়বাক্যগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যে আশ্রয়বাক্যে প্রধান পদটি থাকে তাকে প্রধান আশ্রয়বাক্য (Major Premise) বলে। আর যে আশ্রয়বাক্যে অপ্রধান পদটি থাকে তাকে (Minor Premise) বলে। প্রধান আশ্রয়বাক্য ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্য দুটির সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে যে অনিবার্য তৃতীয় যুক্তিবাক্যটির সৃষ্টি হয় তাকে সিদ্ধান্ত (Conclusion) বলে। যেমন-

সকল মানুষ হয় মরণশীল, (প্রধান আশ্রয়বাক্য)

সকল ছাত্র হয় মানুষ, (অপ্রধান আশ্রয়বাক্য)

সকল ছাত্র হয় মরণশীল। (সিদ্ধান্ত)

উপরে আশ্রয়বাক্যগুলোর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নিচে সহানুমানের পদগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হবে। আমরা পূর্বেই জেনেছি প্রতিটি সহানুমানে কেবলমাত্র তিনটি পদ থাকে। যথা- ক. প্রধান পদ, খ. অপ্রধান পদ ও গ. মধ্যপদ।

ক. প্রধান পদ: সহানুমানের সিদ্ধান্তের বিধেয় পদকে প্রধান পদ বলে। যেমন- অতএব, সকল মানুষ হয় মরণশীল,

সকল কবি হয় মানুষ,

সকল কবি হয় মরণশীল

সহানুমানের উপর্যুক্ত উদাহরণে 'মরণশীল' পদটি হচ্ছে প্রধান পদ। কেননা পদটি সিদ্ধান্তের বিধেয়ের স্থানে এবং প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. অপ্রধান পদ: সহানুমানের সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদটিকে অপ্রধান পদ বলে। যেমন-

সকল মানুষ হয় মরণশীল,
সকল কৃষক হয় মানুষ,
সকল কৃষক হয় মরণশীল।

উপরিউক্ত উদাহরণে 'কৃষক' পদটি হচ্ছে অপ্রধান পদ। কেননা পদটি সিদ্ধান্তে উদ্দেশ্যরূপে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

মধ্যপদ: যে পদ সহানুমানের উভয় আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত হয় কিন্তু সিদ্ধান্তে থাকে না সে পদটিকে মধ্যপদ বলে। যেমন-

সকল মানুষ হয় মরণশীল,
সকল ছাত্র হয় মানুষ,
সকল ছাত্র হয় মরণশীল।

সহানুমানের উক্ত যুক্তিতে 'মানুষ' পদটি হলো মধ্যপদ। কেননা পদটি উভয় আশ্রয়বাক্যেই আছে কিন্তু সিদ্ধান্তে নেই।

সহানুমানে মধ্যপদের ভূমিকা

আমরা জানি, নিরপেক্ষ সহানুমানের মধ্যপদ দুটি আশ্রয়বাক্যেই থাকে। স্বাধ্য আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদের সাথে এবং পক্ষ আশ্রয়বাক্যে পক্ষ পদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য দুটি আশ্রয়বাক্যেই মধ্যপদ বিদ্যমান। মূলত এ জন্যই একে মধ্যপদ বলে। মধ্যপদ এর কাজ হলো মধ্যস্থতা করা। দুটি আশ্রয়বাক্য প্রধান ও অপ্রধান পদের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে সিদ্ধান্তে প্রধান ও অপ্রধান পদের মধ্যে একটি আবশ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই সহানুমানে দুটি আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে একটি সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক:

সকল মানুষ হন মরণশীল

সকল যুক্তিবিদ হন মানুষ

অতএব, সকল যুক্তিবিদ হন মরণশীল

এখানে 'মানুষ' হচ্ছে মধ্যপদ। এই 'মানুষ' পদটি প্রধান আশ্রয়বাক্যে, 'মরণশীল' পদের সাথে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে 'যুক্তিবিদ' পদের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে সিদ্ধান্তে আবশ্যিকভাবে 'যুক্তিবিদ' এবং 'মরণশীল' পদ দুটি একটি সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আর এভাবেই আশ্রয়বাক্য দুটি থেকে অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়েছে। যুক্তিবিদ্যায় অ্যারিস্টটলের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো সহানুমান (Syllogism) সম্বন্ধে ধারণা প্রবর্তন। সহানুমানে যুক্তির বৈধতা বিচারের জন্য তিনি আবার একটি সূত্র উদ্ভাবন করেছেন যা অ্যারিস্টটলের সূত্র (Aristotle's Dictum) নামে পরিচিত।

যুক্তিবিদ্যার জনক গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল। এরিস্টটলের মতে, Logic is real science of reasoning. (যুক্তিবিদ্যা হলো যথার্থ চিন্তার বিজ্ঞান)

এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ: Organon, The Interpretation, The Categories, The Topics, The Prior Analytics, The Analytics Posterior

সহানুমানের নিয়মাবলি:

- সহানুমানের ক্ষেত্রে কেবল তিনটি পদ ব্যবহৃত হবে, যার প্রত্যেকটি একই অর্থে ব্যবহৃত হবে।

সহানুমানের উপরের নিয়ম লঙ্ঘন করলে দুই ধরনের অনুপপত্তি ঘটে:-

ক. চতুষ্পদী অনুপপত্তি (Fallacy of Four Terms)

খ. দ্ব্যর্থক অনুপপত্তি (Fallacy of Ambiguity)

ক. চতুষ্পদী অনুপপত্তি: কোনো সহানুমানে তিনটি পদের বেশি পদ ব্যবহার করলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে চতুষ্পদী অনুপপত্তি বলে। চতুষ্পদী অনুপপত্তি বলা হয় এই জন্য যে, এ ক্ষেত্রে তিনটি পদের স্থানে চারটি পদ দেখা যায়।

- সহানুমানে মধ্যপদকে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতে হবে।

এই নিয়মের লঙ্ঘন হলে অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি হয়

- যে পদ আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য নয়, তা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না।

এই নিয়মের লঙ্ঘনে দুই ধরনের অনুপপত্তি হয়:

১. অবৈধ প্রধান পদজনিত অনুপপত্তি
২. অবৈধ অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি

Topics 03 – Epistemology, Theories of Reality

What is knowledge? Theories of sources of Knowledge: Rationalism, Empiricism, Criticism (Kant) and Intuitionism. Realism and Idealism. Monism, Dualism and Pluralism.

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- জ্ঞানের উৎস সংক্রান্ত মতবাদগুলোর পরিচিতি
- সংশ্লিষ্ট মতবাদের সমর্থনকারী দার্শনিকের পরিচিতি
- বাস্তববাদ ও ভাববাদের বিভিন্ন ধারা ও সংশ্লিষ্ট দার্শনিকগণ

সোর্স সমূহ:

- সংশ্লিষ্ট টপিকের Live mcq Lecture pdf
- দর্শনের কথা- আব্দুল বারী
- Introduction to philosophy – Jadunath Sinha

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ (Topic 03)

What is knowledge (জ্ঞান কি?)

knowledge is justified true believe - Plato

জ্ঞান বলতে মূলত একটি সত্য বিশ্বাস কে বুঝায় যা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ এবং দৃঢ় যুক্তির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে আসলে জ্ঞান এর যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব নয়, এজন্য জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, শর্ত, সীমা আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আলোচনাগুলোই মূলত জ্ঞানবিদ্যায়(Epistemology) হয়ে থাকে।

“Epistemology is the theory of knowledge, it enquires into the origin of knowledge and the conditions of its validity also into the nature of knowledge.

Theories of sources of Knowledge: (জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত মতবাদসমূহ)

Rationalism (বুদ্ধিবাদ) :

"Rationalism, in Western philosophy, the view that regards reason as the chief source and test of knowledge"

বুদ্ধিবাদের মূল বক্তব্য হলো জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েই লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা জ্ঞান নয়। আর যদি তা জ্ঞানও হয় তা সত্যিকারের জ্ঞান নয়। সে জ্ঞান অসঙ্গত এবং অসম্পূর্ণ। বুদ্ধিবাদীরা বাহ্য অভিজ্ঞতাকে বর্জন করে বুদ্ধিকেই যথার্থ জ্ঞান লাভের উৎস এবং উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, আত্মা সক্রিয়। বুদ্ধি আত্মার স্বাভাবিক গুণ। মন নিজের অন্তর-ধারণা থেকে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান উৎপন্ন করে।

প্রাচীন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম সক্রেটিস্ এবং প্লেটো। সক্রেটিস বলেন, বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। তার মতে "All knowledge is knowledge through concept" সব জ্ঞানই আমরা সাধারণ ধারণার সাহায্যে পেয়ে থাকি। আর এ সাধারণ ধারণা আমরা বুদ্ধির সাহায্যেই গঠন করি। দার্শনিক প্লেটোর মতে, আত্মা হলো সক্রিয় এবং বুদ্ধি তার সহজাত ক্ষমতার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে। সংবেদন ও অনুভূতি আমাদেরকে যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। এগুলোর সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান পেয়ে থাকি তা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল। জ্ঞান হতে হবে শাস্বত ও সনাতন।

সক্রেটিস্ কর্তৃক প্রবর্তিত বুদ্ধিবাদ পরবর্তীকালে স্টোয়িক ও সিনিক দার্শনিকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়। নব্য পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বুদ্ধিবাদের প্রধান সমর্থক হলেন ডেকার্টে। এছাড়াও স্পিনোজা, ভলফ(wolf) এবং লাইবনিজও বুদ্ধিবাদী।

ডেকার্টে (Descartes) (১৫৯৬ খ্রি. — ১৬৫০ খ্রি.)

মধ্য যুগের সমস্ত বিশ্বাসকে সন্দেহ করে ডেকার্টে তাঁর দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, আমি যদি সবকিছু অবিশ্বাস করি, বাহ্য জগৎ, বাইবেল, ঈশ্বর ইত্যাদি—সমস্তই যদি না মানি তথাপিও প্রমাণ হবে যে, আমি আছি। সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি অর্থাৎ চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।

Cogito ergo sum - I think therefore I exist - আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল

ডেকার্টের মতে, আমাদের কতকগুলো সহজাত ধারণা(innate ideas) আছে। ঈশ্বর আমাদের জন্মের সময়ই এগুলোকে আমাদের মনে গেঁথে দেন। সমস্ত কিছুর জ্ঞানই এ সমস্ত ধারণা থেকে গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতিতেও লাভ করা যায়। ডেকার্টের মতে, সুস্পষ্টতা এবং প্রাঞ্জলতা এসব ধারণার সত্যতা প্রমাণ করে, এগুলো মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ। স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা ধারণার সত্যতা প্রমাণ করে।

এ ছাড়াও আরও দুরকমের ধারণা আছে—আগন্তুক এবং কৃত্রিম। যেসব ধারণা বাইরে থেকে আমাদের মনে আসে সেগুলোকে বলে আগন্তুক ধারণা। আমাদের মনের বিভিন্ন ধারণার সাথে যোগ-বিয়োগের ফলে যে ধারণার উৎপত্তি হয় সেগুলো হলো কৃত্রিম। এ উভয় রকমের ধারণাগুলো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নয়। কাজেই এরা নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস নয়। অপর দিকে, সহজাত ধারণা নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস।

স্পিনোজা (Spinoza)(১৬৩২ খ্রি.-১৬৭৭ খ্রি.)

বুদ্ধিবাদী স্পিনোজা ডেকার্টের মত সহজাত ধারণার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনি সহজাত ঈশ্বর বা দ্রব্য সম্বন্ধীয় ধারণার বিশ্বাস নিয়ে তাঁর দর্শন আরম্ভ করেন। স্পিনোজা ঈশ্বরের বা দ্রব্য সম্পর্কীয় সহজাত ধারণা থেকে আরম্ভ করে জ্যামিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে জীবাশ্ম ও জীব জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান।

লাইবনিজ (Leibnitz)(১৬৪৬ খ্রি. — ১৭১৬ খ্রি.)

জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ বলেন, সমস্ত জটিল বিষয়ের জ্ঞান বুদ্ধিলাভ্য। তাঁর মতে, বুদ্ধির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কটা একেবারে অহিনকূল নয়। বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান জ্ঞানই। তবে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সুস্পষ্ট এবং যুক্তপূর্ণ নয়। ইন্দ্রিয় বুদ্ধিরই এক অনুন্নত রূপ, লাইবনিজ অভিজ্ঞতাবাদকে বুদ্ধিবাদের সাথে সমন্বিত করতে চেষ্টা করেন।

ভলফ (Wolf)(১৬৭৯ খ্রি. ১৭৫৪ খ্রি.)

চরমপন্থী খ্রিস্টিয়ান ভলফের মধ্যে আমরা দেখি বুদ্ধিবাদের স্পষ্ট প্রকাশ। তাঁর মতে, বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত কিছুই ব্যাখ্যা করা যায়। বুদ্ধি আমাদের যে জ্ঞান দেয় তা শুধু কোনো বিষয় বা নিয়মের নয়। এ বুদ্ধি সুদূর বিস্তৃত। তিনি বলেন, আমাদের মনে কতকগুলো মৌলিক সহজাত এবং বোধজাত ধারণা আছে। অবরোহ পদ্ধতিতে এসব ধারণা থেকে জগৎ, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। ডেকার্টের চেয়ে তিনি স্পষ্ট ও অকাতরে বুদ্ধিবাদের জয়গান গেয়ে যান। চিরন্তন ও শাস্ত্র জ্ঞান কেবল মৌলিক সহজাত ধারণাই দিতে পারে। ডেকার্টের অবরোহ পদ্ধতিকে তিনি আরও জোরদার করে তোলেন। তিনি অভিজ্ঞতাকে একেবারে বর্জন করেন।

Empiricism(অভিজ্ঞতাবাদ)

"Empiricism is a reaction against rationalism, it's a philosophical view that all concepts originate in experience..."

অভিজ্ঞতাবাদ অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের যথার্থ উৎস বলে মনে করে। ব্রিটিশ দার্শনিক লক্, বার্কলি ও হিউম জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণের পর এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, সংবেদন এবং অনুভূতি থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সংবেদনের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। অন্তর্দর্শনে আমরা নিজেদের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই। তাঁদের মতে, অমূর্ত, সাধারণ সত্যও অভিজ্ঞতার মাঝে লাভ করা যায়।

বঅভিজ্ঞতাবাদী বেকন (Becon) বলেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞানের মধ্যযুগের অভিজ্ঞতা- উপকরণ পাওয়া যায়। দার্শনিক হবস ও অভিজ্ঞতাবাদীদের চিরন্তন মতটি অনুসরণ করেছিলেন।

আধুনিককালে ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক্ অভিজ্ঞতাবাদের জনক। তারপর বার্কলি ও শেষে হিউম অভিজ্ঞতাবাদের একটা সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। জে. এস. মিল, বেইন প্রমুখ দার্শনিক হিউমের উত্তরসূরী। সাম্প্রতিককালের যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদেরকে(Logical positivist) এ দলভুক্ত করা যেতে পারে।

জন লকের অভিজ্ঞতাবাদ(John Locke's Empiricism)

ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক (১৬৩২ খ্রি.- ১৭০৪ খ্রি.) তাঁর অভিজ্ঞতাবাদকে তাঁর নামকরা গ্রন্থ 'Essays Concerning Human Understanding'-এ সৃষ্টি, সুসংহত, মার্জিত এবং যুক্তিপূর্ণভাবে প্রদান করেছেন। লকের দার্শনিক চিন্তাকে আমরা ডেকার্টের দর্শনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।

লকের সিদ্ধান্ত হলো সহজাত ধারণা কতকগুলো সাধারণ সত্য যেগুলো আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়। লকের মতে, মানুষ জন্মের সময় কোনো ধারণা নিয়ে অনায়াস না। শিশুমন একেবারে খালি থাকে। লক্ এই খালি মনকে "একখানা অলিখিত সাদা কাগজ- Tabula Rasa" বলে উল্লেখ করেছেন। পরে ইন্দ্রিয় পথে বাইরের জিনিসের ছাপ মনে পড়ে। এ ছাপ থেকে শিশুর জ্ঞান হয়। বস্তুর যে ছাপ মনে পড়ে লক্ এর নাম দিয়েছেন ধারণা(concept) ধারণা দু' পথে আমাদের মনে প্রবেশ করে সংবেদন আর অন্তর্দর্শনের পথে। আমরা সংবেদনের সাহায্যে পাই বহির্বিশ্বের জ্ঞান এবং অন্তর্দর্শনের সাহায্যে পাই মানসিক অবস্থার জ্ঞান।

লক্ মনে করেন, ধারণা গ্রহণের ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় থাকে। বাইরের ধারণাগুলো যখন মনের সাদা পর্দায় এসে ভিড় জমায় তখন মনের কিছু করবার থাকে না। মন তার প্রকৃতি অনুসারে তখন বিভিন্ন ধারণার সাথে তুলনা ও সংযোগ করে জটিল ধারণার সৃষ্টি করে। আবার মন বিশেষ ধারণার থেকে সামান্যিকরণের মাধ্যমে সাধারণ ধারণা (Concept) সৃষ্টি করে। কাজেই লক্ বলেন, বুদ্ধিতে এমন কিছু নেই যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না(There is nothing in the intellect which was not previously in the sense)

লকের মতে, ধারণাগুলোর মধ্যে মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করাই হলো জ্ঞান। 'গরু চতুষ্পদ জন্তু' আর 'বৃত্ত বর্গক্ষেত্র নয়', এ দু স্থানে প্রথমটিতে দুটি ধারণার মিল এবং দ্বিতীয়টিতে গরমিল দেখি। এর ফলেই আমরা গরুর কিছু জ্ঞান এবং বৃত্তের কিছু জ্ঞান পাই।

জন লকের মতে বস্তু তথা দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: মুখ্য গুণাবলী (primary qualities) এবং গৌণ গুণাবলী (secondary qualities)। মুখ্য গুণাবলী হল বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যেমন আকার, আকৃতি, সংখ্যা, এবং গতি। অন্যদিকে, গৌণ গুণাবলী হল যেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, যেমন রঙ, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি। এই গুণাবলী বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আমাদের উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। লকের মতে দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞেয়।

বার্কলির অভিজ্ঞতাবাদ(Berkelys empiricism)

বার্কলিকেও একজন অভিজ্ঞতাবাদী বলা যেতে পারে। তিনি অনেকটা লকের উত্তরসূরী হয়েও বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, বস্তুর সত্যতা প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভর করে। তিনি বলেন,

"Esse est percipi - অস্তিত্ব হয় প্রত্যক্ষনির্ভর"

সংবেদন ও ধারণাই জ্ঞানের আসল বস্তু। বস্তুজগৎ সংবেদন ও ধারণার সমষ্টিমাত্র। সামান্য ধারণা হলো নামমাত্র। আসলে এর কোন অস্তিত্ব নেই। গুণের আধাররূপে দেওয়া লকের দ্রব্যকে বার্কলি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু মনের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসই মন-নির্ভরশীল। কাজেই সংবেদন ও ধারণাই জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ।

ডেভিড হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ(David Hume's Empiricism)

ডেভিড হিউম (১৭১১ খ্রি.-১৭৭৬ খ্রি.) একজন চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী। তিনি তাঁর 'A Treatise of Human Nature' নামক গ্রন্থে অভিজ্ঞতাবাদের আলোচনা করেন। ভল্ফে যেমন আমরা দেখেছি বুদ্ধিবাদের চরম পরিণতি তেমনি হিউমের মাঝেও আমরা দেখি অভিজ্ঞতাবাদের চরম পরিণতি এবং তার থেকে উদ্ভূত সংশয়বাদ। হিউম দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতায় এসব জানা যায় না। কাজেই এরা আছে কি নেই কিছুই বলা যায় না।

তিনি বলেন, আমাদের সমস্ত জ্ঞান আসে ইন্দ্রিয়জ বা মুদ্রণ(Impression) এবং ধারণা থেকে। মানুষের কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলে সে বস্তুর ছাপ মনে পড়ে। হিউম এ ছাপের নাম দিয়েছেন ইন্দ্রিয়জ বা মুদ্রণ। এ মুদ্রণ অর্থে তিনি আবার বুঝেছেন বাহ্য এবং অন্তর সংবেদনকে। এ সংবেদন সজীব ও স্পষ্ট। এ সংবেদনেরই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট মানসরূপ হলো ধারণা(ideas/concept)। ইন্দ্রিয়জ থেকেই ধারণার উৎপত্তি। কাজেই কোনো বস্তুর ছাপ মনে মুদ্রিত হলে তার যে স্মৃতি প্রতিক্রিয়া সেটাই ধারণা। ধারণাই হলো জ্ঞানের উপকরণ। সাধারণত এসব ধারণা স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। তিনটি অনুযায়ী নিয়ম(Law of Association) যথা—সান্নিধ্য(Contiguity) সাদৃশ্য(similarity) এবং পারস্পর্য(Succession) এসব ধারণাকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে।

হিউম মনে করেন দ্রব্য বলতে কিছুই নেই। কেবল বস্তুর গুণই আমরা বাস্তব এবং সম্ভাব্য সংবেদনের মধ্যে পাই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ কতকগুলো সংবেদনের সমষ্টি মাত্রই গোলাপ। এসব সংবেদনের আশ্রয়স্বরূপ কোনো গোলাপ-দ্রব্য নেই। মন হলো চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার প্রবাহ মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেবল কল্পনার বিষয়। কারণ ঈশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। হিউম দ্রব্য, মন ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তার মতে সব কিছুই সংশয়পূর্ণ। কোনো জ্ঞানই সুনিশ্চিত নয়। জ্ঞানের মধ্যে সঠিক বা অনিবার্য সত্যের কোনো জায়গা নেই। সব জ্ঞানই সম্ভাব্য। সার্বিক অনিবার্য সত্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। কেবল সংবেদনের জ্ঞানই পাওয়া যায়, এর বাইরের নয়।

ফলে আমরা দেখি হিউমের এ অভিজ্ঞতাবাদ শেষ পর্যন্ত সংবেদনবাদ (Sensationism) এবং সংশয়বাদে (Scepticism) পরিণতি লাভ করে।

বিচারবাদ(Critical theory)

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭১৪ খ্রি. — ১৮০৪ খ্রি.) প্রথমদিকে বুদ্ধিবাদের ধারক ছিলেন। পরে হিউম কান্টকে নির্বিচার হিউমের লেখা পড়ে তাঁর ভুল ভেঙ্গে যায়। তিনি বুঝলেন কেবল ধারণাই বস্তুর জ্ঞান দিতে নিদ্রা থেকে জাগিয়েছে। ফলে তিনি নিজেই বলেছেন, "Hume roused me from dogmatic slumber""হিউম আমাকে নির্বিচার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়েছেন"। ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি কি করে হয়—তিনি এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে আরম্ভ করলেন। তার " Critique of Pure reason" গ্রন্থে এ সংক্রান্ত আলোচনা করেন।

তিনি দেখলেন প্রত্যেকটি জিনিসেরই সাধারণত দুটি দিক আছে—একটি বস্তুর(matter) দিক, অন্যটি আকারের(form) দিক। প্রত্যেকটি জিনিসই কোনো না কোনো উপাদানে বা বস্তুর তৈরি এবং তাতে কোনো না কোনো আকার আছে। কোনো বিশেষ টেবিল গোল হতে পারে, চতুষ্কোণ হতে পারে। আবার সেই টেবিলটি কাঠের, বাঁশের বা বেতের হতে পারে। এমন বস্তুর কথা বলা যায় না যার মধ্যে শুধু আকার আছে, এবং যার মধ্যে শুধু উপাদান আছে। আকার এবং উপাদান এক বস্তুতেই বিদ্যমান। প্রত্যেক বস্তুরই আকার এবং উপাদান আছে

কান্ট বলেন, জ্ঞানের বেলায়ও এ কথা খাটে। প্রত্যেক জ্ঞানেরই কোনো বস্তু এবং আকার আছে। কোনো জ্ঞানই কেবল বস্তু দিয়ে অথবা কেবল আকার দিয়ে গঠিত হতে পারে না। তিনি বলেন,

"Concepts without percepts are empty and percepts without concept are blind""বিষয়বস্তু ছাড়া আকার শূন্যগর্ভ, আবার আকার ছাড়া বস্তু অন্ধ।"

আকার যেন এক প্রকারের ছাঁচ যাতে বস্তু দিলে বস্তু পূর্ণ আকার নিয়ে বের হয়। অন্ধ লোক যেমন কোনো আলো দেখতে পারে না তেমনি কেবল বিষয়বস্তু জ্ঞানরূপ আলো দিতে পারে না, যদি না তা আকার পায়। কাজেই কান্ট বুদ্ধিবাদ এবং

অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনা আরম্ভ করলেন। তিনি মনে করেন যে, এ দুই মতবাদের কোনোটাই সত্য নয় এবং কোনোটাই সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। তবে এর কোনো একটি একাকী জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে জ্ঞান উৎপত্তির ব্যাপারে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দু'য়েরই প্রয়োজন আছে। কেবল ধারণাই জ্ঞান নয়। ধারণা জ্ঞান হতে হলে তা অবশ্যই কোনো বস্তুর ধারণা হতে হবে। কেবল বিশুদ্ধ ধারণা জ্ঞান দিতে পারে না। বুদ্ধি দিয়ে ধারণা এবং অভিজ্ঞতা বা সংবেদন দিয়ে বস্তুকে পাওয়া যায়। কাজেই বুদ্ধি এবং সংবেদন ; ধারণা এবং বস্তু দুই-ই একযোগে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। আকার ও বিষয়বস্তু উভয় মিলেই জ্ঞান হয়। কাণ্ট এভাবে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধনে তাঁর মতবাদ দেন। দুই মতবাদের বিচার ও সমালোচনা করে এদের মধ্যে নিহিত সত্যের সমন্বয় সাধনে যে নতুন মতবাদের সৃষ্টি তা-ই তাঁর মতবাদ। এজন্য তাঁর মতবাদকে বিচারবাদ বা সমালোচনাবাদ বলা হয়।

স্বজ্ঞাবাদ Intuitionism

বিচার-বুদ্ধি ছাড়া সোজাসুজি কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতার নাম স্বজ্ঞা বা বোধি। বস্তু-সত্তার জ্ঞান এ বোধির সাহায্যে সম্ভব। এ মতবাদের প্রধান সমর্থক ফরাসি দার্শনিক হেনরী বার্মস (১৮৫৯ খ্রি. — ১৯৪১ খ্রি.)। অবশ্য ব্রিটিশ দার্শনিক ব্রাডলিও চরম তত্ত্বের সঠিক জ্ঞানের জন্য স্বজ্ঞাকেই সমর্থন করেছেন। বার্মস মনে করেন, বুদ্ধি সত্তার স্বরূপকে বিকৃত করে, বুদ্ধি সত্তার আসল রূপকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারে না। বস্তুর প্রকাশমান রূপটিকে বুদ্ধি অবলোকন করতে পারে। বুদ্ধি বস্তুজগতের দ্বারেই ঘুরে বেড়ায় এবং ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। স্বজ্ঞার সাহায্যেই আমরা বস্তুর ভেতরে প্রবেশ করতে পারি, বস্তুর সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারি। বার্মস স্বজ্ঞার স্বরূপকে “বুদ্ধিসজ্ঞাত সহানুভূতি” রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

Realism & Idealism (বাস্তববাদ ও ভাববাদ)

ক. বাস্তববাদ (Realism)

বাস্তববাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয়বস্তু কোনোমতে জ্ঞাতার মনের দ্বারা নির্ণীত হয় না। জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতার মনোতিরিক্ত একটা সত্তা আছে। কোনো একজন লোককে আমরা যখন প্রথম দেখলাম তখন আমরা বলতে পারি না যে, লোকটিকে দেখলাম বলেই লোকটি আছে। আসলে লোকটি আগেও ছিল। তফাৎ হলো, এই লোকটিকে আমরা আগে জানতাম না, এখন জানলাম। কাজেই লোকটির অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভরশীল নয়। এমনকি এমনও বস্তু আছে যার অস্তিত্ব সকল মানুষের অজ্ঞাত ছিল। যেমন আমেরিকা—কলম্বাসের আবিষ্কারের আগেও আমেরিকা ছিল।

গুণের প্রক্ষেপে বাস্তববাদীদের মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন, বস্তুর সবগুলো গুণই জ্ঞানোতিরিক্ত। আবার কেউ কেউ বলেন, কিছু কিছু গুণ জ্ঞানসাপেক্ষ। মতবাদগুলো হলো:

১. সরল বা লৌকিক বাস্তববাদ।

২. বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ।

৩. নব্য বাস্তববাদ।

৪. বিচারমূলক বাস্তববাদ

১. লৌকিক বা সরল বাস্তববাদ (Popular or Naive Realism)

লৌকিক বা সরল বাস্তববাদ অনুসারে জ্ঞান হতে হলে বস্তুর দরকার। কাজেই বস্তু আছে। এই মতানুসারে সরাসরিভাবে আমরা বস্তুর যথার্থ স্বরূপকেই জানি। অথবা আমরা সরাসরিভাবে যা জানি তা সবই সত্য। এ মতবাদকে সাধারণ লোকের মতবাদ বলা হয়। সাধারণ লোক সহজ সরলভাবে মনে করে বস্তুজগতের অস্তিত্ব তাদের মনের বাইরে আছে। বস্তু ও তার গুণগুলোকে সরাসরিভাবে জানা যায়। এ মতবাদে সাধারণ লোকের সরল ধারণা পাওয়া যায় বলে এর নাম সরল বাস্তববাদ। আবার এতে বস্তুকে সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা সাক্ষাৎভাবে জানা যায় বলে এর অন্য নাম সাক্ষাৎ বাস্তববাদ।

বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ বা প্রতীকবাদ (Scientific Realism or Representationism)

ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক, লৌকিক বাস্তববাদের দোষ-ত্রুটিমুক্ত বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের বা প্রতীকবাদের প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, বস্তুর গুণগুলোকে আমরা মুখ্য ও গৌণ এ দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। কতকগুলো গুণ বস্তুতেই থাকে; তাদেরকে তিনি বলেছেন মুখ্য গুণ। আবার ব্যক্তিগত বা জ্ঞানগত, এগুলোকে তিনি গৌণ গুণই বলেছেন। বস্তুর আয়তন, সংখ্যা, ঘনত্ব বিস্তৃতি, গতি প্রভৃতি মুখ্য গুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গৌণ গুণগুলো একান্তভাবেই ব্যক্তিনির্ভর বা জ্ঞাননির্ভর। লকই প্রথমবারের মত জোরালো যুক্তি দিয়ে এ শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন। তিনি সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তাঁর মতবাদের নাম বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ।

তার মতে একই বস্তুর রং, স্বাদ, গন্ধ, উষ্ণতা, শীতলতা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের অথবা একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের। যা একজনের কাছে মিষ্টি তা অন্যজনের কাছে তিক্তও হতে পারে। কাজেই এ গুণগুলো মন-বহির্ভূত বা বস্তুগত নয়, ব্যক্তিগত। এগুলো ব্যক্তির কতকগুলো ধারণা বা সংবেদন। কিন্তু বস্তুর বিস্তৃতি, আকার, আয়তন প্রভৃতি সকলের কাছে একই রকম বলেই মনে হয়, কাজেই এগুলো বস্তুনির্ভর। গৌণ গুণগুলো পরিবর্তনীয়, মুখ্য গুণগুলো পরিবর্তনীয় নয়।

আমাদের মন প্রত্যক্ষভাবে এ গুণগুলোকে জানতে পারে, গুণের আধারকে নয়। কিন্তু কোনো দ্রব্য না থাকলে এগুলো কোথায় থাকবে? কাজেই লক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এ দ্রব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, “এ যে কি আমি বলতে পারিনা, এ হলো অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।”

নব্য-বাস্তববাদ(Neo Realism)

লকের প্রতীকবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে নব্য বাস্তববাদের জন্ম। আমেরিকার হোল্ট, মার্টিন, মন্টেগু, পেরী, পিটনিঙ্ক প্রমুখ দার্শনিক এ আন্দোলনের স্রষ্টা। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার কয়েকজন দার্শনিক “The Neo-realism” 'নব্য বাস্তববাদ' প্রকাশ করেন। নব্য বাস্তববাদ লৌকিক বাস্তববাদেই প্রত্যগমন। এ মতবাদের বিশেষ বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হলো—

প্রথমত, বহির্জগতের বস্তুগুলোকে সোজাসুজি মন দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। এদেরকে ধারণার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায় না, ধারণাগুলো বস্তুর প্রতিকৃতি বা প্রতীক নয়। তাঁরা ডেকার্টে এবং লকের প্রতীক প্রত্যক্ষণকে অস্বীকার করেন। তাঁরা জ্ঞানের দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না।

দ্বিতীয়ত, মুখ্য, গৌণ এবং সুন্দর-অসুন্দরের গুণগুলো সত্য, মনাতিরিক্ত ও বস্তুনির্ভর। এরা ব্যক্তিমনের ধারণা নয়। সুতরাং নব্য বাস্তববাদ লৌকিক বা সরল বাস্তববাদের সাথে একমত।

তৃতীয়ত, নব্য বাস্তববাদ আত্মগত এবং বস্তুগত উভয় প্রকার ভাববাদকেই অস্বীকার করে।

চতুর্থত, নব্য বাস্তববাদ জড় এবং মনের দ্বৈততাকে অস্বীকার করে নিরপেক্ষ একাত্মতাবাদ প্রচার করে।

পঞ্চমত, তাঁরা মনে করেন, এ জগৎ কোনো পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার প্রকাশ নয়। পরব্রহ্মের ধারণাও অলীক পরব্রহ্মের ধারণা অলীক কল্পনা মাত্র।

বিচারমূলক বাস্তববাদ(Critical Realism)

স্যান্টায়ান, ড্রেক, প্র্যাট, লাভজয়, রজার্স, সেলার্স প্রমুখ মার্কিন দার্শনিক “Essay in Critical Realism” নামক গ্রন্থখানা রচনা করেন। পেট্রিক এ মতবাদকে বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ থেকে আলাদা করার জন্য এর নাম দেন নব্য বৈচারিক বা বিচারমূলক বাস্তববাদ। নব্য বাস্তববাদের দোষগুলোকে আলোচনা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দূরীভূত করে নিজদের নতুন মত দেওয়াই নব্য বৈচারিক বাস্তববাদীদের কাজ।

খ. Idealism(ভাববাদ)

জ্ঞেয় বিষয় বা বস্তু জ্ঞানের বা মনের বা চেতনের ওপর নির্ভরশীল। এ মতবাদের নাম ভাববাদ। কোনো বস্তু মন বা চেতনানিরপেক্ষ থাকতে পারে না। মনোতিরিক্ত কোনো বস্তুর সত্তা নেই। মনের বা জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক আন্তরিক। মন ছাড়া বিষয় বা বস্তু ভাবাই যায় না।

ভাববাদের ঐতিহাসিক আলোচনা(Historical account of Idealism)

ভাববাদের প্রথম সূত্রপাত হয় পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে গ্রিক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাসের মতবাদে। তাঁর আগে গ্রিক দার্শনিকগণ জগৎকে গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল মনে করেন। কিন্তু অ্যানাক্সাগোরাসই প্রথমে ভাবলেন জগতে ঐক্য, সৌন্দর্য এবং সামঞ্জস্য রয়েছে।

অ্যানাক্সাগোরাসের মতে জগৎ উদ্দেশ্যহীন নয়। বিশেষ কোনো লক্ষ্যের দিকেই জগতের গতি। কাজেই কোনো নির্বুদ্ধি সত্তা এর মূলে কাজ করতে পারে না। জগৎ প্রক্রিয়ার মূলে কাজ করে যাচ্ছে এক অদৃশ্য সক্রিয় শক্তি। তিনি এর নাম দেন 'Nous' বুদ্ধি বা চেতন। জাগতিক সর্বপ্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলার মূলে আছে বুদ্ধি। বুদ্ধিই এ জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এরপর ভাববাদের ধারক এবং বাহক হিসেবে আমরা পাই সক্রেটিসকে। তাঁর মতে, সমস্ত জ্ঞান হয় সামান্য সক্রেটিসের মত ধারণার মাধ্যমে। এ সামান্য ধারণাই চিন্তার সরলতম রূপ। ফলে চিন্তা বা বুদ্ধির জন্ম মনেই। এ বুদ্ধিই সবকিছুর পরিমিতি। জ্ঞানের বস্তু বা বিষয় এ মন বা বুদ্ধিনির্ভর। ধারণা এবং বস্তুর সম্পর্ক নিবিড়। কাজেই ধারণার জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। জ্ঞানই ধর্ম।

প্লেটোর ভাববাদ(Plato's Idealism)

প্লেটো সক্রেটিসের মতবাদকে স্বীকার করে নেন। তাঁর মতে, সংবেদনে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় না। সামান্য ধারণাই যথার্থ জ্ঞানের আধার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কোনো প্রকৃত সত্তা নেই; আছে শুধু অস্তিত্ব। সামান্যেরই সত্তা আছে। বিশেষের মধ্যে আমরা পাই বস্তুকে, বস্তু-সত্তাকে নয়। বিশেষ মানুষ 'করিমের' কোনো সত্তা নেই। কিন্তু 'মনুষ্যত্ব' এটা হলো সামান্য ধারণা। এ ধারণার যথার্থ সত্তা আছে। প্লেটো এর নাম দিয়েছেন ধারণা বা 'Idea'। জগতে প্রত্যেকটি ধারণার অনুরূপ বস্তু আছে। কাজেই যতগুলো ধারণা করা সম্ভব ততগুলো বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব। ফলে ধারণার আলাদা একটা জগৎ আছে। তিনি বলেন, এ ভাবের বা ধারণার জগৎ শাস্ত ও সনাতন। এ জগতের কোনো ক্ষয়-ক্ষতি নেই। এর কোনো ভাবের জগৎ প্রকৃত জগৎ। ভাবের জগৎ সত্য জগৎ। ইন্দ্রিয়ের জগৎ মিথ্যে জগৎ। সর্বোচ্চ ধারণা হলো শুভ বা মঙ্গলের ধারণা। তিনি এ ভাবের বা ধারণার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। নিম্নে সেগুলো দেওয়া হলো—

(ক) ধারণা হলো দ্রব্য, অর্থাৎ দ্রব্য অর্থে এরা স্ব-সত্য, স্বয়ং-সৃষ্ট এবং স্বনিয়ন্ত্রিত। অন্য কিছুর উপর এদের সত্তা নির্ভর করে না।

(খ) ধারণা হলো সামান্য এবং সার্বিক।

(গ) ধারণাগুলো বস্তু নয়, চিন্তা। মনুষ্যত্ব বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। যদি থাকতো তবে তা বিশেষ হয়ে পড়তো। তখন আর তা সামান্য ধারণা থাকতো না।

(ঘ) প্রতিটি ধারণা হলো এক ঐক্য, বহুর মাঝে এক।

(ঙ) ধারণা হলো অপরিবর্তনীয় এবং অবিনশ্বর।

(চ) ধারণাগুলোর দেশ ও কালে কোনো অস্তিত্ব নেই। এগুলো বুদ্ধিগ্রাহ্য। বুদ্ধি দিয়ে এদেরকে জানতে হয়।

আধুনিক ভাববাদীদের মধ্যে যাঁরা দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আসে বার্কলির নাম। লাইবনিজও একজন নামকরা ভাববাদী ছিলেন। তারপর কান্ট, ফিটে, শেলিং, ব্রাডলি প্রমুখ দার্শনিকও ভাববাদের ব্যাখ্যাকারক।

লাইবনিজের ভাববাদ(Leibnitz Idealism)

বর্তমানকালের ভাববাদীদের মধ্যে জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের পরমাণুবাদ ও আধুনিককালের কার্টেশীয় দার্শনিকদের মতবাদকে সমন্বিত করে তিনি চরম তত্ত্ব বা সত্যের এক নতুন

মতবাদ দেন। তাঁর মতে, চরম তত্ত্ব অবিভাজ্য কিন্তু সক্রিয়। চরম তত্ত্ব অস্তিত্বসম্পন্ন; সমস্ত চৈতন্য অচৈতন্যের ভিত্তি। এটা আদি এবং খাঁটি। এ সত্তাকে তিনি নাম দেন চিৎ পরমাণু (monad)

এই চিৎ পরমাণু যে অবিভাজ্য তার সপক্ষে তিনি একটি সূক্ষ্ম যুক্তি প্রদান করেন। তিনি বলেন, যা-ই বিভাজ্য তা-ই ভঙ্গুর। আর যা ভঙ্গুর তা কখনও সত্য হতে পারে না। সুতরাং চিৎপরমাণু অবিভাজ্য। অবিভাজ্য আবার চরম তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে। এ কথার সপক্ষেও তিনি একটি বুদ্ধিপূর্ণ যুক্তি দেন। তিনি বলেন, যার অস্তিত্ব নেই তা মোনাড অপূর্ণ নয়, পূর্ণ। কাজেই এর অস্তিত্ব আছে।

পরমাণুবাদের মূল কথা হলো বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে যে সূক্ষ্মতম অংশ পাওয়া যায়, যাকে আর ভাঙা যায় না, তা-ই পরমাণু। এ পরমাণুই বস্তুর আদিম তত্ত্ব। লাইবনিজ পরমাণুকে জড়াত্মক মনে করেন না। তাঁর মতে, যা জড়াত্মক তার বিস্তৃতি আছে। আর যার বিস্তৃতি আছে তা-ই বিভাজ্য। কিন্তু পরমাণু অবিভাজ্য। কাজেই পরমাণু জড়াত্মক নয়।

লাইবনিজের মোনাড সক্রিয়, প্রাজ্ঞ ও গবাক্ষহীন। তার এই মোনাডবাদ বা চিৎপরমাণুবাদকে পিরামিডের সাথে তুলনা করা যায়, যার সর্বনিম্ন স্তরে চেতনা সুপ্ত, ক্রমান্বয়ে উপরের স্তরগুলো উচ্চ চেতনা যুক্ত। লাইবনিজের মতে ঈশ্বর চিৎপরমানুর চিৎপরমাণু তথা সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু। ঈশ্বর পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ঐক্য বা শৃঙ্খলার মাধ্যমে গবাক্ষহীন চিৎপরমাণু গুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছেন।

বার্কলির আত্মগত ভাববাদ বা বিজ্ঞানবাদ(Subjective Idealism of Berkeley)

আধুনিককালে খাঁটি ভাববাদী বলতে আমরা বার্কলিকে বুঝি। বার্কলির ভাববাদ জন লকের চিন্তাধারার সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে। তাঁর ভাববাদকে আত্মগত ভাববাদ বা বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। এ মতবাদ অনুসারে জাগতিক সমস্ত বস্তুই ব্যক্তিমনের বা জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। মন এবং মনের ধারণাই সত্য। বাহ্য বস্তুর প্রকৃত সত্তা নেই।

তিনি বলেন, কেবল গৌণ গুণ নয়, মুখ্য গুণগুলোও মননির্ভর। মুখ্য গুণকে বস্তুনির্ভর বলার কোনো অর্থ নেই। গৌণ গুণগুলো যেমন মনের ধারণা তেমনি মুখ্য গুণগুলোও মনের ধারণা। উভয় প্রকার গুণই মননির্ভর। কাজেই বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মন এবং মনের ধারণারই অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ মন এবং মনের ধারণাকেই সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্য কথায়, যা সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করা যায় তাই সত্য, তারই অস্তিত্ব আছে। কাজেই 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর' (Esse est percipi)। যে শব্দ কেউ শোনেনি তা অস্তিত্বহীন। তিনি বলেন, উভয় প্রকার গুণই(মুখ্য ও গৌণ) মননির্ভর।

বার্কলির ভাববাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ(Berkeley's Idealism & Solipsism)

আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে “আমি” এবং “আমার ধারণা”-ই সত্য। আমি আমার এবং আমার ধারণার আত্মকেন্দ্রিকতাবাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত। কেননা, আমি আমাকে এবং আমার ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। ইংরেজি ‘Solipsism’ কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘Solus’ থেকে যার ইংরেজি শব্দ হলো alone এবং বাংলা প্রতিশব্দ হলো ‘কেবল’ এবং ‘ipse’ হলো self বা ‘আমি’—যার অর্থ দাঁড়ায়, আমারই কেবল অস্তিত্ব আছে।

দার্শনিক হিউম মনে করেন, তিনি একজন নিছক আত্মকেন্দ্রিকতাবাদী ছিলেন। বার্কলি কিন্তু ঈশ্বরকে টেনে এনে তাঁর এ বদনাম থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনিই বলেছিলেন, সবকিছুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর করে। আর যদি তাই হয়, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রত্যক্ষণের উপরই নির্ভর করবে। তাহলে তিনি একজন নিছক আত্মকেন্দ্রিকতাবাদী।

কান্টের ভাববাদ(Kantian Idealism)

বার্কলির পরে ভাববাদের জোর বৃদ্ধি করে ভাববাদকে এক নতুন পথে নিয়ে যান কান্ট। কান্টের এ নতুন মতবাদকে অবভাসিক ভাববাদ' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর এ নতুন পথ বেয়ে পরবর্তীকালে ভাববাদের চরম পরিণতি হেগেলের পরব্রহ্মবাদ গড়ে ওঠে।

ভাববাদীদের মতে, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাননির্ভর। কান্টও এ কথা স্বীকার করেন। কান্ট বলেন, প্রত্যেক বস্তুর যেমন আকার ও বস্তু থাকে, জ্ঞানেরও তেমনি আকার ও বস্তু আছে। এ দুটো মিলেই জ্ঞান হয়। বুদ্ধি দেয় জ্ঞানের আকার। সংবেদন দেয়

বস্তু। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্বিষয় থেকে আমরা যে সংবেদন পাই তার নাম অনুভব। অনুভব দেশ ও কাল এ দুটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকারের পোশাকেই উপস্থিত হয়। কান্ট এ অনুভবের নাম দিয়েছেন আভাস। এ আভাস জ্ঞান নয়। আভাস যখন দ্রব্য, কারণ প্রভৃতি বুদ্ধির আকারপ্রাপ্ত হয় তখনই জ্ঞান হয়। এমন ১২ টি বৌদ্ধিক আকারের উল্লেখ করেন তিনি। কান্ট এ বুদ্ধির আকারে আকারপ্রাপ্ত আভাসের নাম দেন অবভাস। অবভাসই জ্ঞানের বস্তু বা বিষয়। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপরই নির্ভরশীল। অন্য কিছু ওপরে নির্ভরশীল নয়। কান্টের আগের দার্শনিকদের ধারণা ছিল জ্ঞান বস্তুর ওপরই নির্ভর করে। বস্তু আছে তাই জ্ঞান হয়। কান্ট বলেন, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করে। তাঁর এ মতবাদকে দর্শনের ইতিহাসে কোপার্নিকাস বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। টলেমি বলেছেন, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। পরে কোপার্নিকাস এ মতের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তেমনি কান্টও তাঁর আগের দার্শনিকদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করে বস্তুজগৎকে মনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

কান্টের মতে বস্তু-স্বরূপ জ্ঞাননির্ভর নয়; বস্তু-স্বরূপের দিক থেকে তিনি ভাববাদী নন। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল এ অর্থে তিনি ভাববাদী। অবভাস জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।। সেজন্য তাঁর ভাববাদের নাম অবভাসিক ভাববাদ। সুতরাং জ্ঞানের বিষয়বস্তুরূপে যে জগৎ সে জগৎ আমাদের মনের সৃষ্টি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের মনগড়া জগৎ হলেও অলীক নয়। এ জগৎ বাস্তব এবং আমরা সকলেই এ জগৎকে জানতে পারি।

কান্টের অবভাসিক বা অতীন্দ্রিয় ভাববাদ শেষে অজ্ঞেয়বাদে পরিণত হয়েছে। পরমসত্তা সম্পর্কে যদি জ্ঞান লাভ করা বা তাকে জানা সম্ভব না হয়, তাহলে তত্ত্ববিদ্যা কিভাবে সম্ভব হতে পারে কান্ট তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেননি। কান্ট তার Critique of pure reason গ্রন্থে পরমসত্তা সম্পর্কে যা কিছু বলতে চেয়েছেন তা হেয়ালিপূর্ণ মনে হয়েছে।

ফিকটে-এর পরব্রহ্মবাদ Fichte's Absolute Idealism

ফিকটের মতে মন বা অহংই চরম তত্ত্ব তথা পরমসত্তা। তিনি এ চরম তত্ত্বকে আবার শিব, সক্রিয় বুদ্ধি, অবিমিশ্র ইচ্ছা ইত্যাদি নাম দেন। এ পৃথিবী হলো বিশুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ। বিশুদ্ধ ইচ্ছা হলো পরম তত্ত্ব। জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে সংবেদনসৃষ্ট নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে অহং বা মনের সৃষ্টি। ‘অহং’ বা পরম মন সসীম মনের স্রষ্টা। এটা আবার অবচেতনেরও স্রষ্টা। জড় জগৎ বা অচেতন তার অস্তিত্বের জন্য মনের ওপর নির্ভর করে। জগৎ সসীম মনের সৃষ্টি নয়। পরম মনই একে সৃষ্টি করেছে। এ পরম মন এমন এক বিশুদ্ধ চিন্তা যা বহির্জগতে আস্তে আস্তে তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি পায়। সুতরাং ফিকটের ভাববাদ এক প্রকারের পরব্রহ্মবাদ। এটাকে একটা নৈতিক ভাববাদও বলা চলে। কেননা, কর্তব্যই সত্তা। সত্তা ধীরে ধীরে প্রকৃতিতে বিধৃত হয়ে নিজ কর্তব্য পালন করে এবং নিজের পূর্ণতা উপলব্ধিতে সচেতন হয়।

শেলিং-এর অতীন্দ্রিয় ভাববাদ Schelling's Transcendental Idealism

ফিকটে সমস্ত কিছুকেই পরম মনের প্রকাশ বলে মনে করেন। তিনি সমস্ত কিছুকেই অহং-এ পর্যবসান তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। শেলিং তাঁর দার্শনিক আলোচনার শুরু এখান থেকে করলেও তিনি ক্রমে পরব্রহ্মবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী হন। তিনি মন এবং জড় উভয়ের প্রয়োজন উভয়ের জন্য বলে স্বীকার করেন।

হেগেল-এর পরব্রহ্মবাদ বা বস্তুগত ভাববাদ(Hegel's Absolute Idealism or Objective Idealism)

হেগেলের মতে চরম তত্ত্ব হলো পরমাত্মা, পরব্রহ্ম বা পরম বীশক্তি(absolute reason)। পরমাত্মাই হলো সত্তা। জীবাত্মা পরমাত্মারই পরমাত্মারই খণ্ড প্রকাশ। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকেই উদ্ভূত। জীবাত্মার মধ্য দিয়ে পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। জীবাত্মা ও জড় বস্তু উভয়ই পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের প্রকাশ। তাই এরা মূলত এক। আর সেজন্যই জীবাত্মা বস্তুর এবং পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। এ পরমাত্মা এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক সত্তা। এ সত্তা চেতন-সত্তা— একাধারে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়। চেতন্য বা আত্মারূপে জীবজগতের মধ্যে এ সত্তা প্রকাশিত হয়।

হেগেলের মতে, পরব্রহ্ম নিষ্ফল ও নির্গুণ—এর ভেতরে সমস্ত কিছুর স্থান আছে। ‘সীমার মাঝে অসীম’কে প্রকাশ করাই এর লীলা। নানা বৈচিত্র্যের ভেতর নিজেকে প্রকাশিত করাই এর বৈশিষ্ট্য। এ প্রকাশলীলা দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিতে (Dialectic method)চলে। এ লীলার উৎপত্তি ও পরিণতি পরমসত্তাতেই।

দ্বন্দ্বিক গতিতে নয়(thesis), প্রতিনয়(antithesis) ও সমন্বয় এ তিন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। নয় এ যা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিনয়ে তার বিরুদ্ধ ধারণার মধ্য দিয়ে সমন্বয়ে তা এক উচ্চ ধারণায় সমন্বিত হয়। এই সমন্বয় ক্রমাগত চলতে থাকে। এভাবে বাদ, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করে।

হেগেলের ভাববাদকে বস্তুগত ভাববাদ বলা হয় এজন্য যে, এতে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আত্মগত ভাববাদ বহির্জগতের ব্যক্তিমন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

শোপেনহাওয়ারের ভাববাদ (Schopenhauer's Idealism) : জার্মান দুঃখবাদী দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ারের (১৭৮৮-১৮৬০) দর্শন ভাববাদী ধারার। তবে হেগেলের দর্শনে যেখানে ‘পরম ধারণা’-র এবং ফিটের দর্শনে ‘পরম অহম’-এর গুরুত্ব দেখতে পাই, সেখানে শোপেনহাওয়ারের দর্শনে ‘পরম ইচ্ছাশক্তি’-র (Absolute Will) গুরুত্ব দেখতে পাই। শোপেনহাওয়ার তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The World as Will and Idea" তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থটির আলোচনা একটা সুপরিচিত উক্তি দিয়ে শুরু এবং উক্তিটি হচ্ছে ‘জগত আমার ধারণা’ (The world is my idea)। এদিক থেকে তিনি বার্কলির সঙ্গে একমত পোষণ করেন, অর্থাৎ তিনিও বার্কলি-র মতো মনে করেন যে, ধারণা (idea) বা মননই জগত। তবে তিনি তাঁর মননযন্ত্রের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ইচ্ছাশক্তিই এই মননযন্ত্রের আসল বস্তু, ধীশক্তি বা বুদ্ধি (intellect) নয়। এভাবে তিনি বার্কলির আত্মগত ভাববাদকে বস্তুগত ভাববাদে পরিণত করেন। শোপেনহাওয়ার জোরালোভাবে বলেন যে, আত্মা বা ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে সক্রিয়তা (activity), প্রতিযোগিতা (striving), সংগ্রাম (struggling) এবং কামনা (desiring)।

শোপেনহাওয়ার বলেন যে, ইচ্ছাশক্তিই পরম সত্য। ইচ্ছাশক্তি দেশ, কাল ও কার্যকারণের উর্ধ্বে। ইচ্ছাশক্তিকে দেশ, কাল ও কার্যকারণের গণ্ডিতে আনলেই ভ্রম বা মায়ায় সৃষ্টি হয়। ইচ্ছাশক্তি জগতের সর্বত্রই বিরাজিত। সার্বিক বা পরম ইচ্ছাশক্তির কোন বিলয় বা ধ্বংস নেই। শোপেনহাওয়ার তাঁর দর্শনে ধীশক্তি বা বুদ্ধির পরিবর্তে ইচ্ছাশক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন বলে তাঁর ভাববাদকে ঐচ্ছিক ভাববাদ-ও (Voluntaristic Idealism) বলা হয়।

হেগেলের দর্শনের বিরুদ্ধে যেসব শক্তিশালী চিন্তাবিদ ও লেখক প্রতিবাদ জানান, তাঁদের মধ্যে জোন ফ্রিডরিক হার্বার্ট (Johann Friedrich Herbert) এবং আর্থার শোপেনহাওয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেগেলকে যেমন ‘জার্মান ভাববাদের রাজকুমার’ বলে আখ্যায়িত করা যায়, তেমনি শোপেনহাওয়ারকে ‘দুঃখবাদীদের রাজকুমার’ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

শোপেনহাওয়ারের মতে, সমস্ত জগতেই ইচ্ছাশক্তির লীলাখেলা চলছে। ইচ্ছাশক্তিই সমগ্র জগতের প্রাণস্পন্দন। ইচ্ছাশক্তি রয়েছে মানব জগতে, ইচ্ছাশক্তি রয়েছে প্রাণিজগতে, ইচ্ছাশক্তি রয়েছে উদ্ভিদজগতে, ইচ্ছাশক্তি রয়েছে জড়জগতে। মূলত, যেখানে ইচ্ছাশক্তি নেই, সেখানে ধারণা-ও নেই ; জগত-ও নেই (No Will : no idea, no world) । আর এর ফলে তখন আমাদের সামনে কেবল শূন্যতা-ই (nothingness) বিরাজ করে ।

নব্য-ভাববাদ (Neo-Idealism) : নব্য-ভাববাদ সমসাময়িক মতবাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। ইতালীয় দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচে (Benedetto Croce) ও জিওভানি জেন্টিলে (Giovanni Gentile) এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। স্বদেশজাত ইতালীয় প্রভাবের ফলে বিকশিত হেগেলীয়বাদের একটা প্রধান শাখাকে নব্য-ভাববাদ চিত্রিত করে। নব্য-ভাববাদ নামে খ্যাত ইউরোপীয় এই দর্শনকে কেউ কেউ হেগেলীয় বাম বলে আখ্যায়িত করেন এবং ব্র্যাডলির দ্বারা চিত্রিত হেগেলীয় ডান-এর সাথে তুলনা করে পার্থক্য দেখান।

Theories of Reality: (সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদ)

জগতের মূল উপাদান বা সত্তা, সত্তার স্বরূপ ও সত্তার সংখ্যা নিয়ে দর্শনের যে শাখায় আলোচনা করা হয়ে থাকে, তাকেই তত্ত্ববিদ্যা বা সত্তাসম্পর্কীয় দর্শন বলা হয়ে থাকে। এ দৃশ্যমান জগতের সংগঠনের আড়ালে যে মূল উপাদান বা সত্তা আছে তার প্রকৃত স্বরূপ জড়, না মন বা আধ্যাত্মিক শক্তি—এ নিয়ে দর্শনে জড়বাদ বা বস্তুবাদ ও ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের উদ্ভব

হয়েছে। আবার, এ দৃশ্যমান জগতের সংগঠনের আড়ালে যে মূল উপাদান বা সত্তা রয়েছে, তা এক, না দুই, না দুইয়ের অধিক – এ নিয়ে দর্শনে অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদের উদ্ভব হয়েছে।

অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদ (Monism)

অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদ জোরালো ভাষায় বলে যে, বিশ্বের আদি সত্তা এক। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই একটা মাত্র আদিবস্তু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগত ঐ আদি বা পরমসত্তারই অবভাসিক রূপ। বস্তুত, বহুর মাঝে এক পরমসত্তার সন্ধান করাই অদ্বৈতবাদের একটা মূল উদ্দেশ্য।

অদ্বৈতবাদীদের মতে, সত্তা বহুও নয় বা বিপরীতধর্মীও নয়, বরং এ এক এবং অদ্বিতীয়। এই একক সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করাই দর্শনের কাজ। এই একক বা পরমসত্তার স্বরূপ নিয়ে অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই মতভেদের মধ্যে প্রধান দুটি মতবাদ হলো পরমসত্তা মূর্ত, না অমূর্ত, এ নিয়ে; আর এর ফলেই অদ্বৈতবাদের মধ্যে অমূর্ত অদ্বৈতবাদ ও মূর্ত অদ্বৈতবাদ নামে দুটি ধারা দেখা যায়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. অমূর্ত অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদ (Abstract Monism) : পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) অমূর্ত অদ্বৈতবাদের অন্যতম ধারক ও বাহক। স্পিনোজার মতে, একমাত্র পরমসত্তাই সত্য এবং এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগত মিথ্যা। ভারতীয় দার্শনিক শংকরও অমূর্ত অদ্বৈতবাদের কথা প্রচার করেছেন।

স্পিনোজার মতে, একমাত্র ঈশ্বরই পরমসত্তা। এ জগতের বৈচিত্র্য হচ্ছে এই ঈশ্বর বা পরমসত্তার অবভাস মাত্র। তাই এই বৈচিত্র্য মিথ্যা, একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। কেননা ঈশ্বর একটা দ্রব্য (Substance)। তাঁর মতে, দ্রব্য স্বনির্ভর, যার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভর করতে হয় না। এই ঈশ্বরকে নির্ণয় করা যায় না। ঈশ্বরের অসংখ্য গুণ আছে। এই অসংখ্য গুণের মধ্যে আমরা তাঁর দুটি প্রধান ও সমান্তরাল গুণকেই জানতে পারি। এ দুটি গুণ হচ্ছে বিস্তৃতি ও চেতনা। ঈশ্বরের বাইরে কোন কিছুই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং ঈশ্বর ছাড়া কোন কিছুই সত্য নয়। স্পিনোজার এই মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) বলা হয়ে থাকে।

খ. মূর্ত অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদ (Concrete Monism) : জার্মান দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৯৩১) মূর্ত অদ্বৈতবাদ বা একত্ববাদের অন্যতম ধারক ও বাহক। তাঁর মতে, এ জগত অসীক বা মিথ্যা নয়, বরং এ জগত পরমসত্তার পূর্ণ প্রকাশ। এই পরম সত্তা একক এবং এ পরম সত্তা বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ ও উপলব্ধি করেন। পরমসত্তা ছাড়া জগত যেমন অর্থহীন, তেমনি জগত ছাড়া পরমসত্তা বা পরমাত্মাও অর্থহীন। একমাত্র বৈচিত্র্যের মাধ্যমেই ঐক্যের স্বরূপকে উপলব্ধি করা যায়। তাই ঐকা ও বৈচিত্র্য পরমসত্তার দুটি রূপ বা দিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

হেগেলের মতে, পরমসত্তা হলো পরমাত্মা এবং এই পরমাত্মাই একমাত্র স্বনির্ভর সত্তা। স্পিনোজার মতে, এ জগত অলীক বা মিথ্যা। কিন্তু হেগেলের মতে, এ জগত অলীকও নয় বা মিথ্যাও নয়, বরং এ জগতের স্বার্থকতা আছে এবং এ জগত পরমাত্মা-নির্ভর সত্তা। জড়বস্তু ও জীবাত্মা নিয়ে গঠিত এ বিশ্বজগত পরমসত্তা থেকেই উদ্ভূত। বিশ্বজগত যেমন পরমসত্তা ছাড়া অর্থহীন, তেমনি পরমসত্তা বিশ্বজগত ছাড়া অর্থহীন। ঈশ্বর ও জগত উভয়ই সত্য। জগতের সব বস্তুই ঈশ্বরের এক একটি অনিবার্য অংশ। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগতের ভিতরেও আছেন এবং বাইরেও আছেন। এজন্য এই মতবাদকে সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism) বলা হয়ে থাকে। হেগেল ছাড়াও কেয়ার্ড (১৮৩৫-১৯০৮), রয়েস (১৮৫৫-১৯১৬) প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এই মতবাদকে সমর্থন করেন। ভারতীয় দার্শনিক রামানুজও এ মতবাদের সমর্থক।

একেশ্বরবাদ (Monotheism) : একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করেই একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়েছে। মূর্ত অদ্বৈতবাদের মতো এই একেশ্বরবাদ বহু দেবদেবীবাদ ও দ্বীশ্বরবাদের দোষ-ত্রুটিকে মুক্ত করে মানুষের মনে এক অসীম, অনন্ত, সর্বশক্তিমান ও পূর্ণ ঈশ্বরের ভাব জাগিয়ে দিয়ে মানুষকে তুষ্ট করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

দ্বৈতবাদ(Dualism)

দ্বৈতবাদ অনুসারে জড় ও মন হলো দুটি স্বতন্ত্র ও পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তা এবং এ দুটি সত্তাই বিশ্বজগতের আদিম বা মূল উপাদান। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, গ্রিক দার্শনিক থেলিস থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত

অনেক প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকই প্রকাশ্যভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে দ্বৈতবাদের দর্শনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এসব গ্রিক দার্শনিকের মধ্যে অ্যানাক্সাগোরাসই সর্বপ্রথম জড় ও মানস সত্তার অস্তিত্ব তাঁর দর্শনে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতে, মন বা চেতনা (Nous) জড়াত্মক পরমাণুকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্লেটো যদিও ধারণার জগতে বিশ্বাসী ছিলেন, তথাপি তিনি সার্বিক ও বিশেষ-এর (universal and particular) এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাতীত জগতের কথা বলতে গিয়ে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছেন। আবার, দার্শনিক অ্যারিস্টটলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি উপাদান এবং আকারকে তাঁর দর্শনে স্বীকার করে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বস্তুত, যথার্থ দ্বৈতবাদের উদ্ভব আধুনিক দর্শনের জনক দেকার্তের দর্শন থেকেই শুরু হয়। দেকার্তের মতে, জড় ও মন দুটি স্বতন্ত্র ও পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তা। জড়ের ধর্ম বিস্তৃতি এবং মনের ধর্ম চেতনা।

দ্বীশ্বরবাদ (Ditheism) : দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন দেহ ও মন নামক দুটি আদিম বা মূল উপাদানের আলোচনা দেখা যায়, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রেও দুটি ঈশ্বর বা পরমসত্তার আলোচনা দেখা যায়। দ্বীশ্বরবাদে ঈশ্বরের দুটি সত্তা বা অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়। প্রাচীন পারসিক বা ইহুদীদের ধর্মমতের মধ্যে এই মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরের দুটি রূপের অস্তিত্বের মধ্যে একটা হলো আলো বা কল্যাণের প্রতীক এবং অপরটি অন্ধকার বা অকল্যাণের প্রতীক। পারসিকদের মতে, যে ঈশ্বর কল্যাণের প্রতীক, তাঁকে বলা হয় 'আহুরা মাজদা' এবং যে ঈশ্বর অকল্যাণের প্রতীক, তাঁকে বলা হয় 'অহিমেন'। আর এই দুই পরস্পর-বিরোধী অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব থেকেই এ জগতের কল্যাণ-অকল্যাণ বা শুভ-অশুভের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বহুত্ববাদ(Pluralism)

বহুত্ববাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এ বিশ্বজগত বিভিন্ন ধরনের উপাদানে পরিপূর্ণ। এসব উপাদান স্বতন্ত্র এবং এক থেকে অন্যতে বিচ্ছিন্ন। পরিদৃশ্যমান জগত বৈচিত্র্যে ভরা। এ বৈচিত্র্যই প্রমাণ করে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে অসংখ্য সত্তা রয়েছে। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের সন্ধান এক বা দুয়ের মাঝে পাওয়া যায় না, এর সন্ধান মিলে একমাত্র বহুর মাঝে। কেবল জড়বস্তু বা আত্মার মধ্যে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগতের প্রকৃত স্বরূপ বা মূল উপাদান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বহুত্ববাদের সারকথা এই যে, এই বিশ্বজগত বহু মূল উপাদান বা সত্তার সংযোগের ফলে গঠিত। সাধারণত, বহুত্ববাদের প্রথম সবিশেষ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এম্পিডক্লিসের দর্শনে। তিনিই, তাঁর দর্শনে পারমেনাইডিসের একক সত্তাকে আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু নামে চারটি মূল উপাদানে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে, এই মূল উপাদানের সমন্বয়ে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি। পরমাণুবাদীদের ও অ্যানাক্সাগোরাসের দর্শনও বহুত্ববাদের কথা বলে।

ক. জড়াত্মক বহুত্ববাদ বা জড় পরমাণুবাদ (Materialistic Pluralism or Atomism) : জড়াত্মক বহুত্ববাদ বা জড় পরমাণুবাদের মতে, অসংখ্য জড়াত্মক সত্তা বা জড় পরমাণুর সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণের ফলেই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জড় পরমাণুই দৃশ্যমান জগতের আসল এবং আদিম উপাদান। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (খ্রিস্ট পূর্ব আনুমানিক ৪৬০- ৩৭০) পাশ্চাত্য দর্শনে এ জড়াত্মক সত্তা বা জড় পরমাণুবাদের প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, কোন দ্রব্যকে যদি ক্রমাগত বিভক্ত করা হয়, তাহলে কতকগুলো সূক্ষ্ম কণা পাওয়া যায়, যেগুলো আর বিভক্ত করা যায় না। আর এই অবিভাজ্য কণাগুলোর নামই পরমাণু। এই পরমাণু অবিনশ্বর ও স্বতন্ত্র এবং এই পরমাণুই জড়বাদের ভিত্তি। এই পরমাণুগুলোর মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে, কিন্তু কোন গুণগত পার্থক্য নেই।

বিজ্ঞানী ডাল্টন ডেমোক্রিটাসের মতকে সমর্থন করেন এবং বলেন যে, পরমাণু নিশ্চল জড় এবং বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে শুধু পরিমাণগত পার্থক্য আছে। পরমাণুবাদের মতে, স্বনির্ভর অসংখ্য জড়াত্মক পরমাণু বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মহাশূন্যে সৃষ্টির শুরুতে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিল। এই পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গতির ফলে, অর্থাৎ আকস্মিকভাবে পরমাণুগুলোর সংযোগ ও বিয়োগের ফলেই জড়জগতের উৎপত্তি। এই জড় পরমাণু থেকেই প্রাণ ও জীবদেহের সৃষ্টি হয়।

খ. আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ বা চিৎপরমাণুবাদ(Spiritualistic Pluralism or Monadism) : আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ চিৎপরমাণুবাদের প্রবর্তক জার্মান দার্শনিক নয়, বরং চিৎপরমাণুর দ্বারা গঠিত। গ্রিক পরমাণুবাদীদের মতে, জড় পরমাণুই বিশ্বের। (১৬৪৬-১৭১৬)। লাইবনিজের মতে, এ বিশ্বজগত জড় পরমাণু দ্বারা গঠিত আদিম উপাদান। কিন্তু লাইবনিজ গ্রিক

পরমাণুবাদীদের মতবাদকে সমালোচনা করে বলেন যে, চিৎপরমাণু বা চেতন পরমাণুই জগতের মূল বা আদিম উপাদান। এসব চিৎপরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য এবং এগুলো সক্রিয়, অবিভাজ্য ও আধ্যাত্মিক, লাইবনিজের মতে, জড় পরমাণু অবিভাজ্য হতে পারে না, কেননা জড়ের লক্ষণ বিস্তৃতি। পরমাণু তখনই অবিভাজ্য হতে পারে যখন পরমাণুর কোন বিস্তৃতি থাকে না। তাই পরমাণুকে অবিভাজ্য হতে হলে আধ্যাত্মিক হতে হবে। লাইবনিজ মনে করেন যে, স্বনির্ভরতা দ্রব্যের প্রধান ধর্ম বা লক্ষণ নয়, বরং আত্ম-সক্রিয়তা-ই (self-activity) দ্রব্যের প্রধান ধর্ম।

লাইবনিজের মতে, চিৎপরমাণু স্বনির্ভর, আত্মকেন্দ্রিক ও সক্রিয়। আর এক চিৎপরমাণু অপর চিৎপরমাণুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং বাইরে থেকে কোন প্রভাব এদের উপর পড়তে পারে না, এ গবাক্ষবিহীন (windowless)। এই গবাক্ষবিহীন চিৎপরমাণুসমূহ যদিও চেতনধর্মী, তথাপি সব চিৎপরমাণুতেই সমানভাবে চৈতন্য উপস্থিত থাকে না। এ হিসেবে জীবাণু আত্মসচেতন চিৎপরমাণু, প্রাণীর আত্মা চেতন চিৎপরমাণু, উদ্ভিদের আত্মা অবচেতন চিৎপরমাণু এবং জড়ের আত্মা নিজ্ঞান চিৎপরমাণু। তাই যেসব চিৎপরমাণুর সক্রিয়তা অন্যান্য চিৎপরমাণুর চেয়ে কম, তাদেরই জড় বলা হয় এবং জড়েরও চেতনা আছে, কিন্তু সে চেতনা স্পষ্ট নয়।

স্বতন্ত্র এবং আত্মকেন্দ্রিক হলে কিভাবে বিভিন্ন চিৎপরমাণুর মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে? লাইবনিজ এ প্রশ্নেরও সমাধান করেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর শ্রেষ্ঠতম চিৎপরমাণু (Monak of monads) এবং তিনিই এই চিৎপরমাণুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর গবাক্ষবিহীন আত্মকেন্দ্রিক চিৎপরমাণুগুলোর মধ্যে একটি পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা বা ঐক্য (pre-established harmony) স্থাপন করেছেন। তাই চিৎপরমাণু যদিও গবাক্ষবিহীন, তথাপি ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার মাধ্যমেই এই জগত সুশৃঙ্খল, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরম ঐক্যের প্রতীক বহন করে।

বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism): বহুত্ববাদের উপর নির্ভর করে অনেকের কাছে বহু ঈশ্বরবাদ বা বহুদেবদেবীবাদের প্রশ্ন জেগে উঠে বলে মনে করা হয়। বস্তুত, বহুদেবদেবীবাদের উৎস বহুত্ববাদের দর্শনের উপর ভিত্তি করেই পাওয়া যায়। বহুদেবদেবীবাদ একাধিক দেবতার সত্তায় বিশ্বাসী।

Topic 04 – Materialism, Theories of Evolution

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- জড় সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকগণের অভিমত
- জড়বাদের স্বরূপ ও বিভিন্ন ধারাসমূহ
- বিভিন্ন প্রকারের বিবর্তনবাদের মূল বক্তব্য

সোর্স সমূহ:

- সংশ্লিষ্ট টপিকের Live mcq Lecture pdf
- দর্শনের কথা- আব্দুল বারী
- Introduction to philosophy – Jadunath Sinha

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ (Topic 04)

Matter (জড়)

Nature of matter in ancient Greek Philosophy :

গ্রিস দেশের আওনীয়া নামক দ্বীপে থেলিস্ প্রচার করেন, 'জলই বস্তুর আদিম উপাদান। জলে সবকিছুর উৎপত্তি এবং জলেই সবকিছু লয়প্রাপ্ত হয়। তাঁর পরবর্তী দার্শনিক অ্যানাক্সিমাণ্ডার আদিম উপাদানের নাম দিলেন, অসীম বা অনন্ত। অ্যানাক্সিমিনিসের মতে, 'বায়ু' হলো মূল উপাদান। কিন্তু হিরাক্লাইটাস্ এ মত গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি অগ্নিকেই

আদিম উপাদান বলে মনে করেন। কেননা পরিবর্তন জগতের ধর্ম এবং অগ্নি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। হিরাক্লাইটাসের মতে, 'অগ্নি'ই জগতের মূল উপাদান।

হিরাক্লাইটাসের পর এম্পিডক্লিস পূর্ববর্তী সবগুলো মতের সমন্বয় করে বললেন যে, মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু —এ চারটিই হলো জগতের আদিম উপাদান। সমস্ত কিছুই এদের থেকে সৃষ্ট। ডিমক্রিটাস ও লিউকিপাস নামক পরবর্তী দুজন দার্শনিকের মতে, সমস্ত বস্তুর আদিম উপাদান এক নয়— ডিমক্রিটাস ও লিউকিপাসের মতে, বহু গতিশীল সূক্ষ্ম 'পরমাণু'। এই পরমাণুগুলোর কোনো গুণগত পার্থক্য নেই, কিন্তু পরমাণুই জড় বস্তুর মূল উপাদান। আকার ও আকৃতিগত পার্থক্য আছে। পরমাণুগুলোই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। এদের নিজস্ব কোনো গতি নেই। গতি বাইরে থেকে পরমানুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রসায়নবিদ জন ডাল্টন ডেমোক্রিটাসের পরমানুবাদের সংস্কার করে নতুনভাবে পরমানুবাদের পত্তন করেন। তিনি জড়কে পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট হিসেবে দেখান।

প্লেটো জড়কে অনির্বচনীয় শূন্য (Nothing) বলেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে যা-কিছুই পরিবর্তিত হয় তাই জড়। আর যার জন্য পরিবর্তন হয় তাকে 'আকার' বলেছেন। তার মতে এই জড় ও আকার মিলেই পার্থিব বস্তুর আকৃতি দেয়।

Nature of matter in Modern Philosophy :

দেকার্তের মতে জগতে ২ টি দ্রব্য আছে, জড় ও মন। স্পিনোজা ঈশ্বরকেই একমাত্র দ্রব্য বলেন। লাইবনিজের মতে চিৎপরমানু(monad) দ্রব্য। জন লক মূখ্য গুণ ও গৌণ গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যের কথা বলেন। এই আধারকেই জড় বলেন। কিন্তু তার মতে এই আধার বা দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়না, তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। বাকলির মতে জড়ের কোন অস্তিত্ব নেই, জড় মনের ধারণা মাত্র। মিল ও হিউমের মতেও জড়ের কোন অস্তিত্ব নেই।

Materialism(জড়বাদ)

জড়বাদ জড়কেই বিশ্বের পরম সত্তা মনে করে। এ বিশ্বের সবকিছুই জড় থেকে উদ্ভূত। এমন কি প্রাণ এবং মনের উৎপত্তিও জড় থেকে। জড় বিস্তৃতি ও অভেদ্যতা এ দুই গুণসম্পন্ন। গতি হচ্ছে জড়ের ধর্ম। জড় ও গতির সাহায্যে যান্ত্রিকভাবে জগতের সর্ব প্রক্রিয়া এমন কি জৈবিক এবং মানসিক প্রক্রিয়াকেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যন্ত্রের যেমন স্বাধীনতা নেই, জাগতিক ব্যাপারেও স্বাধীনতাবলে কিছু নেই। সবকিছু ছকে বাঁধা নির্দিষ্ট প্রণালীতে ঘটে চলেছে। জড়বাদ পরমাণুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জগতের জড় বস্তুগুলো পরমাণুরই সমষ্টি। পরমাণু অবিচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অবিদ্যমান ও শাস্ত্র। পরমাণুর আকস্মিক ও যান্ত্রিক সমাবেশ থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। জগতে নীতি, ধর্ম বলে কিছু নেই। কেননা মানব ইচ্ছার কোনো স্বাভাবিকতা নেই। সবকিছুই কেবল জড়ের খেলা।

জড়বাদীদের মূল বক্তব্য সমূহ:

প্রথমত, জড়বাদীরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে মেনে নেন। যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। জড়কেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং জড়েরই অস্তিত্ব আছে। ঈশ্বর, আত্মা, পুরলোক ইত্যাদি প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। কাজেই এসব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা অপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করার কোনো অর্থ নেই।

দ্বিতীয়ত, জড়ের কাজ যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়। জড় ও গতির ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়। জড় ও গতির মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই। সে কারণে জড়বাদীরাও জগতের মূলে কোনো উদ্দেশ্য ও জগতের মধ্যে কোনো আদর্শকে স্বীকার করেন না।

তৃতীয়ত, জড়বাদীরা শক্তির নিত্যতা নিয়মে বিশ্বাসী। জগতের বস্তুগুলোর কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। তাদের কেবল রূপগত ও পরিমাণগত পার্থক্য আছে। তাই আলো, বিদ্যুৎ, চুম্বক, রাসায়নিক সম্বন্ধ, যান্ত্রিক গতি, ইত্যাদি একে অন্যে পরিবর্তনযোগ্য।

চতুর্থত, জীবন বা প্রাণের উদ্ভব জড় থেকেই। জড়ের সঙ্গে জীবনের কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। জড়ের জীবকোষ তুলনায় প্রাণ জটিল। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জানা গেছে যে, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টি। সুতরাং জীবন বা প্রাণ জড়াতিরিক্ত কোনো সত্তা নয়।

পঞ্চমত, মন বা চৈতন্য জড় থেকেই উদ্ভূত। মস্তিষ্কের কোন স্বাধীন চেতনা-প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব নেই। জড়ই প্রকৃত বস্তু। চৈতন্য মস্তিষ্কের কোষের অনবরত ঘর্ষণজনিত ফল মাত্র।

ষষ্ঠত, জড়বাদীরা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন। জড় থেকে জগৎ ও প্রাণের উদ্ভব। জীবদেহ একটি জটিল যন্ত্রবিশেষ। প্রাণ-শক্তি জড়শক্তির ভিন্ন রূপ। মন বা চৈতন্য জড়েরই উপবস্তু। জড়শক্তি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। জড়শক্তিই বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণশক্তি ও মানসিক-শক্তিরই জটিল রূপ মাত্র। জড় বস্তুর সাথে জীবন এবং জীবনের সাথে মনের কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। কেননা এরা একই জড় এবং যান্ত্রিক নিয়মের সাহায্যে সৃষ্ট।

সপ্তমত, জড়বাদ অনুযায়ী ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। কেননা, আমাদের ইচ্ছা জাগতিক নিয়ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত জড়বাদীরা ইচ্ছার নয়। পূর্ববর্তী ঘটনাই কোনো কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং ব্যক্তি-ইচ্ছা স্বাধীন নয়।

Dialectical Materialism- Marx

কার্ল মার্ক্স দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রবর্তক। এঙ্গেলস ও লেনিন হলেন তাঁর সমর্থক। স্টেলিন মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিনের প্রধান কথাগুলোকে তাঁর ঐতিহাসিক জড়বাদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। মার্ক্স ছিলেন বামপন্থী হেগেলীয় দার্শনিক।

মার্ক্স হেগেলের পরিণতিমূলক ব্যাখ্যাকে বাতিল করে দিয়ে বলেন যে, দৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে জড় ও তার গতির স্বাভাবিক পরিণতি। জাগতিক বিবর্তনের মূলে কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা বা উদ্দেশ্য নেই। বিবর্তন হচ্ছে জড়ের খেলা। মার্ক্স বলেন, “আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলের পদ্ধতি থেকে শুধু ভিন্ন নয় বরং তা হচ্ছে একটা বিপরীত পদ্ধতি। হেগেলের কাছে চিন্তা প্রক্রিয়া বা পরম ধারণা হলো বাস্তব জগতের স্রষ্টা এবং বাস্তব জগৎ কেবল সে ধারণার বাহ্যিক আকার মাত্র। পক্ষান্তরে, আমার কাছে জড় জগৎ হলো একমাত্র জগৎ বা আদর্শ এবং মানুষ তার মনের সাহায্যে এ জড় জগৎকে চিন্তার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করে।

“প্রকৃতির প্রক্রিয়া হলো দ্বান্দ্বিক”—এঙ্গেলস।

“ উন্নতি হলো বিপরীত প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব।”— লেনিন।

"My dialectical method" says Marx, is not only different from the Hegelian, but it's direct opposite to Hegel, the process of thinking the Idea, is the Creator of real World and the real World is only external. phenomenal form of 'the idea'. With me, on the contrary, the ideal is nothing else than the material world. reflected by the human mind transformed into forms of thought."- Marx.

2 "Nature's process is dialectical"-Engels.

3."Dialectic is the study of contradiction within the very essence of things. Development is the struggle of opposites."-Lenin.

8 "It is impossible to separate thought from matter that thinks."--Marx.

DOCTRINES OF EVOLUTION AND CREATION

জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি মতবাদ আছে—বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিবাদ। সৃষ্টিবাদ অনুসারে, অতীতে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে এ অবস্থায়ই স্বেচ্ছায় ঈশ্বর এ জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিবর্তনবাদ অনুসারে, এ জগৎ একটা সহজ সরল অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বর্তমান জটিল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

What is Evolution?

বিবর্তন বলতে আমরা বুঝি—যা অপ্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন তার প্রকাশ ও প্রকটতা। যা অপ্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন তা ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও প্রকট হয়। বিবর্তনবাদীদের মতে, জগতের প্রত্যেকটি জটিল বস্তুই সহজ ও সাধারণ অবস্থা থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে জটিল হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। প্রত্যেকটি বস্তুর পেছনেই এক দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে।

বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য :

বিপ্লবের পরিবর্তন আর বিবর্তনের পরিবর্তন এক রকমের নয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তনে একটা আকস্মিকতা, অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। বিপ্লবের ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জীবনে আকস্মিক ও অস্বাভাবিকভাবে হঠাৎ এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বিবর্তনের পরিবর্তন অস্বাভাবিক ও আকস্মিক নয়, বিবর্তনের পরিবর্তন সহজ, স্বাভাবিক ও সময়সাপেক্ষ। বিবর্তন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বিষয়। এতে মানুষের কোনো হাত নেই। কিন্তু বিপ্লব মানুষের দ্বারা সৃষ্ট, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

সৃষ্টি তত্ত্ব(The Theory of Creation):

সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে আদিতে এক ঈশ্বর ছাড়া কোনো কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। ঈশ্বর কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে আপন ইচ্ছায় এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগতের বস্তুগুলোর যে রূপ আমরা এখন দেখছি, সৃষ্টির সময়ও তাদের সে রূপই ছিল। তাদের আজও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী নন (যেমন, মিল) তাঁদের মতে, প্রকৃতি থেকেই জগতের সৃষ্টি। তাঁরা ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রকৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। প্রকৃতি আপন ইচ্ছায় কোনো বিশেষ মুহূর্তে জগতের সৃষ্টি করেন। জগতের বস্তুগুলো তাদের সৃষ্টিকালের রূপ নিয়ে আজও আছে। তাদের রূপের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ঈশ্বরে বিশ্বাসী সৃষ্টি তত্ত্বের দুটি রূপ আছে। যথা—(ক) নিরপেক্ষ সৃষ্টি তত্ত্ব (The theory of Absolute Creation) এবং (খ) সাপেক্ষ সৃষ্টি তত্ত্ব (The theory of Conditional Creation)।

(ক) নিরপেক্ষ সৃষ্টি তত্ত্ব : এই মতবাদ অনুসারে অন্য কিছুই ওপর নির্ভর না করে ঈশ্বর নিজে নিজেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিছক শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন। এমন এক সময় ছিল যখন নিছক শূন্য বা কেবল জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তখন কেবল ঈশ্বরই ছিলেন। আর ঈশ্বর ছিলেন পূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকেই জগতের সৃষ্টি। ঈশ্বর একদিন তাঁর অনন্ত করুণা বর্ষণের জন্য সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। জগৎ সৃষ্টি হলো। সেই যে জগৎ সৃষ্টি হলো তা আর রূপ বদলায়নি। আমরা এখন যে রূপে দেখছি ঠিক সে রূপেই ঈশ্বর জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। জগতের বর্তমান রূপের পেছনে কোনো ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের ইতিহাস নেই।

(খ) সাপেক্ষ সৃষ্টি তত্ত্ব : সাপেক্ষ সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে নিছক শূন্য থেকে শূন্যেরই সৃষ্টি হয় না। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে নিছক শূন্য নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ত উপাদানের আশ্রয় নেন। কেউ কেউ এ উপাদানকে ঈশ্বর স্বতঃস্ফূর্ত উপাদানের জড় বা আদিম উপকরণ বলে মনে করেন। ঈশ্বর শিল্পীর মত উপাদান গ্রহণ করে তা সাহায্যে এ জগতের আকারে রূপ দেন। ফলে এই সুন্দর জগতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নন। তিনি জগতের উপাদান কারণের সৃষ্টিও করেন নি। ঈশ্বর ও জগতের উপাদান উভয়ে নিত্য, অথবা চিরস্থায়ী। ঈশ্বর কেবল জগতের নিমিত্ত কারণ সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় জগতের উপাদান অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ছিল। ঈশ্বর তাতে শৃঙ্খলা এনে এ সুন্দর জগতের সৃষ্টি করেন। সুতরাং জগৎ হলো স্বতঃস্ফূর্ত উপাদানের ঈশ্বরসৃষ্ট শৃঙ্খলাবিশেষ।

সৃষ্টি তত্ত্ব ও বিবর্তনবাদের প্রভেদ(Difference between the theory of Creation and Evolution)

প্রথমত, সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে কোনো এক শক্তি বা ঈশ্বর এক বিশেষ মুহূর্তে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে এ জগৎ বিবর্তনবাদ অনুসারে এ জগৎ কেউ সৃষ্টি করেন নি, এ জগৎ ক্রমবিকাশের ফল।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে জগতের বর্তমানের সমস্ত বস্তু সেই আদিতে সৃষ্ট জগতের বস্তুর অনুরূপ। তাদের রূপ, রং কিছুই বদলায়নি। তারা যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। পক্ষান্তরে, বিবর্তনবাদ অনুসারে জগতের প্রত্যেক বস্তুই ক্রমবিকাশের ফল। ধীর পরিবর্তনের মাঝে বহু পর্যায়ে পেরিয়ে জগতের প্রত্যেকটি বস্তু বর্তমান রূপ পেয়েছে। তাদের বর্তমান রূপ হলো জটিল। আর এই জটিল রূপ এসেছে সহজ, সরল রূপ থেকে শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

তৃতীয়ত, সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর জগৎকে কোনো বিশেষ মুহূর্তে সৃষ্টি করেছেন। বিবর্তনবাদ জগতের সৃষ্টি তত্ত্ব মতে জগৎ কোনো উৎপত্তিতে কোনো বিশেষ মুহূর্তকে স্বীকার করে না। কেননা কোনো বিশেষ মুহূর্তেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এ কথার

কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। জগৎ কোনো বিশেষ সময়ে সৃষ্টি না হয়ে বরং বহুদিন ধরে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছে।

চতুর্থত, সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে জগতের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক হলো বাহ্যিক। জগতের সাথে তাঁর কোনো আন্তর সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে, বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন হলো জগতের ধর্ম। বিবর্তনের সাথে জগৎ ক্রিয়ার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে আন্তর সম্পর্ক।

পঞ্চমত, বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক মতবাদ। বিভিন্ন বিজ্ঞান থেকে বিবর্তনবাদ নিজ মতের সপক্ষে যুক্তি এবং বিবর্তনবাদের ভিত্তি প্রমাণের অবতারণা করেছে। পক্ষান্তরে, সৃষ্টিবাদের পেছনে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ নেই। সৃষ্টিবাদের ভিত্তি হলো বিশ্বাস।

বিবর্তনবাদের মূল বৈশিষ্ট্য Chief Characteristics of Evolution

দার্শনিক কংগারের (Conger) মতে, বিবর্তনবাদের ৪ টি বৈশিষ্ট্য আছে:

১. কালিক পরিবর্তন (change in time) ২. ক্রমিক শৃঙ্খলা (serial order) ৩. অন্তর্নিহিত কারণ (Inherent cause) ৪. সৃজনমূলক সমন্বয় (creative synthesis)

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, “এ বিবর্তন প্রক্রিয়া সবসময়ই সহজ থেকে জটিল অবস্থায়, অনির্দিষ্ট ও অসংবদ্ধ অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ অবস্থায় চালিত হয়।” বিবর্তন পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল ও এ পরিবর্তন এলোমেলো নয়, শৃঙ্খলাবদ্ধ। স্পেন্সারের মতে, বস্তুর বিবর্তনে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়:

- ১। ঐক্য বিধান (Concentration)
- ২। পৃথকীকরণ বা ব্যাকৃতি (Differentiation)
- ৩। নিয়মানুগতা বা নিয়ন্ত্রণ (Determination)

DIFFERENT FORMS OF EVOLUTION

বিবর্তনবাদের বিভিন্ন রূপ আছে। এ রূপগুলো :

- (ক) যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ (Mechanical Theory of Evolution)
- (খ) পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ (Teleological Theory of Evolution)
- (গ) সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ (Creative Evolution)
- (ঘ) উল্লেখমূলক বিবর্তনবাদ (Emergent Evolution)

ক. যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ (Mechanical Theory of Evolution)

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের ভিত্তি হলো কার্যকারণ সম্পর্ক। এ মতবাদ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্দেশ্য বা আদর্শের স্থান দেয় না। নেহাত আকস্মিকভাবে জড় থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে এই অভিব্যক্তি প্রাণ, মন প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ আবার জড়বাদ ও নিসর্গবাদভিত্তিক মতবাদ। জড়বাদী ও নিসর্গবাদী দার্শনিকরা গতিকেই জগতের সমস্ত কিছুর উৎপত্তির জন্য দায়ী বলে মনে করেন। নিসর্গবাদ শক্তি, গতি, প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্যকারণ সম্পর্কের সাহায্যেই জগৎ ও জাগতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদও জড়, শক্তি, গতি, দেশ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির সাহায্যেই এ জগতের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চায়।

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে অসীম বিস্তৃত দেশে অসংখ্য পরমাণু আছে। শক্তি যখন এ পরমাণুগুলোর ওপর কাজ করে তখন সেগুলো কখনও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, কখনও বিচ্ছিন্ন হয়। এ আকস্মিক সংযোজন ও বিয়োজন থেকেই আকস্মিকভাবে জগতের সৃষ্টি হয়। জড় থেকে প্রাণ ও মনের মূলত কোনো তফাৎ নেই। প্রাণ জড়ের জটিল রূপ, মন জড় ও প্রাণের জটিলতম রূপ। জড়, অজড় সবকিছুই যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। কোথাও কোনো আদর্শের স্থান নেই।

যদিও প্রাণ ও মন জড়ের জটিল রূপ—একথা সব যন্ত্রবাদী দার্শনিক স্বীকার করেন, তবুও জড় থেকে কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে এ বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন না। ফলে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

যেমন:

ব্রিটিশ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সারের বিশ্ববিবর্তন বিষয়ক মতবাদ(Spencer's Theory of Cosmic Evolution)

ল্যাপ্লাসের নীহারিকাবাদ(Nebular Evolution-Laplace)

ল্যামার্কের জৈবিক বিবর্তনবাদ(Lamarck's biological evolution)

ভাইসম্যানের জৈবিক বিবর্তনবাদ(Weismann's biological evolution)

ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ(Darwin's Biological Evolution)

ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ(Darwin's Biological Evolution)

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইংল্যান্ডের "বীগল" জাহাজে চড়ে চার্লস ডারউইন আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূলবর্তী দেশগুলো ভ্রমণ করেন। তাঁর এ ভ্রমণের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সব জায়গায় উদ্ভিদ ও পশু আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাখির প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা গবেষণা করা। এ গবেষণার ফল হিসাবে ইংরেজি ১৮৫৯ সালে ডারউইনের যুগান্তকারী "Origin of Species" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। তারপর আরও প্রায় একযুগ পরে তাঁর বৈপ্লবিক গ্রন্থ 'The Descent of Man' প্রকাশিত হয়। দার্শনিক ডারউইনের মতবাদের প্রচলন থেকেই দর্শনের কারামুক্তি হয়। ডারউইন প্রথম দর্শনের ধর্মকারামুক্তি ঘোষণা করেছেন, তাই তিনি যুগান্তকারী।

ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ নতুন জাতির উদ্ভবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলে—

১.আত্ম-বিভাজনের সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি(Multiplication by cell Division)

২.আকস্মিক পরিবর্তন(Fortuitous variation)

৩.বংশানুক্রমে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ(Transmission of acquired characters by heredity)

৪.জীবন সংগ্রাম(struggle for existence)প্রথমে ৫.অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব, তারপর তাদের ক্রিয়া(Organs precede functions)

জীবন সংগ্রাম : ডারউইন মনে করেন যে, জগতে জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। জগতে যত জীব আছে তাদের অনুপাতে পর্যাপ্ত খাদ্য জগতে নেই। ফলে খাদ্য লাভের জন্য জীবদের ভেতর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ডারউইন এ দ্বন্দ্বের নাম করেন জীবন যুদ্ধ বা জীবন সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যেসব জাতি হেরে যায় তারা ক্রমশ লোপ পায়।
Survival of the fittest

প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকার : ডারউইন বলেন, জীবন সংগ্রামে যে সমস্ত জীব জয়ী হয় তারা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বেঁচে থাকে। তারাই হলো যোগ্যতম। তাদের বাঁচবার অধিকার আছে। যাদের কোষের পরিবর্তন দেহের প্রতিকূলে হয় তারা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের বাঁচার অধিকার থাকে না। প্রকৃতি তাদের উপযুক্ত বলে মনে করে না। তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়।

পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ বা উদ্দেশ্যবাদ (Teleological Evolution)

পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদীদের বা উদ্দেশ্যবাদীদের দুনিয়াটা অন্ধ, অচেতন জড়ের খেলা নয়। এখানে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিচার-বিবেচনার স্থান আছে। কেবল ভৌত এবং রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে এ বিশাল জগতের উৎপত্তি এবং তার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। বিবর্তন প্রক্রিয়া হচ্ছে এক বুদ্ধিময় আধ্যাত্মিক সত্তার মহাপরিকল্পনার ক্রমিক বাস্তবায়ন। এই পরম সত্তাই বিভিন্ন জাগতিক শক্তিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে জগৎকে কোনো এক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করছে। জগতের বিবর্তন এ পরম সত্তারই আত্মপ্রকাশ। পরম সত্তা চৈতন্যময়। এ চৈতন্যশক্তির জগতের অভিব্যক্তি ক্রমবিকাশের ফলেই জীব জগতের উৎপত্তি হয়েছে। ইংরেজি Teleology শব্দটির মূল গ্রিক শব্দ 'telos' যার আত্মপ্রকাশ।

অর্থ পরিণতি (end) বা উদ্দেশ্য (purpose)। কাজেই পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে ক্রমবিকাশের ধারা কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কোনো পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় ‘এ জগতে এক নিয়মের রাজত্ব চলছে। এখানে উঠতেও নিয়ম, পড়তেও নিয়ম, স্থির থাকতেও নিয়ম।’ এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। সর্বত্রই নিয়ম। সমস্ত জগৎ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জগতের সর্বত্রই রয়েছে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য। এছাড়া, ড. মার্টিনউর মতে, জগৎ যে উদ্দেশ্যমূলক তার প্রমাণ অতি সহজেই পাওয়া যায়। তাঁর মতে, Selection(নির্বাচন), Combination(গঠন) & Gradation(স্তরভেদ) জগতে এই তিনটি লক্ষণেরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদের বিভিন্ন রূপ(Different forms of teleological Evolution)

উদ্দেশ্য বা পরিণতির নিয়ন্ত্রণের ধরনের ভিত্তিতে ২ টি রূপ পরিলক্ষিত হয়। রূপ দুটির নাম হচ্ছে

১. বাহ্য পরিণতিবাদ বা অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ (External Teleology)

২. আন্তর পরিণতিবাদ বা অন্তঃবর্তী উদ্দেশ্যবাদ (Immanent Teleology)।

অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ(Transcendental or External Teleology)

অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদী বা বাহ্য পরিণতিবাদীদের মতে, জগতের উদ্দেশ্য জগতের ভেতরে নেই। বাইরের থেকেই এই উদ্দেশ্য-কারণ জগতের সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সবকিছুরই পরিবর্তন আছে। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো পরিবর্তন নেই। তিনি সকল পরিবর্তনের মাঝে অপরিবর্তনীয়। তিনি জগৎ ও গতির উর্ধ্বে অথচ তিনি জগৎ ও গতির নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি গতির নিয়ামক হয়েও নিশ্চল। তিনি পরিবর্তনের কারণ হয়েও অপরিবর্তিত, জগতের কর্তা হয়েও জগৎ-বহির্ভূত। তিনি বাইরে থেকেই জগতের মধ্য দিয়ে আপন উদ্দেশ্য সাধন করেন। এ মতবাদের ভিত্তি হলো দ্বৈতবাদ। এ মতানুসারে ঈশ্বর জড়কে উপাদানরূপে গ্রহণ করে এ জগতের সৃষ্টি করেন।

অন্তঃবর্তী উদ্দেশ্যবাদ(Immanent Teleology)

অন্তঃবর্তী উদ্দেশ্যবাদী বা আন্তর-পরিণতিবাদীদের মতে, জগতের উদ্দেশ্য জগতের ভেতরে আছে। এ উদ্দেশ্য এ জগৎ এক পরম চৈতন্যময় জগতের অন্তরব্যাপী। ঈশ্বরের সাথে জগতের এক আন্তরসম্পর্ক আছে। হেগেল, লোজা, ব্রাডলী, পলসন, রয়েস্ প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিক হচ্ছেন এ মতবাদের প্রধান সমর্থক। এ মতবাদ অনুসারে, এ বিশ্ব এক অসীম চৈতন্যসত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ অসীম চৈতন্যময় সত্তা—সীমার খণ্ডতা ও ছিন্নতার মাঝ দিয়ে নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি করে চলেছেন। জড় প্রাণ, মন পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নয়। এ তিনটি সত্তা পরম চৈতন্যের প্রকাশের তিনটি বিভিন্ন স্তর মাত্র। এ তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে অন্তঃসূত উদ্দেশ্য পরম চৈতন্য নিজেকে প্রকাশিত করে চলেছেন। জড়ে তাঁর প্রকাশ অত্যন্ত স্তিমিত। প্রাণে অধিকতর উজ্জ্বল আর মনে সবচেয়ে প্রকট। প্রত্যেক ঘটনার যেমন একটা পূর্বকালীন কারণ আছে, তেমনি তার একটা অন্তিম উদ্দেশ্য বা পরিণতি আছে। অ্যারিস্টোটল আকার কারণ, উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ ছাড়াও এক পরিণতি কারণ স্বীকার করেন। পরিণতি কারণকে উদ্দেশ্য কারণ বলে। এ বিশ্বের প্রত্যেকটি ঘটনার পরিণতি কারণ আছে যার জন্য ঘটনাটি তারই মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধন করে।

গ. সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ(Creative Evolution)

ফরাসি দার্শনিক হেনরি বারগস সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের প্রবর্তক। তাঁর মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত(Undetermined), অজ্ঞাতপূর্ব (Unpredictable). সৃজনমূলক(Creative)। বিবর্তন প্রক্রিয়া অজ্ঞাতপূর্ব নতুন নতুনভাবে নতুন নতুন বস্তু সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এগিয়ে যায়। পুরাতন কোনো জিনিসের পুনরাবির্ভাব বিবর্তনে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ নতুন জিনিস সৃষ্টিই বিবর্তনের ধর্ম। সুতরাং পুনরাবির্ভাব নয়, সৃষ্টিই বিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য। যন্ত্রবাদীদের মতে, নিয়ন্ত্রণ এবং পুনরাবির্ভাব বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য। বারগসের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। বিবর্তনে পুনরাবির্ভাবেরও কোনো স্থান নেই।

বার্গসঁ বলেন, বিবর্তন প্রক্রিয়া সৃজনমূলক। নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করাই এই প্রক্রিয়ার ধর্ম। বার্গসঁ হেরাক্লিটাসের ন্যায় বলেন, গতিই একমাত্র জগতের মূল বৈশিষ্ট্য। জগৎ জুড়ে এক বিরাট পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখানে কিছুই নিত্য নয়। এ গতিকে তিনি আবার প্রাণ-প্রবাহ(Elan Vital) বলে ভেবেছেন। অনাদি অনন্ত প্রাণ-প্রবাহ বিশ্বের চরম তত্ত্ব। এ প্রাণ-প্রবাহের একমাত্র কাজ প্রতিনিয়ত নতুন বস্তু সৃষ্টি করা। চলার পথে নতুন জিনিস অহরহ সৃষ্টি করে চলে। এ নতুন সৃষ্টির সঞ্চয়ে প্রাণ-প্রবাহ পূর্ণ ও বেগবান হয়ে ওঠে। প্রাণ-প্রবাহ কখনও থামে না। উন্মত্ত উধাও হয়ে প্রাণ-প্রবাহ ছুটে চলে। এ প্রাণ-প্রবাহকে কখনও আবার তিনি কাল-প্রবাহ বলে ভেবেছেন।

“বস্তুত প্রাণ হলো গতি, জড় হলো বিপরীত গতি।”

"In reality life is a movement, materiality is the inverse movement."—Bergson” প্রাণ-প্রবাহ নিরন্তর সৃষ্টি করে চলেছে।

ঘ. উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ বা উন্মেষবাদ(Emergent Evolution)

উন্মেষবাদ সৃজনবাদের মতই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক স্তরে নতুন গুণের আবির্ভাব স্বীকার করে। উন্মেষবাদীদের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পরের স্তর পূর্ববর্তী স্তরের জটিলতর রূপে আবির্ভূত হয় না। পরের স্তরে আবির্ভাব যখন পূর্ব-স্তর সম্ভব করে তোলে তখন পরের স্তরে এক নতুন গুণের উন্মেষ হয়ে থাকে। অবশ্য উন্মেষবাদীরা মনে করেন, এই নতুন গুণ পূর্ব-স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গড়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ পানি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত। পানির তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কারুর মধ্যে নেই। সুতরাং তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতারূপ গুণ পানির উপাদানগুলোর মধ্যে আলাদাভাবে নেই। পানির এ নতুন গুণকে উন্মেষিত গুণ বলা হয়।

উন্মেষবাদ একটি ধারাবাহিক বিবর্তন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া প্রতি স্তরে নতুন নতুন উন্মেষ সাধন করছে। প্রতি স্তরে নতুনত্বের আবির্ভাব, নতুন সৃষ্টি। কিন্তু নতুন সৃষ্টিতে কোন গুণের উন্মেষ হবে তা ঠিক করে বলা যায় না। কেননা নতুন গুণের আবির্ভাবের বিষয়টি কোনো উপাদানে নেই।

উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ সামসময়িক চিন্তাধারায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। লয়েড মর্গান উন্মেষবাদকে বেশ জনপ্রিয় করেছেন। স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডারের হাতে এ মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। লয়েড মর্গান এবং স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার একে অন্যের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

লয়েড মর্গান

লয়েড মর্গান 'Emergent Evolution' নামক গ্রন্থে বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে উন্মেষিত গুণ বা ধর্মের আবির্ভাব হয়। লয়েড মর্গান 'সক্রিয়তা'(Activity) নামে বিবর্তনের অনুকূলে একটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন। তিনি এ 'সক্রিয়তাকে' কখনও বা মন, কখনও আত্মা, কখনও ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর জাগতিক প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে এক আকর্ষণী শক্তি হিসেবে কাজ করেন। তাঁর নিয়ন্ত্রণেই সমগ্র বিবর্তন-প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, "আমি স্বীকার করি ঈশ্বর হলো তেজশক্তি যার কার্যক্ষমতা নতুনের উন্মেষ ঘটায় এবং উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের সমস্ত গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে" "I acknowledge God is the Nisus through whose activity emergents emerge and the whole course of emergent evolution is directed"

স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার (১৮৫৯ খ্রি. ১৯৩৮ খ্রি.)

স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার 'Space-Time and Deity' নামক গ্রন্থে উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের আলোচনা করেন। তাঁর মতে, দেশ-কাল বা শুদ্ধগতিই হলো আদিম উপাদান। এ আদিম উপাদান থেকে জড়ের মুখ্য ও গৌণ গুণগুলোর আবির্ভাব এবং জড় থেকে প্রাণ ও মনের আবির্ভাব হয়। জীবন বা প্রাণ ও মন বা চৈতন্য জড়সত্তা থেকে উন্মেষিত গুণ বা ধর্ম। চৈতন্যের পর যে গুণের উন্মেষ হবে আলেকজাণ্ডার তার নাম দিয়েছেন দেবসত্তা(Deity) আলেকজাণ্ডারের এই মতবাদ

পিরামিডের মত প্রকাশ করতে পারি। যেখানে দেশ-কাল পিরামিডের ভিত্তি এবং জড়-প্রাণ-মন-দেবসত্ত্বা এভাবে ক্রমান্বয়ে উপরের স্তরে।

পিরামিডের মাথায় হলো দেবসত্ত্বা এবং বিবর্তনের মাঝে 'তেজনা' নামক এক সৃজনী শক্তি বিবর্তন প্রক্রিয়াকে দেবসত্ত্বের উন্মেষের দিকে চালিয়ে নিচ্ছে। এটা উন্মেষবাদের উর্ধ্বগতি প্রমাণ করে। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি দেবসত্ত্বের আগমনের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে। একদিন না একদিন হয়তো বা মন থেকে এ মৌলিক আধ্যাত্মিক শক্তি বা পদার্থের উন্মেষ সম্ভব হবে।

Topics 05 : Freedom of the Will, Philosophy of Mind, Immortality of the Soul

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- ইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদসমূহ
- মন বা আত্মার স্বরূপ ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী
- দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ সমূহ

সোর্স সমূহ:

- সংশ্লিষ্ট টপিকের Live mcq Lecture pdf
- দর্শনের কথা- আব্দুল বারী
- Introduction to philosophy – Jadunath Sinha

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ (Topic 05)

ইচ্ছার স্বাধীনতা(FREEDOM OF THE WILL)

“ইচ্ছার স্বাধীনতা”—এ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে নানা রকম তর্ক-বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। কাজ আমরা স্বেচ্ছায় করি, না বাধ্য হয়ে করি—এ এক জটিল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন বিভিন্ন কালের দার্শনিকগণ। এর ফলে এ সংক্রান্ত নানা মতবাদ গড়ে উঠেছে। যেমন:

অদৃষ্টবাদ (Fatalism)

নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism)

অনিয়ন্ত্রণবাদ বা স্বাতন্ত্র্যবাদ (Indeterminism or the doctrine of Free will)

আত্ম- নিয়ন্ত্রণবাদ বা স্বনিয়ন্ত্রণবাদ (Self-Determinism)

অদৃষ্টবাদ(Fatalism)

এ মতবাদের প্রধান বক্তব্য হলো “যা ঘটতে যাচ্ছে, তা ঘটতে থাকবে”, “যা হবার, তা হবে”। এই বক্তব্যগুলো এটাই বুঝায় যে, আমরা যা কিছুই করি না কেন, ভবিষ্যত তার আপন ধারায় নির্দিষ্ট প্রকৃতিরই হবে। অদৃষ্টবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা বলে কোন জিনিস নেই। প্রকৃতির সব কিছুই ঘটে থাকে পূর্বনির্ধারিত নীতি অনুসারে এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মতো মানুষের ভাগ্যও পূর্বনির্ধারিত। মানুষ শত চেষ্টা করেও তার ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অদৃষ্টবাদের হাতে পড়ে মানুষের শুধু ইচ্ছার স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করা হয় না, বরং মানুষের নৈতিক জীবনের তাৎপর্যকেও কোঠাসা করা হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণবাদ DETERMINISM

এ মতবাদ অনুসারে ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই। বাইরের নিয়মই মানুষের সমস্ত কাজ পরিচালনা করে। উইলিয়াম লিলি (Lillie) বলেন,

"This theory maintains that the law of causation holds in the case of human actions, just as it does in the case of physical events" - Lillie : An Introduction to Ethics (জাগতিক ঘটনার ক্ষেত্রে যেদ্রুপ কার্যকারণ নিয়ম কার্যকর সেরুপ মানুষের কার্যের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর)

এ মতবাদ যে যুক্তিগুলো দেয় সেগুলো মনোবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা এবং ধর্মবিজ্ঞান এই তিন দিক থেকে দেখান যায়।

(১) মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের যুক্তি:

মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের সপক্ষে আমরা প্রধানত দুটি যুক্তি পাই—(ক) স্বেচ্ছাকৃত কার্যের মনস্তত্ত্ব, (খ) মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। নিম্নে যুক্তিগুলোর আলোচনা করা হলো :

(ক) স্বেচ্ছাকৃত কার্যের মনস্তত্ত্ব (Psychology of Voluntary Action) : আমাদের ঐচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্য(motive) এবং কামনার(desire) দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মনে একটি সময়ে একাধিক উদ্দেশ্য এবং কামনা দেখা দিতে পারে। ফলে কামনার বিরোধিতা (Conflict of desires) দেখা দেয়। এই অবস্থায় সবচেয়ে শক্তিশালী কামনাটি প্রাধান্য লাভ করে এবং আমাদের কার্যে প্রবৃত্ত করে। এ কামনার শক্তি নির্ভর করে বিভিন্ন শর্তের ওপর— (১) ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা, (২) ব্যক্তির চরিত্র, (৩) ব্যক্তির মস্তিষ্ক এবং দেহের গঠনবৈচিত্র্য, (৪). পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত বংশ পরম্পরাগত বিভিন্ন প্রবৃত্তি। কামনার এসব পূর্বগামী শর্তগুলো সঠিকভাবে জানা গেলে মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই।

(খ) মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction of Human Conduct) : পূর্ব হতে যদি মানুষের কার্যক্রমের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় তবে মানুষের কাজের কোনো স্বাধীনতা আছে এ কথা স্বীকার করা যায় না। জাগতিক নিয়মের দ্বারা যেদ্রুপ জাগতিক ঘটনাগুলো, যেমন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ বা ধূমকেতু ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের কার্যের যে সকল পূর্ববর্তী কারণ সেগুলো সম্পূর্ণভাবে জানতে পারলে মানুষের কাজ সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। মানুষের কার্যক্রমের ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত সম্ভব বলেই কর-কোষ্ঠী বিচারের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কার্যক্রমের ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। আগে থেকেই যদি মানুষের কার্যক্রম সম্পর্কে বলা যায় তবে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না।

(২) অধিবিদ্যার দিক থেকে যুক্তি:

অধিবিদ্যার দিক থেকে আমরা সাধারণত চারটি প্রধান যুক্তি পাই। নিম্নে সেগুলোর আলোচনা করা হলো :

(ক) কার্যকারণ নিয়মের (Law of Causation) দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ : ইচ্ছা যদি স্বাধীন হয় এবং কোনো পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা নির্ধারিত না হয় তবে মনে করতে হবে যে, কারণ ছাড়াও কার্যের উৎপত্তি হতে পারে। অর্থাৎ, ইচ্ছারূপ যে কাজ তার কোনো কারণ নেই। কিন্তু কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে পার্থিব ও মানসিক যে কোনো কাজেরই কারণ আছে। অতএব, ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতেই হয়।

(খ) শক্তির নিত্যতা নীতির দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ :

শক্তির নিত্যতা নীতি (Law of Conservation of Energy) অনুসারে জগতের সমষ্টিগত শক্তির ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। শুধু শক্তির রূপান্তর সম্ভব। কিন্তু মানুষের যথার্থ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকলে তার দ্বারা নতুন শক্তি উৎপাদিত হতে পারে, যার ফলে বিশ্বের শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অতএব ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্ভব নয়।

(গ) জড়বাদের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ : জড়বাদীদের মতে, দুনিয়ার সবকিছুই যান্ত্রিকভাবে ঘটে। প্রত্যেক পরিবর্তনে পূর্বাবস্থা উত্তরাবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যতিক্রম নেই। সুতরাং মনের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

(ঘ) সর্বেশ্বরবাদের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ : সর্বেশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বরই পরম সত্য। ঈশ্বরই সব, সবই ঈশ্বর। সুতরাং জগতের সবকিছুই পরম সত্যের আভাস মাত্র। ব্যক্তিমনের কোনো পৃথক সত্তা নেই। অতএব ব্যক্তিমনের কোনো স্বাধীন ইচ্ছার ক্ষমতা নেই।

(৩) ধর্মবিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের যুক্তি

ধর্মবিজ্ঞান মতে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। সুতরাং তিনি মানুষের সমস্ত কার্যই পূর্ব থেকে প্রত্যক্ষ এবং ধর্ম মতে ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত। পরিচালনা করেন। কাজেই মানুষের সকল কার্য ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব, মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার করা চলে না।

অনিয়ন্ত্রণবাদ বা স্বাতন্ত্র্যবাদ(INDETERMINISM)

নিয়ন্ত্রণবাদীদের যুক্তিগুলো খণ্ডনের ওপরই অনিয়ন্ত্রণবাদীরা তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেন্ট টমাস বলেছেন, স্মৃতিতে আমরা যেমন অতীতকে জানি, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করি না, তেমনি ঈশ্বর মানুষের সব কাজই জানেন, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করেন না। বস্তুত ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হয়েও মানুষকে ভাল-মন্দ বিচারের স্বাধীনতা দিয়ে নিজের মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর সে অর্থে মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন। অনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছা কোনো পূর্ব ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

প্রখ্যাত দার্শনিক এবং নীতিবিদ কান্টের মতে ইচ্ছার স্বাধীনতাই নীতিবোধের ভিত্তি। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ঔচিত্যবোধ আছে। কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে ঔচিত্যবোধের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ‘তোমার করা উচিত, তার মানেই তুমি করতে পার’ – (Thou oughtest means thou can).-Kant এ হলো কান্টের বিখ্যাত উক্তি।

মেকেনজী (Mackenzie) বলেন, “নৈতিক আদর্শের যদি কোনো অর্থ থাকে তাহলে ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে কিন্তু কোনো না কোনো অর্থে তাকে স্বাধীন হতেই হবে। ”

জেমসের মতে, ‘মুক্ত ইচ্ছা’ এবং ‘নতুনত্ব’ সমার্থ প্রকাশক। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি স্বাধীনতা ব্যতীত খাঁটি বা অর্থপূর্ণ হতে পারে না। বার্গসের মতে, স্বাধীনতা হলো সত্তার আসল বা মৌলিক গুণ।

অনিয়ন্ত্রণবাদ দুই রকম হতে পারে—অনিয়ন্ত্রণবাদ (Indeterminism) ও স্বনিয়ন্ত্রণবাদ (Self-determinism)। অনিয়ন্ত্রণবাদ মতে, মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। অনিয়ন্ত্রণবাদীরা ইচ্ছার চরম স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে, মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। পক্ষান্তরে স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদীরা ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে চরম স্বাধীনতা বোঝেন না। তাঁদের মতে, মানুষের চরিত্র মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে।

অনিয়ন্ত্রণবাদ কার্যকারণ নিয়মের বিরোধী। অনিয়ন্ত্রণবাদ ইচ্ছারূপ কার্যের কোনো কারণ মানে না। কিন্তু কার্যকারণ নিয়ম এক অকাট্য নিয়ম, একে লঙ্ঘন করা যায় না। অতএব, এদিক দিয়ে অনিয়ন্ত্রণবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

পক্ষান্তরে, স্বনিয়ন্ত্রণবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ কার্যকারণ নিয়মের বিরোধী নয়। এ মতানুসারে প্রত্যেক মানুষই তার কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব, ব্যক্তি-চরিত্রই ব্যক্তি-কার্যের কারণ। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ গ্রহণ করলে নৈতিক বিচার সম্ভব হয়। যেহেতু প্রত্যেক মানুষ তার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার কাজের ভাল-মন্দের জন্য সে-ই দায়ী। সুতরাং তার কাজের ভাল-মন্দ দিয়ে তাকে বিচার করা যায়। ফলে অনিয়ন্ত্রণবাদের তুলনায় স্বনিয়ন্ত্রণবাদ বেশি যুক্তিযুক্ত।

স্বনিয়ন্ত্রণবাদ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণবাদ, নিয়ন্ত্রণবাদ ও অনিয়ন্ত্রণবাদ এ দু’রকম মতবাদের সমন্বয় সাধন করে। নিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। মানুষের ইচ্ছা কোনো কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ মধ্য পন্থা অবলম্বন করে এবং বলে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরবশ নয়, আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়; মানুষের ইচ্ছা স্বনিয়ন্ত্রিত বা স্বপরিচালিত। মানুষ নিজে নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিচালনা করে। বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা মানুষের ইচ্ছা পরিচালিত হয় না।

সুতরাং যখনই প্রশ্ন করা হয় মানুষের ইচ্ছা কি স্বাধীন? তখন উত্তরে বলা যায়, মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন ও পরাধীন উভয়ই। এখানে পরাধীনতার অর্থ হলো মানুষের ইচ্ছা মানুষের নিজের অধীন। পরাধীনতার অর্থ অপরের অধীন নয়। তাই মেকেজীর মতে,

"To be free means that one is determined by nothing but oneself " - Mackenzie, A Manual of Ethics (“স্বাধীন হওয়ার অর্থ হলো নিজের ছাড়া আর কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়া।”)

অতএব, মানুষ স্বনিয়ন্ত্রিত জীব

Philosophy of Mind

মন(MIND)

পাশ্চাত্য দর্শনে মনকে আত্মার সাথে অভিন্ন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পশ্চিমের দার্শনিকরা মন ও আত্মাকে সমার্থক বলে মনে করেন। পাক-ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মাকে ভিন্ন করেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ক. মন/আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আদি মতবাদ:

প্রাচীন গ্রিক দর্শনে আত্মা বলতে এক জড় পদার্থকেই বোঝাত। দার্শনিক অ্যানাক্সিমেনিস্ ‘বায়ু’কে আত্মা বলেন। হিরাক্লাইটাস্ আত্মাকে ‘অগ্নি’ বলে মনে করেন। অ্যানাক্সাগোরাস্ Nous বা চেতন নামক অতি সূক্ষ্ম বস্তুকে আত্মা বলে স্বীকার করেন। ডেমোক্রিটাসের মতে, যেহেতু আত্মা বা মন হলো সূক্ষ্ম, মসৃণ গোলাকার পরমাণু সুতরাং আত্মা স্বরূপত জড়াত্মক। গ্রিক পদার্থবিদরাও মন এবং জড়কে অভিন্ন সত্তা বলে মনে করতেন।

দার্শনিক প্লেটোই প্রথমে জড় ও আত্মার মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেন। তিনি সর্বপ্রথমে দর্শনে মনের আধ্যাত্মিক রূপ প্রকাশ করে মন-দর্শনে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। দার্শনিক অ্যারিস্টটল আত্মাকে এক অধ্যাত্ম দ্রব্য হিসেবে স্বীকার করে নেন। আমরা এখন মন সম্বন্ধে অধ্যাত্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

খ. অধ্যাত্মতত্ত্ব(Theory of Mind as Spiritual substance)

মানুষের অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রতিমুহূর্তে বহু বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার সঙ্গে আত্মা বা মন বিভিন্ন হয় না। মন বা আত্মা অভিন্ন, অপরিবর্তিত ও স্থায়ী থাকে বলেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমাদের মন বা আত্মা এক মনে থাকে। অভিজ্ঞতা যে অভিন্ন ও পরিবর্তনশীল, কেবল অভিন্ন অপরিবর্তিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং আত্মাকে অপরিবর্তিত স্থায়ী আধ্যাত্ম দ্রব্য বলা উচিত। এরূপ অপরিবর্তিত আত্মাকে ইংরেজিতে ‘সোল’ (Soul) শব্দ দিয়ে বোঝান হয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল ছিলেন এই মতবাদের প্রাচীন রূপের প্রবর্তক। ডেকার্টে, লক্ ও বার্কলে ছিলেন আধুনিক রূপের প্রধান সমর্থক।

১. অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রাচীন রূপ

(ক) আত্মা সম্বন্ধে প্লেটোর মতবাদ : প্লেটোর মতে, মন বা আত্মা তিন রকম মৌলিক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্লেটো এ তিন প্রকার ক্রিয়ার নাম দিয়েছেন প্রজ্ঞা, কামনা এবং শক্তি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনকে চিন্তা(Thinking) অনুভূতি(Feeling) এবং ইচ্ছা(Willing)—এই ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। প্লেটোর আত্মার তিন প্রকার ক্রিয়া অনেকটা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের আত্মার এ ত্রি-বিভাগের অনুরূপ। প্লেটো চিন্তার বদলে প্রজ্ঞা, অনুভূতির বদলে কামনা আর ইচ্ছার বদলে শক্তি শব্দের ব্যবহার করেন। প্রজ্ঞাই হলো আত্মার আসল রূপ। প্রজ্ঞা হলো দৈবশক্তিবিশিষ্ট। প্লেটোর মতবাদ দেহ ও আত্মার নিবিড় সম্পর্কে অস্বীকার করে। কিন্তু তাঁর মতবাদ আত্মার অমরতা এবং দেহের অস্তিত্বকে স্বীকার করে দ্বৈত সত্তাবাদের গোড়াপত্তন করে।

(খ) আত্মা সম্বন্ধে অ্যারিস্টোটলের মতবাদ : প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টোটলের হাতে প্লেটো প্রবর্তিত দেহ ও আত্মারূপ দ্বৈত সত্তার ধারণা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তবে অ্যারিস্টোটল দেহ ও আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাই বলে তিনি উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তাকে অস্বীকার করেন না। দেহ ও আত্মা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েও স্বতন্ত্র। আত্মাকে তিনি দেহের আকার এবং দেহকে আত্মার উপাদান বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি আত্মাকে দৈহিক সংগঠন(Physiological

Organisation) বলে মনে করেন না। প্লেটোর ন্যায় অ্যারিস্টোটল আত্মাকে দেহাতিরিক্ত এক অধ্যাত্ম সত্তা বলে বিশ্বাস করেন। প্লেটোর মত তিনি প্রজ্ঞাকে আত্মার মাধ্যম বলে মনে করেন। এ প্রজ্ঞার একটি সক্রিয় ও একটি নিষ্ক্রিয় দিক আছে। নিষ্ক্রিয় দিকটি দেহের সঙ্গে বিলয় হয়। সক্রিয় বা শুদ্ধ প্রজ্ঞা হলো অমর। প্রজ্ঞা হলো দেব-সত্তা। কাজেই আত্মা অমর। আধুনিককালে ডেকার্টে, লক্, বার্কলি ও লাইনিজ প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলের মতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

২. অধ্যাত্মতত্ত্বের আধুনিক রূপ

(অ) আত্মা সম্পর্কে ডেকার্টের মত : সপ্তদশ শতকে রেনে ডেকার্টে তাঁর ‘Meditations’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল প্রবর্তিত দেহ-মন সম্পর্কিত দ্বৈতবাদের এক প্রকট রূপের সন্ধান দেন। তিনি আত্মা বলতে জড় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝেন। মনের স্বরূপ লক্ষণ হলো চেতনা। জড়ের চেতনা নেই। আর আত্মার বিস্তৃতি নেই। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে। আত্মা সরল ও অবিভাজ্য। আত্মা অশরীরি, প্রাণবন্ত ও আদর্শমূলক। জড়বস্ত্ত যান্ত্রিক, মৌলিক এবং বিভাজ্য। সবকিছুকে সংশয় করা গেলেও আত্মাকে সন্দেহ করা যায় না। আত্মাকে সংশয় করতে গেলে সংশয়কর্তারূপে আত্মাকে মেনে নিতে হয়। অতএব, আত্মার অস্তিত্ব একান্তভাবে সন্দেহাতীত। "I think there for I exist " -Cogito ergo sum **আত্মা সম্বন্ধে লকের মত** : প্রখ্যাত দার্শনিক লকের মতে, আত্মা হলো এক মানস দ্রব্য। চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি হলো মানসিক ক্রিয়া। এ ক্রিয়াগুলো শূন্যে ভাসমান থাকতে পারে না। সুতরাং এগুলোর কোনো আধার আছে যাকে আশ্রয় করে এগুলো থাকবে। এ আধারই আত্মা। এ আধার অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

গ. আত্মা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ(The Empirical concept of mind)

যে সমস্ত দার্শনিক আত্মা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতামূলক মতবাদ পোষণ করেন তাদের মধ্যে ডেভিড হিউম, জন স্টুয়ার্ট মিল ও উইলিয়াম জেমস প্রমুখ প্রধান। চরম সন্দেহবাদী দার্শনিক হিউম হচ্ছেন আত্মা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-বাদী ব্যাখ্যার জনক। আমরা প্রথমে তাঁর মতবাদের আলোচনা করবো।

আত্মা সম্বন্ধে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ(Hume's Empirical theory of Self)

হিউম একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। যা অভিজ্ঞতায় নেই তার অস্তিত্বও নেই। অভিজ্ঞতায় আমরা কোনো অপরিবর্তিত আত্মার সাক্ষাৎ পাই না। অভিজ্ঞতায় আমরা যে আত্মার দেখা পাই তা হলো আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলোর সমষ্টি, সংবেদন, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ। এ মানসিক প্রক্রিয়াগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এ বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াগুলোর মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করার জন্য মন বলে কোনো দ্রব্য নেই। বার্কলির মত হিউমও দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভরশীল এ কথা মেনে নিয়ে দেখালেন যে আত্মা রূপ দ্রব্যের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হিউম বলেন, ‘আমার দিক থেকে যখনই আমি অন্তরঙ্গভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ করি, আমি সর্বদা কোনো না কোনো সংবেদন পাই, কখনও গরম, কখনও ঠাণ্ডা, কখনও আলো, কখনও ছায়া, কখনও ভালবাসা, কখনও বিদ্বেষ, কখনও দুঃখ, কখনওবা সুখ। আমি কখনও কোনো সংবেদন ছাড়া কিছু প্রত্যক্ষ করি না।’ মন বা আত্মা কোনো আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়। মন হচ্ছে কেবল সংবেদনের সমষ্টি মাত্র।

হিউম আমাদের মনকে একটা রঙ্গমঞ্চ বলে অভিহিত করেছেন। এই মঞ্চে একের পর এক বিভিন্ন সংবেদনের আবির্ভাব ঘটছে; মঞ্চের ওপর চলাফেরা করছে, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আসলে নিত্যপরিবর্তনশীল সংবেদন, অনুভূতি ও ধারণার পারস্পর্যই আত্মা। কোনো স্থায়ী অপরিবর্তিত আত্মার ধারণা মনের কল্পনা মাত্র। পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার সমষ্টিই মন। হিউমের মতে, “কোনো মানুষই বিভিন্ন সংবেদনের সমষ্টি বা সংগ্রহ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নয়। এই সংবেদনগুলো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে একের পর এক অনুগমন করে এবং এগুলো নিয়ত পরিবর্তনশীল। ”

"No man is anything more than a bundle or collection of different perceptions which succeed each other with inconceivable rapidity and are in perpetual flux and movement"- Hume, A Treatise of Human Nature, Book I

মিলের মতবাদ : অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক মিলের মতে, সংবেদন এবং আন্তর অনুভূতিগুলো যেভাবে ঘটে তাদের সম্ভাবনাই হলো মন। মন মানসিক অবস্থার প্রবাহ এবং প্রবাহের সচেতনতা।

জেমসের মতবাদ : মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস আত্মাকে চৈতন্যপ্রবাহ(Stream of consciousness) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, আত্মা বলে কোনো সত্তা বা জ্ঞাতারূপে কোনো আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা একান্ত অবাস্তব। 'চলমান চিন্তাই হলো একমাত্র চিন্তাকৃৎ'(The passing thought is only thinker)

মন বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমষ্টি নয়। মন হচ্ছে চৈতন্যের অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ।

ঘ. আত্মা সম্বন্ধে কান্টের মতবাদ(Kant's Theory of Self)

জার্মান দার্শনিক কান্টের আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ অতীন্দ্রিয় আত্মবাদ নামে পরিচিত। একদিকে 'আত্মা এক অধ্যাত্ম-দ্রব্য' এবং অপরদিকে 'আত্মা বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ' কান্ট এ উভয় প্রকার মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। কান্ট কেবল যুক্তির সাহায্যে আত্মা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান দিতে চান। কান্টের মূলকথা আত্মা চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার অতিরিক্ত এক সংশ্লেষণমূলক ঐক্য বিধায়ক প্রক্রিয়া (Synthetic Unity of Apperception)।

Theories of Body-Mind relationship:

দেহ ও মনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আর ফলে দেহ ও মনের সম্পর্কের সমস্যাটি দর্শনের সমস্যা। এই সমস্যাটির সমাধানকল্পে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করে। তার মধ্য থেকে প্রধান প্রধান মতবাদ এখানে আলোচনা করা হলো।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ(Interactionism)

ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত-এর (Descartes) (১৫৯৬-১৬৫০) দেহ ও মনসম্পর্কীয় তত্ত্বটি হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য দ্বৈতবাদী তত্ত্ব। তিনি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যায় প্রথমে দেহ ও মনের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। 'মন একটা আধ্যাত্মিক দ্রব্য' - একথা বলে দেকার্ত মন ও দেহের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেন। দেকার্তের মতে, প্রকৃতির দিক থেকে দেহ ও মন দুটি স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বিরোধী সত্তা বা দ্রব্য। দেহ অচেতন জড় দ্রব্য, যার সারসত্তা বিস্তৃতি এবং মন চৈতন্য দ্রব্য, যার সারসত্তা চেতনা। অর্থাৎ দেহ জড় এবং মন অজড় বা অশরীরী।

দেহ নিষ্ক্রিয় এবং যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। মন সক্রিয় এবং উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র সত্তা। দেকার্তের মত থেকে দেখা যায় যে, দেহ বিস্তৃতিধর্মী এবং এর স্থান ব্যাপ্তি আছে। পক্ষান্তরে, মন বা আত্মা চৈতন্যধর্মী এবং এর কোন স্থান ব্যাপ্তি নেই। তাঁর মতে, যেহেতু দেহ ও মন দুটি পৃথক সত্তা, সেহেতু এদের প্রত্যেকটিই অপরটিকে ছাড়া অস্তিত্বশীল থাকতে পারে।

দেহ ও মন যদি পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তা হয়, তাহলে এদের মধ্যে কিভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে? দেকার্ত এর উত্তরে বলেন যে, দেহ ও মন যদিও দুটি পৃথক সত্তা, তথাপি এদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন যে, মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে একটি একক গ্রন্থি আছে, যার কোন দ্বৈত নেই। এই একক গ্রন্থির নাম হচ্ছে পিনিয়াল গ্রন্থি (pineal gland)। মন এই পিনিয়াল গ্রন্থির মধ্যে অবস্থান করে দেহের উপর ক্রিয়া করে এবং দেহও ঐ গ্রন্থির মধ্য দিয়ে মনের উপর ক্রিয়া করে। এভাবেই দেহ ও মন ভিন্নধর্মী সত্তা হওয়া সত্ত্বেও পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে এরা একে অপরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে এবং এরা কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ। ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন উদ্দীপনা স্নায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে পিনিয়াল গ্রন্থিতে পৌঁছে এবং সংবেদন উৎপন্ন হয়। আবার, মনও বিভিন্নভাবে পিনিয়াল গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে এবং ফলে পেশীগত গতির সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে, কখনও কখনও মন দেহকে কার্যকারণিকভাবে প্রভাবিত করে এবং কখনও কখনও দেহ মনকে কার্যকারণিকভাবে প্রভাবিত করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্কের ফলাফল। এভাবেই দেকার্ত দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্কের, অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলেন। দেকার্তের এই মতকেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বলা হয়।

প্রয়োজনবাদ বা উপলক্ষবাদ(Occasionalism)

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের ত্রুটি দূর করতে গিয়ে দেকার্তের অনুসারী গুঁয়েলি (Geulincx) মালব্রাশ (Malebranche) প্রয়োজনবাদ বা উপলক্ষবাদের প্রবর্তন করেন। তাঁদের মতে, দেহ ও মন যেহেতু পরস্পর-বিরোধী দুটি স্বতন্ত্র সত্তা, সেহেতু মস্তিষ্কে অবস্থিত পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভব নয়। তাঁরা দেহ ও মনের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দেহ ও মনের মধ্যে সরাসরি কার্যকারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করে ঈশ্বরকে টেনে আনেন এবং বলেন যে, দেহ বা মনে প্রয়োজন দেখা দিলে, বা মাঝে মাঝে যখন কোন পরিবর্তন ঘটে, তখন দেহ বা মনে অনুরূপ পরিবর্তন ঈশ্বর সংঘটিত করেন। আমাদের ক্রিয়াবলীর আসল কর্তা ঈশ্বর। আমাদের ইচ্ছার নিজস্ব কোন কার্যকারিতা নেই, কেননা সব কর্মক্ষমতা ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে আসে। উপলক্ষবাদের সমর্থকেরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাহায্যে দেহ ও মনের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান।

সমান্তরবাদ (Parallelism)

স্পিনোজা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও প্রয়োজনবাদের দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য সমান্তরবাদ প্রবর্তন করেছেন। সমান্তরবাদ অনুসারে দেহ ও মনের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়। দেহ ও মন পাশাপাশি থাকে। যেমন কোন দুই সমান্তরাল সরলরেখা পাশাপাশি থাকে, কিন্তু কখনও পরস্পর মেশে না, তেমনি দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া পাশাপাশি থাকলেও কোন একটি অপরটিকে প্রভাবান্বিত করে না।

স্পিনোজার মতে, ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য এই ঈশ্বরের অসংখ্য গুণ আছে। এই অসংখ্য গুণের মধ্যে আমরা মাত্র দুটো গুণই জানি। দেহ বা বিস্তৃতি ও মন বা চৈতন্য এই দুই গুণ। দেহ ও মন ঈশ্বরস্থিত দুই সমান্তরাল গুণ। দেহে যখন কোন পরিবর্তন ঘটে, তখন মনেও সেই পরিবর্তন দেখা যায়। আবার মনে যখন কোন পরিবর্তন হয়, তখন দেহেও তদনুরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। ঈশ্বরের মধ্যে চিরকাল দেহ ও মন পাশাপাশি থাকে। ঈশ্বরই প্রকৃতি বা জগৎ। সুতরাং জগতে দেহ ও মন চিরকালই পাশাপাশি দেখা যায়। সমান্তরবাদ অনুসারে দেহ ও মন একই ঈশ্বরের দুই প্রকার। সেজন্য সমান্তরবাদকে কেউ কেউ দ্বিদিগবাদ, দ্বিপার্শ্ববাদও (double- aspect theory) বলেন।

হার্বার্ট স্পেন্সারও সমান্তরবাদ সমর্থন করেন। তাঁর মতে একই অজ্ঞেয় তত্ত্ব (The Unknowable) দেহ ও মনের আকারে প্রকাশিত হয়। এই অজ্ঞেয় তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। চরম তত্ত্ব কোন দৈহিক বা মানসিক তত্ত্ব নয়। চরম তত্ত্ব একান্তভাবেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। দেহ ও মন এই অজ্ঞেয় তত্ত্বেরই দুই প্রকাশ। মস্তিষ্ক ও মন এক নয়। মস্তিষ্ক তার নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে, আর মন চলে তার নিজের নিয়ম মেনে।

আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানে স্টাউট একরকমের সমান্তরবাদে বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন কার্য- কারণ সম্পর্ক নেই। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি আছে মাত্র (mere concomitance)। অর্থাৎ কোন দৈহিক প্রক্রিয়া ছাড়া মানসিক প্রক্রিয়া থাকতে পারে না, আবার কোন মানসিক প্রক্রিয়া ছাড়াও দৈহিক প্রক্রিয়া থাকতে পারে না। স্টাউটের মতে দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়া উভয়ই সমানভাবে সত্য। মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব সময়েই কতগুলো মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া থাকে, আবার মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেও সব সময়েই কতগুলো মানসিক প্রক্রিয়া দেখা যায়।

পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ (The Theory of Pre-established Harmony)

লাইবনিজ দেহ ও গনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে, সৃষ্টির সময়েই ঈশ্বর দেহ ও মনের মধ্যে এক শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। এই শৃঙ্খলার জন্তই দেহ ও মনের মধ্যে নিত্য সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োজনবাদীদের মত লাইবনিজ প্রতি মুহূর্তে দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করেন না। লাইব নিজের মতে ঈশ্বর সৃষ্টির সময় একবার হস্তক্ষেপ করেই দেহ ও মনের নিত্য সঙ্গতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। লাইব নিজ দেহ ও মনকে দুটো ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই ঘড়ি দুটো এমনভাবেই তৈরী করা হয়েছে যে, এরা সব সময়েই এক রকম সময়ই দিয়ে থাকে।

লাইবনিজের মতে দেহ ও মন উভয়ই চিৎপরমাণুর (monads) সৃষ্টি । চিৎপরমাণুদের মধ্যে কতগুলো অচেতন (Unconscious), কতগুলো চেতন (Conscious), আর কতগুলো আত্মসচেতন (Self-conscious) । ঈশ্বর সৃষ্টির সময়েই এদের প্রক্রিয়ার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে দিয়েছেন। এই পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলার জন্যই দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

আত্মার অমরত্ব(Immortality of Soul)

মন বা আত্মার অমরত্ব নিয়ে দর্শন, ধর্ম ও নীতিবিদ্যায় যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। অধিকাংশ ধর্মই আত্মার অমরত্বকে বিশ্বাস করে। কিন্তু বস্তুতাত্ত্বিক দর্শন ও বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ও আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভের ফলে অনেকেই আত্মার অমরত্ব, পরমসত্তার অস্তিত্ব এবং পরকালে বিশ্বাস করতে চান না, বিশেষত জড়বাদীরা। আত্মার অমরত্বের সপক্ষে বিভিন্ন চিন্তাবিদ যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুক্তি নিচে আলোচনা করা হলো ।

আত্মার অমরত্বের সপক্ষে তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি(Metaphysical arguments for the immortality of Soul)

প্লেটো (খ্রিস্ট পূর্ব ৪২৭-৩৪৭) তাঁর 'এপোলজি' (Apology) নামক সংলাপে সফ্রেটিসের পরকালের ধারণা ও আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, সফ্রেটিস এগুলো সম্পর্কে বিশেষ স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন নি, তবে তিনি বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা অন্য জগতে প্রস্থান করে, যে পরজগতে প্রশ্ন উপস্থাপন করার জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় না। এদিক থেকে মনে করা হয় যে, সফ্রেটিস আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন।

প্লেটো সফ্রেটিসের আত্মার অমরত্ব-সম্পর্কীয় অস্পষ্ট ধারণাকে দূর করে তাঁর “ফিডো” (Phaedo) নামে অভিহিত সংলাপে আত্মা অমরত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তার মতে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা আত্মার সারসত্তা, যা দৈবপ্রদত্ত গুণ। এর কোন ধ্বংস নেই । আত্মার আসল স্থান ধারণার জগতে। আত্মা যেহেতু দেহাতিরিক্ত এক অধ্যাত্ম সত্তা, সেহেতু আত্মা অবিনশ্বর, শাস্ত্র ও অমর। আত্মা দেহকে ধারণ করার পূর্ব-অবস্থা থেকে নিঃসৃত, অর্থাৎ দেহতে অস্তিত্ব নেয়ার পূর্ব থেকেই আত্মার অস্তিত্ব ছিল, কাজেই দেহের ধ্বংসের পরও আত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকা স্বাভাবিক ।

প্লেটো প্রবর্তিত মতবাদকে অ্যারিস্টটল (খ্রিস্ট পূর্ব ৩৮৪-৩২২) গ্রহণ করার পর আরও বলেন যে, আত্মা শুধু একটা আধ্যাত্মিক দ্রব্যই নয়, বরং এ হলো দেহের সাংগঠনিক শক্তি ও দেহের আকার । এই আত্মার সারধর্ম হলো বুদ্ধি। এই বুদ্ধির আবার দুটি রূপ আছে যেমন, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় । নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি দেহের ধ্বংসের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সক্রিয় বুদ্ধি ধ্বংস হতে পারে না, কেননা এ অমর। অ্যারিস্টটল ব্যক্তিগত অমরতাকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে, আত্মার সক্রিয় বুদ্ধি পরমসত্তার সাথে একাকার হয়ে যায়। আত্মা যেহেতু আধ্যাত্মিক সত্তা, সেহেতু আত্মা অবিনশ্বর, শাস্ত্র ও অমর ।

মার্টিনিউ আত্মার অমরত্বের সপক্ষে শক্তির নিত্যতা নীতির কথা বলেন। তিনি বলেন যে, আত্মার অমরত্বই এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এমনকি এই নীতি থেকেও আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করা যায়। এই নীতি অনুসারে শক্তির কোনো ধ্বংস নেই। তাই শক্তি যদি নিত্য হয় আত্মাকেও নিত্য বলা যায়। মৃত্যুর পর শারীরিক শক্তিগুলো বিচ্ছিন্ন হলেও সেগুলো ধ্বংস না হয়ে ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। আত্মা ভিন্ন শক্তিরূপে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। অর্থাৎ দৈহিক শক্তির মতো মানসিক শক্তিরও ধ্বংস হয় না, বরং কোন-না-কোন এক আকারে এর অস্তিত্ব বজায় থাকে।

আত্মার অমরত্বের সপক্ষে নৈতিক যুক্তি(Moral arguments for the immortality of Soul)

কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) আত্মার অমরত্বকে নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ (postulates) হিসেবে গণ্য করেন। কান্টের মতে, নৈতিক জীবনের কোনই মূল্য থাকে না, যদি না আত্মা অমর হয়। আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে কান্ট যে নৈতিক যুক্তি দেখিয়েছেন, তার দুটি দিক আছে।

প্রথম দিকটি হলো ন্যায়পরায়ণতা, যা অমরত্বের দাবি করে। নৈতিক জীবন হাস্যকর বা অমূলক নয়, বরং নৈতিক জীবনের একটা মূল্য রয়েছে। আর এর ফলেই যে ভাল কাজ করে, তার পুরস্কার এবং যে মন্দ কাজ করে, তার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা এই ইন্দ্রিয়জগতে দেখি, যে ভাল কাজ করে সে কষ্ট পায়, আর যে মন্দ কাজ করে সে সুখে থাকে । এসব

অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য পরকাল বলে একটা জায়গা থাকা দরকার, যেখানে পুণ্যবানেরা পুরস্কৃত এবং পাপীরা শাস্তি পায়। আর এ অর্থে আত্মা অমর। কান্ট এই নৈতিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

কান্টের নৈতিক যুক্তির অপর দিকটি এই যে, নৈতিক জীবন হচ্ছে আদর্শকে পাওয়ার জন্য একটা দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামস্বরূপ, যে আদর্শকে এ জীবনে সন্তোষজনকভাবে পাওয়া সম্ভব হয় না। পূর্ণ ও নিখুঁত সততাই নৈতিক জীবনের আদর্শ। নৈতিক প্রচেষ্টার আসল সারসত্তা নিম্নতর কর্মসামর্থ্য থেকে উচ্চতর কর্মসামর্থ্যের প্রগতির উপর নির্ভর করে। নৈতিক প্রগতি যতই উন্নত হবে, নৈতিক আদর্শও ততই নিখুঁত ও উন্নত হবে। এই অশেষ বা অসীম প্রগতি তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করবো। আত্মা এই ইন্দ্রিয় জগতের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কামনা ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বকে দূরীভূত করতে পারে না। কামনা ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে আত্মাকে কামনা থেকে মুক্ত করতে হলে এ জগতের পরও আত্মার অস্তিত্বকে বজায় রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আত্মা অমর।

জেমস্ সেথ (James Seth) আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে যুক্তি দেন যে, নৈতিক আদর্শ অসীম এবং এ হিসেবে সসীম জগতে এ আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই নৈতিক আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য অসীম সময়ের প্রয়োজন এবং এ হিসেবে আত্মার অমরত্বের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর তাই আত্মা অমর।

মার্টিনিউ (Martineau) নৈতিক যুক্তির দিক থেকেও আত্মার অমরতার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর 'স্টাডি অব রেলিজিয়ান' (Study of Religion) গ্রন্থে আত্মার অমরত্বের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, মানবাত্মার গঠনের আসল প্রকৃতি থেকে বেশ কতকগুলো ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আত্মা অমর। এই ভবিষ্যদ্বাণী বা ইঙ্গিতগুলোকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন, বুদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী (Vaticinations of intellect), 'বিবেকের ভবিষ্যদ্বাণী' (Vaticinations of conscience) এবং 'উদ্বেগের ভবিষ্যদ্বাণী' (Vaticinations of suspense)।

শক্তির নিত্যতা নীতি অনুসারে বলেন যে, আমরা এ হফডিং (Hoffding) তাঁর মূল্যের জীবনে যে মূল্য বা মানকে অর্জন করি, তা নৈতিক ক্রমবন্ধনে সংরক্ষিত থাকে এবং এর কোন ধ্বংস নেই। মানবাত্মা এসব মূল্যকে বহন করার জন্য মৃত্যুর পরও অমর হয়ে থাকে। আর সেজন্যে আত্মা অমর।

Topic 06 :

Value(Fact and Value, Intrinsic and Extrinsic

Values, Three cardinal values: Truth,

Beauty and Goodness, Subjectivity and objectivity of values)

Truth(What is truth? Three main theories of

truth: Correspondence, Coherence

and Pragmatic theories)

Philosophy of Religion(What is meant by God? Three concepts about God: Pantheism, Deism and

Theism, Proofs for God's Existence, God and the Problem of evil)

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- বিভিন্ন প্রকারের মূল্য ও উদাহরণসমূহ
- মূল্য বিষয়গত না বিষয়ীগত এ-সংক্রান্ত আলোচনা
- সত্য, শিব ও সুন্দরের আলোচনা
- সত্য সম্পর্কিত মতবাদগুলোর মূল আলোচনা

- ঈশ্বর সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ
- ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ
- ঈশ্বর ও অমঙ্গল সংক্রান্ত আলোচনা

সোর্স সমূহ:

- সংশ্লিষ্ট টপিকের Live mcq Lecture pdf
- দর্শনের কথা- আব্দুল বারী
- Introduction to philosophy – Jadunath Sinha

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ (Topic 06)

মান বা মূল্য সম্পর্কীয় দর্শন(PHILOSOPHY OF VALUES)

What is Value ?

ল্যাটিন Valeo শব্দ প্রথমত 'শক্তি' এবং শক্তির সঙ্গে যে 'স্বাস্থ্য' তাকেই বোঝাত। পরে স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ গিয়ে দাঁড়াল 'ফলপ্রসূ ও উপযুক্ত হওয়া' (Being effective and adequate)। ফরাসি শব্দ Valeur কথাটির অর্থ হলো 'উৎকর্ষ' (excellence)। ইতালি শব্দ valore কথাটির একটা সম্মানসূচক অর্থ আছে এবং valut কথাটির অর্থ হলো 'দাম'। গ্রীক agathos শব্দটি মূলত বুঝাতো 'নিভীক ব্যক্তিগণ' (Men of valour)। জার্মান শব্দ Wert ইংরেজি Value শব্দেরই অনুরূপ শব্দ এবং মেইনং (meinong) কথাটি 'মর্যাদা(dignity)।

যান্ত্রিক কাঠামোর আদর্শভিত্তিক বিচারের নামই হলো মূল্য। যে বস্তু বা ঘটনা যতটুকু পরিমাণে এ আদর্শ রূপায়িত করতে পারে ততটুকুই তার মূল্য। সত্য, শিব ও সুন্দরকে মূল্যের চরম আদর্শ বলে গণ্য করা হয়।

মূল্য ব্যক্তিগত (বিষয়গত) না বিষয়গত Is Value Subjective or Objective?

দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মূল্যের প্রকৃতি সম্পর্কে একটা প্রশ্ন নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রশ্নটি হলো—মূল্য কি ব্যক্তিগত (বিষয়গত) না বিষয়গত? কেউ কেউ মনে করেন মূল্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আবার কেউ কেউ মনে করেন মূল্য সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত ব্যাপার। তৃতীয় একদল দার্শনিক মনে করেন, মূল্য একই সাথে ব্যক্তিগত এবং বস্তুগত ব্যাপার। আমরা এখন এই তিন দল দার্শনিকের তিনটি মতবাদ আলোচনার মাধ্যমে মূল্যের প্রকৃতি সম্পর্কে।

(ক) মূল্য ব্যক্তিগত বা বিষয়গত (Value is Subjective) : একদল দার্শনিকের মতে, মূল্যের অস্তিত্ব বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সম্ভব নয়। মূল্যের অস্তিত্ব কেবল মন বা চৈতন্যের মধ্যেই সম্ভব। সুতরাং মূল্য নিতান্তই মূল্যের অস্তিত্ব চৈতন্যের ব্যক্তিগত বা বিষয়গত ব্যাপার। যার কাছে যখন বস্তুর যে মূল্য ধরা দেয়, তা-ই বস্তুর মূল্য ব্যক্তিগত ব্যাপার। মূল্য। কোনো বস্তুরই সর্বজনগৃহীত কোনো মূল্য নেই। রুচির বিভিন্নতা অনুসারে মানুষের মূল্যবোধও ভিন্ন হয় ; কাজেই একজনের কাছে যা সুন্দর আর একজনের কাছে তা কুৎসিতও হতে পারে। একজন যা ভাল মনে করেন, আর একজনের কাছে তা খারাপ বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যে ছবিটি আমার কাছে সুন্দর তা আরেক জনের কাছে সুন্দর নাও হতে পারে। যে গান আমার কাছে ভাল লাগে তা আমার বন্ধুর কাছে ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে কোনো বস্তু সুন্দর ও কুৎসিত, ভাল ও মন্দ হতে পারে না। মূল্য সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিগত। আবার একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সময়ে বস্তুর মূল্য বা মান বিভিন্ন হতে পারে। অতএব, আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ভাল, মন্দ প্রভৃতি কখনই বিষয়গত গুণ হতে পারে না। ভাল-মন্দ প্রভৃতি মূল্যকে ব্যক্তিগতই বলতে হয়।

দার্শনিক লোটজার মতে, মূল্য প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরিতৃপ্তির অনুভূতির সাথে জড়িত। যা কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে, তা-ই আমাদের কাছে মূল্যবান। একটি বস্তু আমাদের যে আনন্দ দেয় তাই হলো তার মূল্য। আনন্দ দানের

ক্ষমতা দেখেই আমরা বস্তুর মূল্য নিরূপণ করি। আনন্দের অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। অতএব, ব্যক্তি আনন্দের সাথে জড়িত মূল্যও ব্যক্তিগত ব্যাপার।

(খ) মূল্য বিষয়গত (Value is Objective) : আরেক দল দার্শনিক মনে করেন মূল্য ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, মূল্য সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত। তাঁরা বলেন, মূল্য যদি ব্যক্তিগত ব্যাপার হতো, তাহলে মহৎ সাহিত্য, মহৎ শিল্প ও মহৎ সঙ্গীত, এক কথায় যে কোনো মহৎ সৃষ্টি সকলের কাছে মহৎ বলে গৃহীত হতো না। কিন্তু নজরুল -রবীন্দ্রনাথ-শেখরপিয়রের সাহিত্য, রাফায়েল-পিকাসো-জয়নুল আবেদিনের শিল্প যুক্তিবাদী লোকের কাছে চিরকালই মহৎ বলে আদৃত হবে। অতএব, মূল্য ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

মূল্যবোধের জন্য শিক্ষার দরকার। যে লেখাপড়ায় অজ্ঞ, তার পক্ষে কোনো বিশেষ সাহিত্য; যে গান বাজনায়ে অজ্ঞ, তার পক্ষে কোনো বিশেষ সঙ্গীত; যে শিল্পকলায় অজ্ঞ, তার পক্ষে কোনো বিশেষ শিল্পের মূল্য বিচার করা কখনও সম্ভব নয়। তা হলে দেখা যায়, মূল্য ব্যক্তিগত বিষয় নয়। যদি তা হতো, তবে শিক্ষার কোনো প্রয়োজন হতো না। তাছাড়া মূল্যের সর্বজনগৃহীত একটা ধারণা প্রচলিত আছে বলেই সে বিষয়ে শিক্ষা সম্ভব। মূল্যবোধের শিক্ষা ছাড়া মূল্য অবধারণ সম্ভব নয়। গোলাপ প্রকৃতপক্ষে সুন্দর বলেই আমাদের বিচারে তা মূল্যবান। সুতরাং বলতে হয় যে, মূল্য বিষয়ক অবধারণের প্রকৃতিও মূল্যের বিষয়গত সত্তা প্রমাণ করে।

মূল্য ব্যক্তিগত (বিষয়গত) ও বিষয়গত উভয়ই (Value is both Subjective and Objective) :

তৃতীয় একদল দার্শনিক বলেন, মূল্য শুধু ব্যক্তিগত অথবা শুধু বিষয়গত সত্তা নয়। মূল্য হচ্ছে একই সাথে ব্যক্তিগত এবং বিষয়গত সত্তা। ইংরেজ দার্শনিক আলেকজান্ডার এ মতের একজন প্রধান সমর্থক। তাঁর মতে, মূল্য বস্তুর মুখ্য অথবা গৌণ গুণ নয়। মূল্য হচ্ছে এক তৃতীয় জাতের গুণ। এ তৃতীয় জাতের গুণ বস্তুনির্ভর হয়েও মন-নির্ভর। সুতরাং বস্তু অথবা মনকে বাদ দিলে মূল্যের অস্তিত্বই থাকে না। নিরপেক্ষ মন নিয়ে আলোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, মূল্য শুধু ব্যক্তিগত বা শুধু বস্তুগত ব্যাপার নয়। আমাদের মতে মূল্য ব্যক্তিগতও বটে এবং বিষয়গতও।

মান বা মূল্যের প্রকারভেদ (Different Types of Values)

ক. দৈহিক মূল্য (Physical Values) : স্বাস্থ্য, কার্যক্ষমতা প্রভৃতি দেহের মূল্য। দেহের মূল্যকে অস্বীকার করা হয়। এর ফলে পাপ হয়। দেহের বন্ধনের মাঝ দিয়ে আত্মিক পরিপূর্ণতার স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। বৈরাগ্যের মাঝে যে মুক্তি তার থেকে পরিপূর্ণ স্বাদ লাভ করা যায় না। দেহের সহস্র বন্ধনের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন দৈহিক কষ্টের মাঝ দিয়ে প্রাপ্ত মুক্তিরই পূর্ণ স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। অতএব দেহের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। দেহ মানব জীবনের উন্নতির সোপান। দেহ মানবজীবনের সর্বশেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে মাচা হিসেবে কাজ করে।

খ. অর্থনৈতিক মূল্য (Economic Value) : কোনো বিশেষ বস্তু দিয়ে অন্য যতটি বস্তু লাভ করা যায় তাই সে বিশেষ বস্তুর অর্থনৈতিক মূল্য। বর্তমান যুগে অর্থেরই অর্থনৈতিক মূল্য স্বীকার করা হয়। কারণ অর্থের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে পারি। সারকথা হলো, যে কোনো জিনিসেরই বিনিময় মূল্য আছে, তারই অর্থনৈতিক মূল্য আছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মূল্য বস্তুর স্বতঃমূল্য (Intrinsic Value) নয়। কারণ অন্য বস্তুর বিনিময়ের ওপর তার মূল্য নির্ভর করে। অর্থনৈতিক মূল্য হলো পরতঃমূল্য (Extrinsic Value)।

গ. মানসিক মূল্য (Psychical Value) : অনেক চিন্তাবিদ মনের তিনটি বৃত্তি স্বীকার করেছেন। চিন্তা, অনুভূতি ও কৃতি (Thinking, Feeling and Willing)— মনের এ তিন বৃত্তি। মানব মনের এ তিন বৃত্তির আদর্শ হিসেবে আমরা যথাক্রমে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে পাই। তাই সত্য (Truth), শিব (Goodness) ও সুন্দরকে (Beauty) মানসিক মূল্য বলা হয়। চিন্তার আদর্শ মূল্যের নাম সত্য, অনুভূতির আদর্শ মূল্যের নাম সুন্দর এবং কৃতির বা ইচ্ছার আদর্শ মূল্যের নাম শিব। সত্য, শিব এবং সুন্দর হলো মানব জীবনের পরম মূল্য। এই তিনটি আদর্শের প্রেক্ষিতেই মানুষ বিভিন্ন জাগতিক বস্তু বা ঘটনার মূল্য নির্ধারণ করে। মানুষের আদর্শ জীবন হলো এক সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের জীবন। এই আদর্শ লাভের মাঝেই মানুষ

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। এ সত্য, সুন্দর এবং শিবের নিজস্ব মূল্য আছে। এ কারণে সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরকে স্বতঃমূল্য বলা হয়। আমরা এখন মানব মনের মূলে যে তিনটি মূল্য আছে সেগুলোর প্রত্যেকটির একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

চিন্তার মূল্য (Intellectual Value) : চিন্তার আদর্শকে সত্য বলা হয়। চিন্তার সত্যতার ওপরই চিন্তার মূল্য নির্ভর করে। যে চিন্তা সত্য, সে চিন্তাই মূল্যবান। যে চিন্তার সত্যতা নেই, সে চিন্তার কোনো মূল্যও নেই। ব্যক্তির মানসিক জীবন তার লক্ষ্যে পৌঁছাকালীন অবশ্যই সত্যের প্রকৃতি উপলব্ধি করবে।

কৃতির মূল্য (Volitional Value) : কৃতি বা কর্মের আদর্শকে শিব বা মঙ্গল বলা হয়। যে কাজে যতটুকু পরিমাণে শিব বা মঙ্গলের প্রকাশ লক্ষ করা যায় সে কাজ ততটুকু মূল্যবান। সোজা কথায় বলতে গেলে, কর্মের মূল্য কর্মের মাঝে মঙ্গলের প্রকাশের মাত্রার ওপরই নির্ভর করে। যে কাজের মধ্যে মঙ্গলের প্রকাশ হয় বেশি সে কাজ তত বেশি মূল্যবান। মঙ্গলের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

অনুভূতির মূল্য (Emotional Value) : অনুভূতির আদর্শকে সুন্দর বলা হয়। যে অনুভূতি যতটুকু পরিমাণে সুন্দরকে প্রকাশ করতে পারে তার ততটুকু মূল্য।

মূল্যের অনুক্রম পরম্পরা (Gradation of values)

আমরা এখন গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে অথবা নিকলাই হার্টম্যানের (Nicolai Hartmann) মতে, শক্তি বা উৎকর্ষ (Strength) এবং উচ্চতা বা উন্নতির (height) দিক থেকে মান বা মূল্যের বিচার করবো। গুরুত্বের দিক থেকে আমরা মূল্যের নিম্নরূপ আলোচনা করতে পারি।

(ক) স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য (Intrinsic and Extrinsic Values) : জাগতিক বস্তুসমূহের মূল্য আমরা সাধারণত দু'রকমভাবে বুঝতে পারি। কতকগুলো বস্তুর কোনো নিজস্ব মূল্য না থাকলেও অন্য মূল্য লাভের সহায়ক বলে মূল্যবান মনে করা হয়। অর্থ বা টাকা-পয়সার কোনো নিজস্ব মূল্য নেই। কিন্তু টাকা-পয়সা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লাভে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সহায়ক বলেই আমরা এদের মূল্য স্বীকার করি। শরীরচর্চা বা ব্যায়াম হলো ঠিক একই জাতীয় মূল্য। ব্যায়াম আমাদের কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে এবং দৈহিক গঠনে সহায়তা করে। সামাজিক সহযোগিতা এবং বন্ধুত্ব পরতঃমূল্যরূপে গণ্য হয়।

কিন্তু বিদ্যা টাকা-পয়সার মত নয়। বিদ্যার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। এর মূল্য কোনো মূল্যের ওপর নির্ভর করে না। বিদ্যার ন্যায় যাদের নিজস্ব মূল্য আছে তাদের মূল্যকে স্বতঃমূল্য বলা হয়। সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরকে স্বতঃমূল্যবান বলে ভাববাদীরা স্বীকার করেন। সত্য, শিব বা মঙ্গল ও সুন্দর হলো মানব জীবনের তিনটি মহৎ আদর্শ। এই আদর্শগুলো নিজ গুণেই মানুষের লক্ষ্য হবার দাবি রাখে।

(খ) আপেক্ষিক এবং চরম মূল্য (Relative and Absolute Values) : প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে আপেক্ষিক এবং চরম মূল্যের পার্থক্য রচনার মাধ্যমেও মূল্যের বিচার সম্ভব। যদি আমরা পরম মূল্য বলতে সত্য, শিব ও সুন্দরকে বুঝি তবে এরা ছাড়া আর সমস্ত মূল্যই আপেক্ষিক। পরম মূল্য হলো ব্যক্তিজীবনের চরম আদর্শ। আর যে মূল্যগুলো ব্যক্তিজীবনের চরম আদর্শ হতে পারে না তাদেরকে আপেক্ষিক মূল্য বলে। আপেক্ষিক মূল্য বলতে আমরা বুঝি দৈহিক, অর্থনৈতিক মূল্য বা পরতঃমূল্য। আর চরম মূল্যগুলো হলো স্বতঃমূল্য কেননা তাদের নিজস্ব মূল্য আছে। চরম মূল্যগুলো বস্তুগত। ঈশ্বর হলেন পরম সত্তা। এ সত্তা সমস্ত স্বতঃ, বস্তুগত এবং চরম মূল্যের সাথে অভিন্ন।

সত্য সম্পর্কীয় মতবাদ (THEORIES OF TRUTH)

জ্ঞানের অবস্থার মূল্যায়ন থেকেই জ্ঞানের যথার্থতা বা বৈধতা (validity of knowledge) বা সত্যতা-মিথ্যাত্ব নিরূপণের প্রশ্ন দেখা দেয়। সত্য দুই রকমের হতে পারে, যেমন, আকারগত সত্য ও উপাদানগত সত্য। আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সাথে যুক্তির নিয়মানুযায়ী মিল থাকলে অবধারণ বা অনুমানকে আকারগত সত্য বলা হয়। আর আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সাথে যুক্তির নিয়মানুযায়ী মিল ছাড়াও অবধারণ বা অনুমানটির সাথে বিষয় বা ঘটনার মিল থাকলে তাকে উপাদানগত সত্য বলা

হয়। সাধারণত আকারগত সত্যতাকে যথার্থতা বা বৈধতা (validity) ও উপাদানগত সত্যতাকে সত্যতা (truth) বলা হয়। বৈধতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে যুক্তিবিদ্যা।

জগৎ-জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সাধারণত বচননির্ভর। সত্য ও মিথ্যা বচনেরই গুণ। অর্থাৎ কেবল বচনই সত্য-মিথ্যা হতে পারে। যে জ্ঞান বচনের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় না তার সত্য-মিথ্যাও বলা যায় না। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান যেখানে কোনো বচন নেই সেখানে সত্য-মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। জ্ঞানের সত্যাসত্য বলতে আমরা বচনেরই সত্যাসত্য বুঝি।

সত্যতা প্রকৃতি ও সত্যের পরীক্ষা এক জিনিস নয়। তাই রাসেল বলেন, বচনের সত্যতা জানা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব জানা না গেলেও বচন সত্য ও মিথ্যা হতে পারে। অর্থাৎ বচন আপনিতেই সত্য ও মিথ্যা হবে। কেউ তাকে জানলেও হবে, না জানলেও হবে। সুতরাং সত্যের প্রকৃতি সত্যের পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে না।

দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা মোটামুটি চারটি প্রধান মতবাদ দেখতে পাই:

১. স্বতঃপ্রতীতিবাদ(Self evidence theory)
২. সঙ্গতিবাদ (Coherence theory)
৩. অনুরূপতাবাদ (Correspondence theory)
৪. প্রয়োগবাদ(Pragmatic theory)

১. স্বতঃপ্রতীতিবাদ(The Self-evidence theory)

স্বতঃপ্রতীতিবাদ মতে, বচনের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়। বচনের সত্যতা বচনের ওপরই নির্ভর করে, অন্য কিছু ওপর নয়। যা সুস্পষ্ট তাই সত্য। '৩ + ২ = ৫' (তিন আর দুই-এ পাঁচ), 'ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ' ইত্যাদি বচন সুস্পষ্ট এবং এদের সত্যতাকে সন্দেহ করা যায় না। এদের সত্যতা স্বতঃই জানা যায়। নিঃসন্দেহতা এবং সুস্পষ্টতা এদের সত্যতার পরীক্ষা। সন্দেহাতীত বচন থেকে নিশ্চয়ত্বকভাবে যে সমস্ত বচন এসেছে তাদের সত্যতা সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা সন্দেহাতীত বচন হচ্ছে স্বয়ং সত্য আর এদের থেকে পাওয়া বচন সত্য না হয়ে পারে না। দার্শনিক ডেকার্টে এ মতবাদের একজন নামকরা সমর্থক। স্পিনোজা, লক্, লাক্সি প্রমুখ দার্শনিকও এ মতবাদের সমর্থন করেন।

ডেকার্টের মত: প্রখ্যাত দার্শনিক ডেকার্টের মতে, যে সমস্ত বচন স্পষ্ট ও পরিষ্কৃত(clear and distinct) তাই সত্য। স্পষ্টতা, পরিষ্কৃততা সত্যতার লক্ষণ ও সত্যতার মাপকাঠি। অস্পষ্টতা এবং অপরিষ্কৃততা মিথ্যাত্ব সূচনা করে। সুতরাং কোনো বচনের সত্যতা নির্ভর করে সে বচন কতখানি স্পষ্ট ও পরিষ্কৃত তার ওপর। যদি কোনো বচন সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ও পরিষ্কৃত হয় তবে তা স্বয়ং সত্য। ডেকার্টে বলেন, আত্মজ্ঞানও স্বতঃপ্রতীত জ্ঞান। কেননা আত্মজ্ঞান আত্মা সম্পর্কিত বচন থেকেই পাওয়া যায় আর এ বচনগুলোতেই স্পষ্টতা ও পরিষ্কৃতি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং এ বচনগুলো হচ্ছে সন্দেহাতীত সত্য। ডেকার্টে বলেন, সবকিছুই সংশয় করা যায় কিন্তু সংশয়কারী আত্মাকে কখনই সংশয় করা যায় না। সুতরাং ডেকার্টে বলেন, আত্মজ্ঞানে সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়। ডেকার্ট আরোও বলেন, ঈশ্বরের জ্ঞান এবং জগতের জ্ঞানও স্বতঃপ্রতীত জ্ঞান। কেননা, ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞান ও জগতের নিশ্চয়ত্বকভাবেই আত্মজ্ঞান থেকে এসেছে, কাজেই ঈশ্বরের জ্ঞান স্বতঃপ্রতীত জ্ঞান।

স্পিনোজার মত: স্পিনোজার মতে, ঈশ্বরের তার ওপর। বচন স্পষ্ট ও পরিষ্কৃত হলে সত্য ; আর বচনে স্পষ্টতা ও পরিষ্কৃতির অভাব জ্ঞান সবচাইতে বেশি বচনের মিথ্যাত্ব ঘোষণা করে। তবে তিনি ডেকার্টের মত আত্মজ্ঞানের সত্যতাকে সবচেয়ে নিশ্চয়ত্বক বলে মনে করেন না। তিনি ঈশ্বরের জ্ঞানকেই সবচেয়ে নিশ্চয়ত্বক বলে মনে করেন। আত্মজ্ঞান এবং জগৎসম্পর্কিত জ্ঞানও ঈশ্বরের সম্পর্কিত নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান থেকে লব্ধ। ঈশ্বরের সম্পর্কিত জ্ঞান স্বতঃপ্রতীত জ্ঞান এবং এ স্বতঃপ্রতীত জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান এবং জগৎসম্পর্কিত জ্ঞানও সন্দেহাতীত জ্ঞান।

দার্শনিক লক্ ডেকার্টের মতকেই গ্রহণ করেন। তিনি আত্মজ্ঞানের নিশ্চয়তা ব্যাপারে স্বতঃপ্রতীতিবাদকেই স্বীকার করেন।

আধুনিককালে লাক্সি বলেন, জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই জানা যায়। বস্তুর বিষয়গত প্রকাশই জ্ঞানের সত্যতা নিরূপণ করে। জ্ঞানের বিষয় অনুযায়ী আমরা সোজাসুজিই জানতে পারি। কাজেই জ্ঞানের মাপকাঠি হিসেবে লাক্সি স্বতঃপ্রতীতিবাদই স্বীকার করেন।

সঙ্গতিবাদ(The Coherence Theory)

সঙ্গতিবাদ অনুসারে, যে কোনো বচনের সত্যতা ঐ বচনের সাথে অন্য সমস্ত বচনের সঙ্গতির ওপর নির্ভরশীল। এ মতবাদ মতে, বচনের সত্যতা আপাতদৃষ্টিতে ধারণার সাথে বস্তুর অনুরূপতার ওপর নির্ভরশীল হলেও আসলে তা সত্য নয়। সঙ্গতিই সত্যের প্রকৃতি এবং সঙ্গতি দিয়েই সত্যের পরীক্ষা হয়। **হেগেল এবং হেগেলপন্থী ভাববাদীরা** এ মতবাদে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বাস্তববাদী দার্শনিক আলেকজান্ডারও একটি ভিন্ন অর্থে এ মতবাদের সমর্থন করেন। অনুরূপতাবাদী রাসেলও অনিশ্চিত মতের ব্যাপারে সঙ্গতিবাদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

কোনো বচনই পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। কোনো বচন যখন অন্যান্য বচনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তখনই সে বচনের ‘সত্যতা’ গুণ উৎপন্ন হয়। অন্য কথায়, কোনো বিশেষ বচন যখন অন্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সুসংবদ্ধমণ্ডলী(Coherent System) গড়ে তোলে তখনই তা সত্য হয়। কোনো বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। যখন এ দুটি বচনের যে কোনোটি অন্যান্য বচনের সঙ্গে মিলে একটি সঙ্গতিপূর্ণমণ্ডলী সৃষ্টি করে তখনই তা হয় সত্য। পক্ষান্তরে, একটি বিশেষ বচনের সাথে অন্যান্য বচনের অসঙ্গতি থাকলে অথবা এ অসঙ্গতির জন্য কোনো সংবদ্ধ জ্ঞানমণ্ডলী গড়ে না উঠলে বচনটি মিথ্যা হতে বাধ্য।

এদের মতে, সব বচনের সত্যতা সমান নয়। কোনো বচনের সত্যতা বেশি, কোনো বচনের কম। যে বচনের সঙ্গতির মণ্ডলী বেশি সে বচনের সত্যতাও বেশি। যে বচনের সঙ্গতির মণ্ডলী কম সে বচনের সত্যতাও কম। মোট কথা, বচনের সঙ্গতির মণ্ডলীর পরিধির ওপর তার সত্যতার ব্যাপকতা নির্ভর করে।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে কোনো বচনই চরম সত্য নয়, আবার চরম মিথ্যাও নয়। সত্যতা হলো একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। চরম অভিজ্ঞতার দিক থেকে প্রত্যেক বচনই আপেক্ষিক মিথ্যেই, আবার চরম মিথ্যাত্বের দিক থেকে প্রত্যেক বচনই আপেক্ষিক সত্য। সত্যতার এ আপেক্ষিকতা **ব্রাডলি** প্রমুখ দার্শনিক স্বীকার করেন। ব্রাডলি বলেন, ভ্রমও সত্য। তবে ভ্রম হলো আংশিক সত্য। আবার সমস্ত সত্যই আংশিক মিথ্যা।

তবে সঙ্গতিই যে সত্যতা তা সঙ্গতি দিয়েই জানতে গেলে চক্রক দোষের উৎপত্তি হয়।

অনুরূপতাবাদ(The Correspondence Theory)

Correspondence Theory. In the case of probable opinions. ***রাসেলের** এর মতবাদ তাঁর The Problems of Philosophy নামক গ্রন্থে পাওয়া যাবে। সত্যের পরীক্ষা সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের মধ্যে অনুরূপতাবাদই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। **হেগেল** বলেন,

In common life", says Hegel, "truth means the agreement of an object with our conception of it."- Hegel, Logic, Chapter II

‘ব্যবহারিক জীবনে সত্য বলতে বুঝায় আমাদের কোনো বস্তুর ধারণার সাথে সে বস্তুর মিল বা অনুরূপতা’

বচনই চিন্তার সরলতম প্রকাশ। বচন নির্দিষ্ট ধারণা যদি বস্তুর সঙ্গে মেলে বা বস্তুর অনুরূপ হয় তবেই বচনকে সত্য বলা যায়, আর যদি না মেলে বা বস্তুর অনুরূপ না হয় তবে বচন মিথ্যা। যেমন ‘গুড় হচ্ছে মিষ্টি’—এ বচনে গুড়ের ধারণার সাথে গুড়রূপ বস্তুর মিল আছে বলে তা সত্য হতে বাধ্য। সাধারণ লোক এভাবেই ধারণার সত্যতা ও মিথ্যাত্ব ঠিক করে থাকে। এ হিসেবে অনুরূপতাবাদ হলো লৌকিক মতবাদ (Common-sense Theory)

8. প্রয়োগবাদ(The Pragmatic Theory)

মানবিক প্রয়োজনই হলো সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি—এটাই হলো প্রয়োগবাদের মূল কথা। প্রখ্যাত দার্শনিক **উইলিয়াম জেমস, এফ. সি. এস. সিলার এবং জন ডিউই** সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা হিসেবে এ প্রয়োগবাদের প্রচার করেন। এঁরা সকলেই বচনের বা বিধানের ব্যবহারিক সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে এর সত্যতা—এ কথা স্বীকার করেন। এঁরা সত্যের প্রকৃতি ও সত্যের জ্ঞানের ব্যাপারে জীবনের উপযোগিতার প্রাধান্যকেও স্বীকার করেন। উপযোগিতা বা প্রয়োজনই হচ্ছে সত্যতা নিরূপণের একমাত্র উপায়। সত্য জীবনের প্রয়োজনে আসে। যা মানবিক প্রয়োজনে আসে না তা মিথ্যা কিন্তু প্রয়োগবাদের ব্যাখ্যায় এঁদের মধ্যে মতভেদ আছে।

উইলিয়াম জেমসের মত: উইলিয়াম জেমসের মতে, ধারণার কোনো স্বতঃপ্রমাণ্যতাই নেই। সত্যতা হলো ধারণার কোনো আগন্তুক গুণবিশেষ। ধারণার সত্যতা পরীক্ষার সাফল্যের মাধ্যমে সৃষ্ট গুণবিশেষ। কোনো ধারণার সত্যতা পরীক্ষা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, সে ধারণা আমাদের জীবনে কাজের সহায়ক, তবে তখন আমরা ধারণাটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি। এ হিসেবে ধারণার ব্যবহারিক উপযোগিতা অথবা প্রয়োজন অথবা মূল্যই হচ্ছে এর সত্যতা। একটি উদাহরণের সাহায্যে কথাটাকে পরিষ্কার করে বুঝানো যেতে পারে। কোনো এক বাড়িতে খাদ্য পাওয়ার ধারণা তখনই সত্য হয় যখন সে বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে পেটের ক্ষুধার জ্বালা মেটানো যায়। খাদ্য যখন ক্ষুধা দূর করে তখনই খাদ্যের ধারণার সাফল্য লাভ করা যায়।

শিলারের মত: প্রয়োগবাদী দার্শনিক শিলারের মতে, সত্যতার স্বতঃপ্রতীতি নেই। ধারণার সত্যতা ধারণার সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে। একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকলেই ধারণা সত্য হওয়ার দাবি করতে পারে। তবে ধারণার সত্যতা দাবি পূর্ণ হয় তখনই যখন ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করি, একটা গন্ধ পাওয়া গেল। যদি বলা যায় অদূরের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে তবে বলতে হবে এ ধারণার একটা সত্যতার দাবি আছে। কিন্তু বাগানে গিয়ে যদি সত্যিই দেখা যায় সেখানে সুগন্ধি ফুল ফুটে রয়েছে তবেই আমাদের ধারণার সত্যতার দাবি পূর্ণ হয়।

ডিউইর মত: প্রয়োগবাদী জন ডিউইও বলেন যে, সত্যতা স্বতঃপ্রতীতির বিষয় নয়। সত্যতা সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানেরই ফল। অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ফলকেই সত্যতা বলা হয়। কোনো ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলেই সত্যতা সুনির্দিষ্ট ও আমরা ধারণার বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে সন্দেহ করি এবং সন্দেহের অবসান হলে ধারণাটিকে সুনিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানের সত্য বলে গ্রহণ করি। সুতরাং ধারণার সত্যতা এর পরীক্ষার সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে। সা-রে-গা-মার শব্দ শুনে আমরা বললাম পাশের বাড়ির কোনো মেয়ে গান শিখছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে মেয়েটিকে গান শিখতে দেখামাত্র আমরা ধারণাটিকে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য। এখানে আমাদের সন্দেহ নিরসনের ফলে সত্য উৎপন্ন হলো। "Truth is the outcome of definite and controlled investigation"

ঈশ্বরের ধারণা(THE IDEA OF GOD)

সভ্যতার আদি যুগে ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল অপক্ল। এ ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সভ্য জগতের মানুষের সুপরিপক্ক, সত্যিকার বিস্তৃত ধারণায় পর্যবসিত হয়। মানব জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসের মতই মানব মনে ঈশ্বর-ধারণার বিবর্তন দেখা যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ(PROOFS FOR THE EXISTENCE OF GOD)

দার্শনিকেরা বলেন বিশ্বাস নয়, যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই খোদার অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন দার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ দিয়েছেন। এ প্রমাণের মধ্যে চারটি প্রমাণকে দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়। এ চারটি প্রমাণের নাম হলো—

১. বিশ্বতত্ত্ব বা আদি কারণ বিষয়ক প্রমাণ

২. তত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণ

৩. উদ্দেশ্যবাদ বিষয়ক প্রমাণ

৪. নৈতিক প্রমাণ

১. বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক বা আদি কারণ বিষয়ক প্রমাণ (The Cosmological or Causal Proof)

ড. ফ্লিন্ট (Dr. Flint) ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে প্রমাণ দেন তার নাম হলো বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণ। আর ড. মার্টিনিউ (Dr. Martineau) যে প্রমাণ দেন তার নাম হলো আদিকারণ বিষয়ক প্রমাণ। এ প্রমাণ মূলত একই প্রমাণের দুই বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ মাত্র। উভয় প্রমাণই সর্বজনগৃহীত কার্যকারণ তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ড. ফ্লিন্টের বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণকে ভালভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পাঁচটি দিক থেকে বুঝতে প্রথমত, ড. ফ্লিন্টের মতে, কার্যকারণতত্ত্ব হলো সার্বিক এবং সঠিক। কার্যকারণতত্ত্বের সঠিকতা বা সত্যতা প্রমাণ করে যে, জগতে যা কিছু রয়েছে এবং যা কিছু ঘটে তার কারণ অবশ্যই রয়েছে। কাজেই এ বিশ্বজগতেরও কোনো কারণ আছে। এ কারণ হলো ঈশ্বর।

দ্বিতীয়ত, লাইবনিজের উপযুক্ত কারণবাদ অনুসারে বলা যেতে পারে যে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া এ জগতে কোনো কিছু ঘটতে পারে না। সুতরাং এ বিরাট বিচিত্র জগৎ সৃষ্টির মূলেও যে এক উপযুক্ত কারণ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। আর এ উপযুক্ত কারণই ঈশ্বর।

তৃতীয়ত, কার্যকারণতত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে। জগতের কোনো কিছু কারণ ছাড়া হয় না। জগতের সবকিছুর যখন কারণ আছে তা হলে কারণেরও কারণ আছে। তবে এভাবে কার্য থেকে কারণ সম্পর্ক হিসেব করতে করতে আমাদের চিন্তাধারা অশেষভাবে পিছনের দিকে যেতে পারে না। তা হলে ‘অনবস্থা দোষ’ (Infinite regress) দেখা দেবে। এ অনবস্থা দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এ আদি কারণ স্বয়ংসৃষ্ট (Causa sui)। সুতরাং এই কারণের আর কারণ নেই। এ আদি কারণের নামই ঈশ্বর।

চতুর্থত, কারণের মিতব্যয়িতা নিয়ম (Law of Parsimony) অনুসারে আমরা জানি যে, একই জিনিসের একটিমাত্র কারণ থাকা সম্ভব। তা হলে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এ জগতের একটিমাত্র আদি কারণ থাকাই সম্ভব। আর এ আদি কারণই হলো ঈশ্বর।

পঞ্চমত, সাধারণত কার্যের প্রকৃতি বিচার করে কারণের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। জগৎকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, জগৎ হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক। অতএব, এক পরম আধ্যাত্মিক শক্তি যে জগতের একমাত্র আদিকারণ সে বিষয় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এ আধ্যাত্মিক শক্তিকে ড. ফ্লিন্ট ঈশ্বর বলে অভিহিত করেছেন।

ড. মার্টিনিউর কাছে এই বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণই কার্যকারণ বিষয়ক প্রমাণে রূপ পায়। এ প্রমাণে তিনি কার্যকারণ সম্পর্কে ধারণা এবং স্বরূপ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ করতে চান।

২. তত্ত্ব-বিষয়ক প্রমাণ (The Ontological Proof)

তত্ত্ব-বিষয়ক প্রমাণ অনুসারে ঈশ্বরের ধারণা থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। মধ্যযুগের খ্রিস্টান-দার্শনিক **সেন্ট আনসেলম (St. Anselm, 1093-1109 A.D.)** এই প্রমাণের প্রথম অবতারণা করেন। পরবর্তীকালে ডেকার্টে, লাইবনিজ, হেগেল প্রমুখ অনেক দার্শনিক বিভিন্নভাবে এ মতবাদের সমর্থন করেন।

আনসেলম এর মতে, আমাদের মনে এক পূর্ণ সত্তার (Perfect Being) ধারণা আছে। এ পূর্ণসত্তা নিশ্চয়ই অস্তিত্বশীল হবে। কারণ অস্তিত্ব ছাড়া সত্তা পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং পূর্ণসত্তার অস্তিত্ব আছে এবং পূর্ণসত্তা হলো ঈশ্বর। অতএব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। সাধু আনসেলম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রসপোজিয়ামে (Proslogium) নিজেই বলেছেন, “আমরা ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলি ঈশ্বরের চেয়ে বড় কিছু চিন্তা করা অসম্ভব। বাস্তব জগতে এরূপ এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। কারণ, যদি তা না থাকত তবে সে ঈশ্বর যার চাইতে বড় কিছু কল্পনা করা যায় না, সে ঈশ্বর হতো না। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পূর্ণসত্তা হিসেবে ঈশ্বরকে চিন্তা করলেই তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। ”

ডেকার্টে আসেলমের প্রমাণকে সমর্থন করে একটু ভিন্নভাবে নিজের প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, আমাদের মনে এক অসীম সত্তার (Infinite Being) ধারণা আছে। কিন্তু যেহেতু মানুষ সসীম, সে কখনও এ ধারণা তার মনে সৃষ্টি করতে

পারে না। সুতরাং অসীম সত্তার ধারণার স্রষ্টা হিসেবে অসীম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। এ অসীম সত্তা হলো ঈশ্বর। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

হেগেলের মতে, ধারণা বস্তুর অস্তিত্ব সূচনা করে। কাজেই ঈশ্বরের ধারণা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

৩. উদ্দেশ্যবাদ বিষয়ক প্রমাণ(The Teleological Proof)

জাগতিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তির পেছনে সর্বব্যাপ্ত এক আধ্যাত্মিক সত্তা, এক সৃজনশীল শক্তির আবিষ্কারই হলো উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রমাণের লক্ষ্য। ড. মার্টিনিউ, হেগারসন প্রমুখ উদ্দেশ্যবাদী দার্শনিকের মতে, জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও বস্তুবিন্যাস ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, জগৎ এক বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; জগৎ অন্ধশক্তির ফল, এক আধ্যাত্মিক শক্তির মহাপরিকল্পনার পরিণাম। ঈশ্বর হলেন এ উদ্দেশ্যমূলক জগতের চরম আদর্শ। এ বিশ্বের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি ঘটনায় এক উদ্দেশ্যের পরিষ্কার প্রমাণ দেখা যায়। জাগতিক বস্তুর সুসামঞ্জস্য, জগতের প্রতি গঠন পারিপাট্য, নির্বাচন ক্ষমতা, স্তরভেদ ইত্যাদি এ উদ্দেশ্যের জ্বলন্ত প্রমাণ।

কেয়ার্ড (Caird), নর্মান কেম্প স্মিথ (Norman Kemp Smith) প্রমুখ এ প্রমাণের বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

৪. নীতি বিষয়ক প্রমাণ(The Moral Proof)

মূল্য ব্যক্তিগত (বিষয়গত) ও বিষয়গত উভয়ই (Value is both Subjective and Objective) :

কান্ট ও মার্টিনিউ নীতিবিষয়ক প্রমাণের প্রবর্তন করেন। নৈতিক প্রমাণের মূল কথা হলো নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।

কান্টের মতে, আমাদের নৈতিক চেতনা এমন নৈতিক ন্যায়পরতার দাবি জানায় যে, ধার্মিক অবশ্যই সুখী হবে। কিন্তু সাধারণত আমরা ধার্মিকদের এ জগতে অসুখীই হতে দেখি। সাধারণ মানুষের পক্ষে সব ধার্মিককে সুখী করা সম্ভব নয়। তবে প্রশ্ন ওঠে এ কাজ কে করবে ? একমাত্র ঈশ্বরই ধার্মিকতা এবং সুখের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন। ধার্মিক ব্যক্তিকে এ জীবনে সুখী করা না গেলেও ঈশ্বর তাঁকে পরজীবনে সুখী করতে পারেন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

মার্টিনিউ বলেন, নৈতিক দায়িত্ব ও নৈতিক আদর্শ (moral obligation and moral ideal) ঈশ্বরের নৈতিক দায়িত্ব ও নৈতিক অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মানুষের দায়িত্ব কার কাছে ? সসীম মানুষ সসীম মানুষের কাছে দায়ী হতে পারে না। কারণ সসীম মানুষের পক্ষে মানুষের সব অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সসীম মানুষ অসীম সর্বজ্ঞ সত্তার কাছেই দায়ী হবে। আর এ অসীম সর্বজ্ঞ সত্তাই হলো ঈশ্বর।

একেশ্বরবাদের চারটি বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সেগুলো হলো:

১. অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism)

২. সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)

৩. ঈশ্বরবাদ (Theism) এবং

৪. সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism)।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্কের প্রশ্নে মতবিরোধ থেকেই একেশ্বরবাদের এ চারটি বিভিন্ন রূপের উৎপত্তি

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ(DEISM)

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর একাই ছিলেন। পরে তিনি মনে মনে একটি জগতের পরিকল্পনা করেন। তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপ এ জগৎকে তিনি এক বিশেষ মুহূর্তে নিছক শূন্য থেকে (out of nothing) সৃষ্টি করেন। কেউ কেউ মনে করেন, জড় পদার্থ পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং ঈশ্বর ঐ জড় পদার্থকে গঠন করে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এ জগৎ সৃষ্টির পর ঈশ্বর প্রয়োজনীয় শক্তি সৃষ্টি করলেন। পরে জগৎকে এ শক্তিগুলোর ওপর ছেড়ে দেন। শক্তিগুলো এ জগৎকে নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করতে লাগল। শক্তিগুলো হলো গৌণ কারণ(secondary cause), আর ঈশ্বর রইলেন তিনি

রইলেন জগৎ থেকে দূরে সরে, জগৎ স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করলো। জগৎ এক বিরাট বিস্ময়কর যন্ত্ররূপে কাজ করে যেতে লাগলো। চলতে চলতে এ যন্ত্র যখন বিকল হয়ে পড়ে তখন ঈশ্বর এতে হস্তক্ষেপ করেন। তাছাড়া যন্ত্র আপন মনেই চলতে থাকে। সুতরাং এ মত অনুসারে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর জগতের বাইরে অবস্থান করেন। ঈশ্বর ও জগৎ দুই যতন্ত্র সত্তা, উভয়ের মধ্যে কোনো অন্তর সম্পর্ক নেই, উভয়ের সম্পর্ক হলো বাহ্য সম্পর্ক। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে পূর্ব থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয় :

(ক) বিশেষ সময়ে জগতের সৃষ্টি—এমন এক সময় ছিল যখন জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বিশেষ এক সময়ে এ জগৎ সৃষ্টি হয়।

(খ) ঈশ্বরের দ্বিরূপ—জগৎ সৃষ্টির আগে জগৎ ছাড়া ঈশ্বরের এক রূপ এবং জগৎ সৃষ্টির পরে ঈশ্বরের জগৎ-বহির্ভূত রূপ।

(গ) মুখ্য কারণ ও গৌণ কারণের প্রভেদ—জগৎস্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর হলেন প্রথম বা মুখ্য কারণ(Primary cause)। জগৎকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য ঈশ্বর জগতের মধ্যে যে শক্তি সৃষ্টি করেছেন সেগুলো হলো গৌণ কারণ।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ—এই মতবাদ যদিও ঈশ্বরকে জগৎ-বহির্ভূত বলে বিবেচনা করে তবু এ কথা স্বীকার করে যে প্রয়োজনবোধে ঈশ্বর জগতের কাজে হস্তক্ষেপ করে থাকেন।

(ঙ) ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগৎ-বহির্ভূত—জগৎ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগতের বাইরে অবস্থান করেন।

সর্বেশ্বরবাদ(PANTHEISM)

সর্বেশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য এ মতবাদের সৃষ্টি। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর হলেন এক অতিবর্তী সত্তা এবং ঈশ্বরের সাথে জগতের সম্পর্ক হলো অতিবর্তী সম্পর্ক। পক্ষান্তরে, সর্বেশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর হলেন এক অন্তর্ব্যাপী সত্তা, ঈশ্বরই সবকিছু এবং সবকিছুই ঈশ্বর। আর ঈশ্বরের সাথে জগতের সম্পর্ক হলো অন্তর্ব্যাপী সম্পর্ক। বস্তুত সর্বেশ্বরবাদের মূল কথা হলো ঈশ্বরই সব এবং সবই ঈশ্বর। ঈশ্বর ও জগৎ এক। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জগতের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সুতরাং জগতের দ্বারা ঈশ্বরের সীমিত হওয়ার কথা ওঠে না। ঈশ্বর-বহির্ভূত কোনো সত্তাই সত্য হতে পারে না। সর্বেশ্বরবাদ একের সত্তাই স্বীকার করে এবং বহুর কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জড়, প্রাণ ও মন, এক কথায়, বিশ্ব-চরাচর ঈশ্বরের অনন্ত সত্তায় বিধৃত। ঈশ্বর নিগুণ। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

এ হিসেবে সর্বেশ্বরবাদকে বহুবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ বলা চলে। বহুবাদীরা বহু সত্তার সত্যতা স্বীকার করেন। সর্বেশ্বরবাদীদের মতে বহু মিথ্যে, একই সত্য।

সর্বেশ্বরবাদকে অমূর্ত একত্ববাদ (Abstract Monism) বলেও অভিহিত করা হয়েছে। কারণ এ মতবাদ অনুসারে পরম সত্তাই একমাত্র সত্তা। জগতের বহুত্ব মিথ্যা বা অবভাস মাত্র। বহুত্বের কোনো আত্যন্তিক সত্যতা নেই। আধুনিক পাস্চাত্য দর্শনে প্রখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা হলেন সর্বেশ্বরবাদের একজন প্রধান সমর্থক।

সর্বধরেশ্বরবাদ PANENTHEISM

ঈশ্বর সম্পর্কে হেগেলের ব্যাখ্যা সর্বধরেশ্বরবাদ নামে পরিচিত। হেগেলের ঈশ্বরবাদ বা সর্বধরেশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে উভয় মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে। এ মতবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের মধ্যবর্তী পথ (Middle ground or Middle Course or mean) অবলম্বন করে। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর জীব ও জগতের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেন। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদ দুই বিরুদ্ধ মতবাদ। সর্বধরেশ্বরবাদ এ দুই বিরুদ্ধ মতবাদের সমন্বয় সাধন করে এভাবে যে, ঈশ্বর জীব ও জগতের ভেতরেও অবস্থিত এবং বাইরেও অবস্থিত। তিনি অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী উভয়ই। অসীমের সঙ্গে সসীমের, পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের এক অনিবার্য ও আংশিক সম্পর্ক রয়েছে। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন।

নানা দিক থেকে বিচার করে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, জীব ও জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদগুলির মধ্যে এ মতবাদই সবচেয়ে সন্তোষজনক মতবাদ।

ঈশ্বরবাদ (THEISM)

আমরা সর্বধরেশ্বরবাদ আলোচনাকালে বলেছি যে, হেগেলের সর্বধরেশ্বরবাদকে ঈশ্বরবাদও বলা যায়। কিন্তু মার্তিনিউ (Martineau)-এর ঈশ্বরবাদ হেগেলের ঈশ্বরবাদ বা সর্বধরেশ্বরবাদ থেকে একটু স্বতন্ত্র।

মার্তিনিউ হেগেলের মতই বলেন, ঈশ্বর জগতের মধ্যেও আছেন আবার বাইরেও আছেন। কিন্তু জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের ব্যাপারে মার্তিনিউ ও হেগেল ভিন্ন মত পোষণ করেন। হেগেলের মতে, জগতের ন্যায় জীবের বেলাতেও ঈশ্বর অন্তর্ভাব্য ও অতিবর্তী। কিন্তু মার্তিনিউ মনে করেন, ঈশ্বর জীবের সম্পূর্ণ অতিবর্তী, অর্থাৎ ঈশ্বর একেবারেই জীবের বাইরে থাকেন। জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো নিবিড় সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর জীবাত্মাকে সৃষ্টি করার পর তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার উপর অর্পণ করেছেন। সুতরাং জীবের সাথে ঈশ্বরের কোনো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই। সম্পর্কটা অনেকটা বাহ্যিক।

God & the problem of Evil:

অমঙ্গলের শ্রেণীবিভাগ Classification of evils

অমঙ্গলকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

- (১) অধিবিদ্যক অমঙ্গল বা প্রাকৃতিক অপূর্ণতা বা বিশৃঙ্খলাসমূহ, যেমন— ভূমিকম্প, সাইক্লোন, অনাবৃষ্টি এবং প্লাবন ইত্যাদি।
- (২) দৈহিক এবং মানসিক অমঙ্গল, যেমন—দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু ইত্যাদি;
- (৩) নৈতিক অমঙ্গল বা পাপ, যেমন— অন্যায়-অবিচার, নিষ্ঠুরতা, লোভ, ঘৃণা, চুরি, ডাকাতি, বিবাহ- বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

অমঙ্গল সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ(Different Philosophical views regarding evils)

সর্বেশ্বরবাদ : এ মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর ছাড়া জগতের অন্য কোনো সত্তা নেই। ঈশ্বরই সব, ঈশ্বর। ঈশ্বর সত্য, জগৎ মিথ্যা। অতএব, জগতের অমঙ্গলের অস্তিত্ব মিথ্যা। যাকে আমরা অমঙ্গল বলি তা হলো মায়া বা অলীক ধারণা। প্রখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা এর সমর্থক।

দ্বৈতবাদ: দ্বৈতবাদ অমঙ্গলকে ব্যাখ্যা করতে চার্য দু'ভাবে—প্রথমত, ঈশ্বরের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী অমঙ্গলকারী শক্তির সাহায্যে এবং দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সহ-নিত্য আদিম জড়ের সাহায্যে। দ্বৈতবাদের প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বর আছেন— একজন হলেন কল্যাণ বা মঙ্গল সাধনকারী ঈশ্বর, অপরজন হলেন অকল্যাণ বা অমঙ্গল সাধনকারী ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টির মূলে উভয় ঈশ্বরই থেকে জন্মকাল সৃষ্টি হয়। জড়িত আছেন। তবে মঙ্গলের ঈশ্বর হলেন প্রকৃত ঈশ্বর। তিনি প্রতিনিয়ত জগৎ থেকে অমঙ্গলকে বাদ দিতে চেষ্টা করেছেন। অমঙ্গলের ঈশ্বর তাঁর এই কাজে প্রতিনিয়ত বাধা দিয়ে অমঙ্গল সৃষ্টি করে চলেছেন। পুরাতন কালে পারস্যের জোরাস্টার প্রবর্তিত ধর্মমতে আহুরা মাজদা হলেন কল্যাণের বা মঙ্গলের ঈশ্বর, আর আরিমান হলেন অমঙ্গলের ঈশ্বর। যেহেতু এ মতবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে কাজেই এ মতবাদ ছি-ঈশ্বরবাদ নামে পরিচিত।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ : অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের মতে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি শেষ করেই জগৎকে পিছে ফেলে রেখে ষ-স্থানে ফিরে গেছেন। ঈশ্বর হলেন বিশ্বাতীত সত্তা। তিনি অতিবর্তী পুরুষ। তিনি জগৎকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ফলে জগৎ আপন নিয়মেই চলছে। জাগতিক অমঙ্গল হচ্ছে জগতের স্বাধীনতার চরম মূল্য। অবশ্য জগতে কোনো সমস্যা বড় আকারে দেখা দিলে অথবা জগৎ সংসারে পাপের বাড়াবাড়ি হলে তিনি জগতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। পাপীকে শাস্তি দিয়ে তিনি জগৎকে আবার সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

ঈশ্বরবাদ : ঈশ্বরবাদ মতে, জগৎ হলো সসীম। জগতের সবকিছুই সসীম। সসীমতার অর্থ হলো অপূর্ণতা আর এই অপূর্ণতাই হলো অমঙ্গল। অমঙ্গলকে পরিহার করে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করতে অস্তিত্ব সূচনা করে। পারেন নি। অমঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা জগতে রয়েছে। অমঙ্গলের অস্তিত্ব মানুষের জন্য' নৈতিক শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে। প্রখ্যাত দার্শনিক লাইবনিজ এই মতের ব্যাখ্যাকার।

সর্বধরেশ্বরবাদ : এ মতবাদ অনুসারে অমঙ্গল হলো মঙ্গলের পথে সিঁড়িস্বরূপ। অমঙ্গল হলো একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। এ জগতে চরম অমঙ্গল বলে কিছু নেই। শাস্ত্রত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যা আমাদের কাছে অমঙ্গল বলে মনে হয় আসলে তা এই জগতে মঙ্গল অর্জনের একটা মাধ্যম বা উপায় ছাড়া কিছু নয়। পরম সত্তার দিক থেকে বিচার করলে জগতের প্রত্যেকটি জিনিসই স্ব-স্থানে মঙ্গলরূপে বিদ্যমান। প্রত্যেকটি জিনিস মঙ্গলেরই প্রকাশ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির জন্যই কোনো কিছু অমঙ্গল হিসেবে ধরা দেয়। ভাববাদী দার্শনিক হেগেল এই মতবাদের ব্যাখ্যাকার, তিনি অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

Topic 07:-

Major Trends in Contemporary

Western Philosophy:

Existentialism, Logical Positivism,

Pragmatism, Neo-Idealism, Neo-

Realism, Intuitionism and Analytical

Philosophy.

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- অস্তিত্ববাদী গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকবৃন্দের পরিচয়
- কিয়ের্কেগার্ড, জ্যা পল সার্ত্রে'র অস্তিত্ববাদ
- ভিয়েনা চক্র ও যৌক্তিক দৃষ্টবাদী দার্শনিকগণের পরিচয়
- প্রয়োগবাদের মূল বক্তব্য ও দার্শনিকগণের পরিচয়
- নব্য ভাববাদ ও নব্য বাস্তববাদের বিভিন্ন ধারা ও দার্শনিকগণ
- জি ই ম্যুর ও বার্ট্রান্ড রাসেলের বিশ্লেষণী দর্শন

সোর্স সমূহ:

- সংশ্লিষ্ট টপিকের Live mcq Lecture pdf
- হেগেলোত্তর দর্শন – বজলুল করিম
- The chief current of contemporary philosophy – D.M Datta

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ (Topic 07)

অস্তিত্ববাদ(Existentialism)

প্রথম মহাযুদ্ধ বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, বিশ্বব্যাপী মানুষ হতাশা ও নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শন তখন এক স্থিতিশীল অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। পাশ্চাত্য দর্শনের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে এক তীব্র সমালোচনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এই নতুন চিন্তাধারা কিছু সংখ্যক দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, শিল্পী, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের বক্তব্য এবং লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ চিন্তাস্রোতের উন্মেষ ঘটল।

এ সমস্ত লেখকগণের মধ্যে ডেনমার্কের সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (S. Kierkegaard 1813 - 1855), জার্মানির কার্ল জাসপার্স (K. Jaspers, 1883-1969), এফ. নীৎসে (F. Nietzsche, 1844-1900), হুসার্ল (Husserl, 1859-1938), আলবার্ট ক্যামু (Albert Camus), মার্টিন হিডেগার (M. Heidegger), ফ্রান্সের জাঁ-পল সার্ত্রে (Jean Paul Sartre, 1905-1980),

গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (G. Marcel. 1889- ?) ও ফ্রাঞ্জ কাফ্কা (F. Koffka, 1883-1924) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অস্তিত্ববাদীরা সার্বিক ধারণা তথা ভাববাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তারা বিশেষ ব্যক্তির অস্তিত্ব ও মানবসত্তার স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন বলে এই মতবাদকে ব্যক্তিসত্তাবাদও বলা যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বরবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী নামে দুটো ধারার উদ্ভব হয়েছে:

প্রথম দলে কিয়ের্কেগার্ড, জাসপার্স, মার্সেল এবং লুইলাভেল (ফ্রান্সের একজন অধ্যাপক) এবং নিরীশ্বরবাদী দলে হিডেগার, ব্যাটালি, নীটশে, বেভিয়ার এবং সার্ত্রে নাম উল্লেখযোগ্য।

Existence শব্দের ব্যাখ্যা : 'Existence' এর সাধারণ অর্থ হলো থাকা বা অস্তিত্ব। 'অস্তিত্ব' শব্দ থেকে 'অস্তিত্ববাদ' জন্মলাভ করেছে। দার্শনিক অর্থে এখানে অস্তিত্ব বলতে বুঝায় মানুষের সুগু সন্তানবনা। ব্যক্তির সুগু সন্তানবনার প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। একটা সন্তানবনা বা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে বাস্তবের স্তরে দাঁড়ানই Existence। অস্তিত্ববাদীগণ to be বা to live এবং to exist এর মধ্যে পার্থক্য বা ভেদ নির্দেশ করেছেন।

অস্তিত্ববাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

> প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শনের(বস্তুবাদ, ভাববাদ, দ্বন্দ্বিকবাদ...) বিরুদ্ধে, মধ্যযুগীয় চার্চ ও ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ এই দর্শন।

> মানুষের ভাগ্যের নির্মাতা মানুষ নিজেই। ব্যক্তি মানুষকে গুরুত্ব প্রদান। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার।

> সত্তা(essence) এবং অস্তিত্বের(existence) মধ্যে পার্থক্য করে, অস্তিত্বকে সারসত্তার পূর্বগামী মনে করে।

সোরেন কিয়ের্কেগার্ড(১৮১৩- ১৮৫৫)

ডেনমার্কের দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা। হেগেলের মতের তীব্র সমালোচনা করে বলেন ব্যক্তি ও ব্যক্তি মন পরমসত্তার প্রকাশ নয় বরং স্বতন্ত্র ও অস্তিত্বশীল। অবশ্য তিনি ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী একজন খ্রিস্টান দার্শনিক। তিনি জীবনের ৩ টি স্তরের কথা বলেন:

১. সৌন্দর্য্যানুভূতির স্তর(Aesthetic stage) - এই স্তরে মানুষ ইন্দ্রিয় কামনায় ডুবে থাকে। নীতি ও ধর্মের অনুসরণ করে না। এটা ধ্বংসের স্তর।

২. নৈতিক স্তর(Ethical stage): এটা মানবিকতার স্তর। কামনা ত্যাগ করে নীতির পথ অনুসরণ করে।

৩. ধর্মীয় স্তর(Religious stage): নিজের অস্তিত্বের অর্থ আবিষ্কার করে, ঈশ্বরের নিকট মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

কার্ল জাসপার্স/ ইয়েসপার্স(Karl Jaspers)

জাসপার্স দার্শনিক চিন্তার ৩ টি শৈলীর কথা বলেন-

১. তার মতে জড়, প্রাণ ও মনের গুণগত পার্থক্য আছে।

২. দর্শন হলো অস্তিত্বের আলোচনা।

৩. দার্শনিক চিন্তার আরেকটি পথ হলো অধিবিদ্যার পথ।

জাসপার্স ৩ রকমের সত্তার কথা বলেন -

১. Being there(জগত সত্তা)

২. Being oneself (ব্যক্তিসত্তা)

৩. Being in itself(স্বরূপ সত্তা)

তার মতে ঈশ্বর বস্তু নয় যে তাকে জানা যাবে, ঈশ্বর কে প্রমাণ করা যায়না। তিনি বলেন, A proved God is no God- ঈশ্বরকে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে তাকে অপমান করা হয়।

জ্যা পল সার্ত্রে (১৯০৫- ১৯৮০):

সার্বের অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান উক্তি, " অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্বগামী" (Existence precedes essence)। এর অর্থ প্রথমে অস্তিত্ব পরে স্বভাব, আগে জীবন পরে ধর্ম। সার্বের ছিলেন নিরীশ্বরবাদী অস্তিত্ববাদী। তাত মতে, Man is nothing else but that which he makes of himself - মানুষ যা হবার ইচ্ছে করে সে তাই। পূর্ব থেকে তার স্বভাব নির্ধারিত থাকেনা, ঈশ্বর থাকলে এ নির্ধারনের প্রশ্ন আসতো। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

" Thus, there is no human nature, because is no God to have a conception of it" (Satre-Existentialism and Human, page-28)

তার মতে To exist এবং To live-এ ক্রিয়াদ্বয়ের অর্থ ভিন্ন। "To exist" এর অর্থ হলো এক উন্নততর অস্তিত্ব, যার অধিক মূল্য আছে এবং গভীর সদর্থক দিক আছে। অপরপক্ষে To live' এর অর্থ হলো শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকা, খড়-কুটার মত স্রোতে গা ভাসিয়ে চলা, একে বলা হয় অর্থহীন জীবন, (a meaningless life) অস্তিত্ববাদীর ভাষায় বলা যায় "he does not exist, he merely lives." নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বাঁচে কিন্তু মানুষ Exist করে। তাঁদের নিকট অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে - "a full, vital, selfconscious, responsible and growing life."

সার্তে স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতা হিসেবে ব্যবহার করেননি। মানুষ অফুরন্ত স্বাধীনতার অধিকারী হলেও ভাবাবেগ ও খেলালীপনার দোহাই দিয়ে স্বাধীনতার নামে সে যা খুশি তা করবে এরূপ ধারণা সার্তে পোষণ করেন না। ওজর দিয়ে এরূপ কাজকে সমর্থন করা যায় না। মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাই এখানে তাঁর অস্তিত্ববাদ মানবতাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যক্তি নিজকে গড়ার সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতিকে গড়ার প্রয়াস পায়। এ প্রসঙ্গে সার্তে বলেন, "In fashioning ,I fashion man." অর্থাৎ আমি নিজকে যেভাবে গড়ি, মানুষকে সেভাবেই গড়তে চাই। নিজকে গঠনের মধ্যে সমস্ত মানুষকে গঠনের একটি প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাই।

‘অস্তিত্ব সত্তার পূর্বগামী’ এ কথাকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করাতে গিয়ে সার্তে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন কোথাও একথা লেখা নেই যে, ঈশ্বর আছে। নীৎসের মতে ঈশ্বর মৃত (Gott ist tot- God is dead)। সার্তে আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে ঈশ্বরের যদি মৃত্যু হয় তবে এর দ্বারা এই বুঝাবে যে তিনি একদিন ছিলেন এবং তাঁকে নিশ্চয়ই কেউ

LOGICAL POSITIVISM (যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ/দৃষ্টবাদ)

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের চিন্তাধারা এমন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন, যা অতীতের দার্শনিকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এ. ই. ব্লুমবার্গ (A. E. Blumberg) ও হার্বার্ট ফেইগল (Herbert Feigl) ভিয়েনা সার্কেল'-এর (Vienna Circle) দেয়া কতকগুলো দার্শনিক মত সমষ্টি-র (a set of philosophical ideas) নাম দেন ‘যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ’। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সমর্থক শব্দ হচ্ছে সঙ্গত অভিজ্ঞতাবাদ, যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ, বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাবাদ ও যৌক্তিক নব্য- প্রত্যক্ষবাদ। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মরিজ শ্লিক (Moritz Schlick) (১৮৮২-১৯৩৬) ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। মরিজ শিকের পরিচালনায় ‘ভিয়েনা সার্কেল’ শিরোনামে এক ‘সেমিনার’ (seminar) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ভিয়েনা সার্কেল’ নামে এক দার্শনিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এই চক্র-এর (Circle) সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মরিজ শ্লিক, ফ্রিডরিক ওয়েজম্যান (Friedrich Waismann), রুডল্ফ কারন্যাপ (Rudolf Carnap) (১৮৯১-১৯৭২), অটো নিউরাথ (Otto Neurath) (১৮৮২-১৯৪৬), হার্বার্ট ফেইগল (Herbert Feigl), ভিক্টর ক্রাফট (Victor Kraft), হ্যাস হান (Hans Hahn), কার্ল মেজার (Karl Menger) প্রমুখ।

এই ভিয়েনা চক্র হলো একটি আন্দোলনের ফল, যা মহাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। এই ভিয়েনা চক্রের, যা থেকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ উদ্ভূত হয়েছিল, প্রধান উদ্দেশ্য দুটো;

১. দার্শনিক আলোচনাকে বিজ্ঞান এর সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা।
২. অধিবিদ্যার অসারতা প্রতিপন্ন করা।

এই মতবাদ অতীন্দ্রিয়বাদের বিরুদ্ধ মতবাদ। হোয়াইটহেড (Whitehead) (১৮৬১-১৯৪৭), রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), সাম্প্রতিককালের বাস্তববাদী দার্শনিক ম্যুর (১৮৭৩-১৯৫৮), ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১) ও অন্যান্য চিন্তাবিদেদের ভাষাসম্পর্কীয় বিশ্লেষণ (linguistic analysis) এ মতবাদকে যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। আমেরিকায় সি. ডব্লিউ. মরিস (C. W. Morris) এবং ই. নেগেল (E. Nagel), ইংল্যান্ডে স্টেবিং (Stebbing), উইজডম (Wisdom) (১৯০৪-), গিলবার্ট রাইল (Gilbert Ryle) (১৯০০-১৯৭৭) এবং এ. জে. এয়ার (A. J. Ayer) (১৯১০-) যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের, অংশত বা পূর্ণত, সমর্থক ছিলেন। এ মতবাদ ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে তত্ত্ববিদ্যার অসারতা প্রমাণ করে বিজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

তত্ত্ববিদ্যার বাক্যের অর্থহীনতা প্রমাণ করতে গিয়ে এ মতবাদ মনে করে যে, অর্থপূর্ণ বাক্য দুই ধরনের, যেমন, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ বা তথ্যপূর্ণ। যেসব বাক্যকে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবেই বোঝা যায়, সেগুলো বিশ্লেষণ বাক্য। যেসব বাক্যের অর্থ ও সত্যতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করা যায়, সেগুলোই সংশ্লেষণ বাক্য।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অর্থসম্বন্ধীয় ধারণা প্রথমে প্রকাশিত হয় ভিটগেনস্টাইন-এর (Wittgenstein) (১৮৮৯-১৯৫১) 'ট্রাক্টেটাস লজিকো ফিলসফিকাস' (Tractatus Logico Philosophicus) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। ভিটগেনস্টাইনের এই গ্রন্থ ভিয়েনা চক্রের কাছে পবিত্র গ্রন্থ (bible) হিসেবে পরিগণিত হতো। তাঁর চিন্তাধারা ভিয়েনা চক্রকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে যদিও তিনি এই চক্রের কোন আনুষ্ঠানিক সদস্য ছিলেন না। তাঁর গ্রন্থে প্রত্যক্ষবাদী চিন্তাধারার সূত্র পাওয়া যায় এবং এই গ্রন্থ থেকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা সবিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা কোন সংশ্লেষণ বাক্যের অর্থ নিরূপণ করার ক্ষেত্রে যাচাইকরণ পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, কোন সংশ্লেষণ বাক্য অর্থপূর্ণ হবে যদি এবং একমাত্র যদি তা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাইযোগ্য হয়; অর্থাৎ বাক্যটি সত্য, কি মিথ্যা, তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়। তাঁরা ভাষার এই যৌক্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তত্ত্ববিদ্যার অসারতা প্রমাণ করেন। তাঁরা দেখাতে চান যে, তত্ত্ববিদ্যার বাক্যগুলো এ রকম যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা সত্য, কি মিথ্যা, তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আর তাই তত্ত্ববিদ্যার বাক্যগুলোর কোন জ্ঞানজ অর্থ নেই। তত্ত্ববিদ্যা কতকগুলো অর্থহীন বাক্যের সমষ্টি মাত্র, যার কোন প্রয়োজন নেই। এভাবে তাঁরা অতীতের সব তত্ত্ববিদ্যামূলক আলোচনাকে অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন করেন।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা নীতিবিদ্যার বাক্যকে আবেগধর্মী বলে মনে করেন। নৈতিক ধারণা আসলে কোন ধারণাই নয়, এগুলো ছদ্ম-ধারণা (pseudo speculation) মাত্র। নৈতিক পদ বা ধারণার কোন জ্ঞানজ বা বর্ণনামূলক অর্থ নেই। এ ধরনের পদ কেবল অনুভূতি, আবেগ ও প্রবণতা বা মনোভাবের প্রকাশ মাত্র।

রুডলফ কারনাপ (Rudolf Carnap)

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের প্রধান কাজ হচ্ছে বিজ্ঞানের বাক্যগুলোর বিশ্লেষণ করা, শ্রেণীকরণ করা, পদপ্রকরণ করা, সম্বন্ধ নির্বাচন করা ইত্যাদি। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কৃত্রিম ভাষায় বিশ্লেষণ করা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের কাজ এবং এজন্য কারনাপ দর্শনকে 'লজিক অব সায়েন্স' (logic of science) বলে আখ্যায়িত করেন। আর এটি 'লজিক্যাল সিনট্যাক্স' (logical syntax) ও 'সেমানটিক্স' (semantics) এ দুটি শাখা নিয়ে গঠিত। 'লজিক্যাল সিনট্যাক্স' জটিল ও যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে বিশ্লেষণ, সরল বাক্যকে শব্দে বিশ্লেষণ এবং বিশিষ্ট বাক্য গঠনে শব্দগুলোর একত্রিকরণের ব্যাপারে নীতি আবিষ্কার করে।

'সেমানটিক্স' ভাষার সাথে বস্তুর সম্পর্ক নিয়ে বিবেচনা করে। এদিক থেকে কারনাপের মতে, ভাষাকে পদ বা শব্দার্থতত্ত্ব (semantics) এবং পদবিন্যাসতত্ত্ব (syntax), এই দু'ভাবে আলোচনা করা যায়।

কারনাপ তার Philosophy and Logical Syntax গ্রন্থে বলেন কোনো বাক্য অর্থপূর্ণ হতে হলে তা পরখ নীতির সাহায্যে যাচাইয়ের যোগ্য হতে হবে। তিনি দুই ধরনের পরখের কথা বলেন, প্রত্যক্ষ পরখ ও পরোক্ষ পরখ।

কারনাপের মতে ভাষার বিশ্লেষণ করাই দর্শনের কাজ। তিনি ৩ ধরনের বাক্যের কথা বলেন:

১. পদবিন্যাস সংক্রান্ত বাক্য(syntactical sentence)
২. বস্তুসংক্রান্ত বাক্য(Object sentence)
৩. ছদ্ম- বস্তুসংক্রান্ত বাক্য (Pseudo-object sentence)

এ জে এয়ার (A. J Ayer)

ব্রিটিশ দার্শনিক এ জে এয়ার তার Language, Truth and Logic গ্রন্থে অধিবিদ্যার অসারতা ও অর্থহীনতা দেখান এবং তার যৌক্তিক দৃষ্টবাদী মত প্রদান করেন।

মরিজ শ্লিক (Moritz Schlick)

মরিজ শ্লিক আইন্সটাইনের একজন ব্যাখ্যাকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তার পরিচালিত সেমিনার থেকেই মূলত "ভিয়েনা সার্কেল" নামক দার্শনিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যা যৌক্তিক দৃষ্টিবাদের ভিত্তি হিসেবে অভিহিত করা যায়। তিনি তার Facts and Propositions এবং Meaning and Verification প্রবন্ধে শব্দ ও বাক্যের অর্থ নিরূপণ সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করেন।

প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

প্রয়োগবাদ 'বাস্তবতাই জীবন'-এ কথা বলতে গিয়ে মানুষের জীবনের উপর এমনভাবে গুরুত্ব আরোপ করে যে, এ মতবাদকে জীবন দর্শনও বলা হয়। 'মানুষের জন্যই দর্শন'—এ কথাটির উপর এ মতবাদ গুরুত্ব আরোপ করে বলে একে মানবতাবাদও বলা হয়। এ মতবাদ মনে করে যে, যে দর্শনের সাথে জীবনের কোন যোগ নেই এবং যে দর্শন মানুষের কোন প্রয়োজনে আসে না, সে দর্শন সত্যিকারের দর্শন নয়, কেননা তার কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই।

প্রয়োগবাদী চিন্তাধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রয়োগবাদ দার্শনিক চিন্তনের একটা পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি, যা ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে সি. এস. পার্স-এর (Charles Sanders Peirce) (১৮৩৯-১৯১৪) How to make our ideas clear নামক প্রবন্ধে প্রথম বর্ণিত করা হয়, যা ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জেমস-এর (William James) (১৮৪২-১৯১০) দ্বারা মুখ্যত সত্যসম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হয়; আর যা জন ডিউই (John Dewey) (১৮৫৯-১৯৫২) এবং এফ. সি. এস. শীলার-এর (F. C. S. Schiller) (১৮৬৪-১৯৩৭) দ্বারা বিকশিত, বর্ধিত ও পরিব্যাপ্ত হয়। এই মতবাদ যদিও একটা নতুন ও সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্বলিত মতবাদ হিসেবে সুপরিচিত, তথাপি দার্শনিক সমস্যাবলীর আলোচনায় এ একটা সম্পূর্ণ নতুন মতবাদ নয়। 'প্রয়োগবাদ' শব্দটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত এবং 'প্রয়োগবাদ' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'প্রাগম্যাটিজম' (Pragmatism) গ্রিক শব্দ 'প্রাগম্যা' (Pragma) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সক্রিয় ও নিমিত্তের কাছাকাছি।

চার্লস পার্সের লেখা 'হাউ টু মেক আওয়ার আইডিয়াজ ক্লিয়ার' (How to Make Our Ideas Clear), উইলিয়াম জেমসের 'প্রাগম্যাটিজম' (Pragmatism), জন ডিউই-র 'ইন্সট্রুমেন্টালিজম' (Instrumentalism) এবং এফ. সি. এস. শীলার-এর 'স্টাডিজ ইন হিউম্যানিজম' (Studies in Humanism) প্রয়োগবাদী চিন্তাধারার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। ডিউই, মীড (Mead), বোড (Bode), স্টুয়ার্ট (Stuart), টাফটস (Tufts), ক্যালেন (Kallen) প্রমুখ দার্শনিকদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে লিখিত এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্রিয়েটিভ ইনটেলিজেন্স' (Creative Intelligence) নামক গ্রন্থটি প্রয়োগবাদী নীতির বিভিন্ন প্রয়োগ দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, প্রাকৃতিক মনোবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, অর্থনীতি, 'কলা, ধর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রয়োগবাদীদের মতে মন, ভাব বা ধারণা ইত্যাদি ধারণা হলো কতকগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো বা সমস্যাগুলোকে নিরসন করার যন্ত্র বা উপকরণ মাত্র এবং এজন্যই এ মতবাদকে কখনও কখনও 'করণবাদ' (Instrumentalism) বলা হয়ে থাকে।

প্রয়োগবাদীদের মতে, স্বয়ং বিবর্তনই প্রায়োগিক পদ্ধতি। এমন কি স্বয়ং দর্শনও একটা শেষ লক্ষ্য নয়, যার স্বতঃমূল্য ও মর্যাদা রয়েছে, বরং দর্শন হচ্ছে সামাজিক কল্যাণ বা উন্নতি বিধানের একটা উপকরণ মাত্র।

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কেননা ধর্ম দর্শনকে ধ্বংস করে না। ব্যবহারিক দিক থেকে ধর্ম কাজ করে এবং প্রয়োগবাদীদের মতে, যা কাজ করে তা সত্য। তত্ত্ববিদ্যা বা অধিবিদ্যা-সম্পর্কীয় সমস্যা নিয়ে প্রয়োগবাদীরা যে মতের কথা বলেন, তাকে 'চরম অভিজ্ঞতাবাদ' (Radical Empiricism) বলা হয়ে থাকে, যা জড়বাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ, ভাববাদ ও বুদ্ধিবাদের এক নতুন সংস্করণ মাত্র।

সত্যসম্পর্কীয় সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োগবাদীদের মূল কথা এই যে, কোন ধারণা বা অবধারণের সাফল্য ও ব্যবহারিক মূল্যই ধারণা বা অবধারণের সত্যতা নিরূপণ করে; অর্থাৎ যে ধারণা বা অবধারণের ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা নেই, সে ধারণা বা অবধারণ মিথ্যা। সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক। সত্যতা স্বতঃপ্রতীতি, অনুরূপতা বা সঙ্গতির বিষয় নয়। তাঁরা সত্যতা নিরূপণ বা সত্যের স্বরূপ-সম্পর্কীয় সব ধরনের গতানুগতিক মতবাদের সমালোচনা করে বলেন যে, এই মতবাদগুলো বিশ্বজগতের নিশ্চল ধারণা থেকে উদ্ভূত বলে এগুলোর কোন মূল্য নেই। সত্যতা ব্যবহারিক ফলের দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে থাকে।

সি এস পার্স (C S Pierce):

চার্লস স্যান্ডারস পার্সকে মার্কিন প্রয়োগবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। পার্সের প্রধান অবদান তার অর্থসম্পর্কীয় মতবাদ। তার দর্শনে প্রয়োগবাদ হলো অর্থ নিরূপনের একটি পদ্ধতি। তিনি এটি প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন Popular Science Monthly তে "How to make our ideas clear" প্রবন্ধে।

পার্স যুক্তিবিদ্যাকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন:

১. Speculative grammar: এই অংশ চিহ্ন(sign) এর অর্থপূর্ণতার আকারগত শর্ত নিয়ে জড়িত।
২. Critical logic: প্রতীক(symbol) এর সত্যতার আকারগত শর্ত নিয়ে জড়িত।
৩. Speculative rhetoric

উইলিয়াম জেমস(William James)

আমেরিকার একজন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি পার্সের অর্থসংক্রান্ত প্রয়োগবাদী মতবাদকে সত্যবিষয়ক প্রয়োগবাদী মতবাদে রূপান্তরিত করেন।

জন ডিউই (John Dewey)

জন ডিউই একজন আমেরিকান প্রয়োগবাদী চিন্তাবিদ। তিনি যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সৌন্দর্যবিদ্যা ও শিক্ষাদর্শনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তার মতে দর্শনকে বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। তার মতে প্রয়োগবাদ হচ্ছে করণবাদ(Instrumentalism)। তিনি বলেন সত্যিকারের দর্শন হচ্ছে ক্রিয়া(activity)। জীবনের জন্যই দর্শন, দর্শনের জন্য জীবন নয়।

নব্য ভাববাদ(Neo Idealism)

১৮৩১ সালে হেগেলের মৃত্যুর পর তার বস্তুগত ভাববাদী দর্শনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে সকল দার্শনিক ধারার উদ্ভব ঘটে তাকে হেগেলোত্তর দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। হেগেলোত্তর যুগকে অনেকেই সমকালীন যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। মূলত এই যুগেই হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধে নতুন এক ভাববাদী ধারার সূচনা হয় যা নব্য ভাববাদ(Neo Idealism) নামে পরিচিত। এই নব্য ভাববাদীদের ৩ টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। যথা:

১. ইতালিয় ধারা: বেনেডিটো ক্রোচে ও জিওভানি জেন্টাইল (Giovanni Gentile)
২. আমেরিকান ধারা : যোশিয়া রয়সে, মেরী কলকিন্স, প্রিন্সল প্যাটিনসন এবং হাউইসন।
৩. ব্রিটিশ ধারা : টি এইচ গ্রিন, এফ এইচ ব্রাডলি, ম্যাকটাগার্ড এবং বি. বোসাক্কে

বেনেডিটো ক্রোচে(Benedetto croce)

ক্রোচের দর্শনের সারকথা হলো স্বজ্ঞা বা অনুভূতি, মনই প্রধান শক্তি। ৪ প্রকার ক্রিয়ার মাধ্যমে মন প্রকাশ পেতে পারে, এদের অধ্যাত্ম বা মানসিক জীবনের ৪ স্তর বলা হয়। তার "The Philosophy of Spirit " গ্রন্থে এর উল্লেখ করেন: নন্দনতাত্ত্বিক(aesthetic), যৌক্তিক(Logical) অর্থনৈতিক(Economical) ও নৈতিক(Ethical) ক্রোচে তার গ্রন্থে অধ্যাত্ম জীবনের কার্যাবলিকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

১. তত্ত্বগত ক্রিয়া (Theoretical activity)
২. ব্যবহারিক ক্রিয়া (Practical activity)

ক্রোচের ইতিহাস দর্শন:

ক্রোচের মতে ইতিহাস যেমন প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, দর্শনও তেমনি প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। ইতিহাস দর্শনের পূর্বগামী নয় আবার দর্শনও ইতিহাসের পূর্বগামী নয়, উভয়ের জন্ম একই সময়ে। ইতিহাসের দর্শন ও দর্শনের ইতিহাস অভিন্ন।

জিওভানি জেন্টাইল (Geovanni Gentile)

জেন্টাইলের দর্শনের উৎস তার লেখা ২ টি গ্রন্থ:

১. A summary of Pedagogy
২. The theory of Mind as pure act

জেন্টাইল তার নিজের দর্শনকে প্রকৃত ভাববাদ বলে গণ্য করেছেন। তিনি মনের বিশুদ্ধ ক্রিয়ার উপরে জোর দিয়েছেন।

নব্য বাস্তববাদ (Neo Realism)

নব্য বা আধুনিক বাস্তববাদের জন্ম হয়েছে হেগেলবাদ, নব্য হেগেলবাদ এবং ব্র্যাডলির ভাববাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে বস্তববাদের এক নতুন রূপ- নব্য বাস্তববাদের আবির্ভাব হয় ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়।

জি ই মুর(G.E Moore) তাঁর Philosophical Essays' গ্রন্থে এবং স্যামুয়েল আলেকজান্ডার তাঁর Space, Time, Deity-তে নব্য বাস্তববাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেন। ১৯০৩ সালে জি ই মুর 'Mind' পত্রিকায় 'ভাববাদ খণ্ডন' (Refutation of Idealism) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রাসেলেও নব্য বাস্তববাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন

হফডিং (Hoffding), বেনটেনো (Brentene, (1838-1907), এডমান্ড হুসার্ল (Edmund Husserl) (1859-1938) সমকালীন নব্য বাস্তববাদের প্রবর্তা ছিলেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই নব্য বাস্তববাদের উজ্জ্বলরশ্মি আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছায়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ই. বি. হল্ট (E. B. Holt), ডব্লিউ টি মারভিন (W.T Marvin), ডব্লিউ. বি. পিটকিন (W. B. Pitkin) এবং ই. জি. স্পলডিং (E. G. Spaulding) প্রমুখ দার্শনিক যুক্তভাবে 'নব্য বাস্তববাদ' (The New Realism) প্রকাশ করেন। এটা নিউ ইয়র্কের ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ নব্য বাস্তববাদকে এক নতুন জীবন ও গতি প্রদান করে। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, নব্য বস্তববাদ সরল বা লৌকিক বাস্তববাদের দিকেই প্রত্যাগমন করেছে।

নব্য বিচারমূলক বাস্তববাদ(Neo Critical Realism)

নব্য বাস্তববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নব্য বিচারমূলক বাস্তববাদ আমেরিকাতেই জন্ম নেয়। এই মতের স্রষ্টারা হলেন : ডুরান্ট ড্রেক(Durant Drake), লাভজয়(Lovejoy), জেমস বিসেট প্র্যাট(James Bisset Prat), এ কে রজার্স (A. K. Rogers) , জর্জ সান্টায়ানা (George Santayana), সেলার্স (Sellers), এবং স্ট্রং(Strong)। এই সমস্ত দার্শনিক ১৯২০ সালে "The Essays in Critical Realism " নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের মতে প্রত্যক্ষণে বস্তুকে সরাসরি জানা যায় না। প্রত্যক্ষণের ৩ টি উপকরণ থাকতে হবে : মন, ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও বহির্জগত। এই ত্রিশর্ত জ্ঞানীয় মতবাদকে Three factor theory of perception বলা হয়।

বিশ্লেষণী দর্শন(Analytical Philosophy)

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্লেষণী দর্শনের সূচনা হয় ম্যুর ও রাসেলের দর্শন চর্চায়। কিন্তু রাসেলের বিশ্লেষণের পদ্ধতির সাথে পরবর্তী কালের বিশেষ করে ত্রিশ দশকের শেষে বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনেক পার্থক্য রয়েছে। রাসেল তাঁর Logical Atomism দর্শনে যে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণী পদ্ধতি দিয়ে বিশ্লেষণী দর্শনের দ্বার উন্মোচন করেন (Mathematical logic এর উপর ভিত্তি করা বিশ্লেষণের নতুন কৌশল) পরবর্তীকালে (ত্রিশ দশকের শেষের দিকে) বিশ্লেষণী দার্শনিকগণ তা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন। তাই বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে (রাসেল-ম্যুরের সময়) আজ পর্যন্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিভিন্ন রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। গণিত বিদ্যাকে অনুসরণ করে রাসেল তাঁর যৌক্তিক পরমাণুবাদে (Logical Atomism) দেখিয়েছেন যৌগিক ও তুলনায় কম মৌলিক কোনো কিছুকে (Fact) অমিশ্রতর (simpler) অমিশ্রতম (simplest) এবং মৌলিকতম ও মৌলিকতর কোনো কিছুতে লঘুকরণ (Reduce) করা যায়। এভাবে জগতের অমিশ্রতম ও মৌলিকতম সত্তাকে আবিষ্কার করা যায়। এ সত্তা হলো যৌক্তিক সত্তা, যৌক্তিক পরমাণু (Logical Atoms)। এ পদ্ধতির নাম হলো লঘুকরণ বিশ্লেষণী পদ্ধতি (Method of Reductive Analysis)। কিন্তু পরবর্তীকালে রাইল, উইজডম ভিনগেনস্টাইন, অস্টিন প্রমুখ বিশ্লেষণধর্মী “Ordinary language” (প্রচলিত ভাষা) দর্শনের প্রবক্তাগণ এ পদ্ধতির সমালোচনা করেন। শুধু তা-ই নয়, এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন। তাঁরা এ ধরনের বিশ্লেষণের পরিবর্তে elucidation কথাটা ব্যবহার করেন। তাঁদের মতে দর্শন চর্চার উদ্দেশ্য হলো কোনো জটিল বিষয়কে ব্যাখ্যা করা, সুস্পষ্ট করা। কোনো ধারণা বা কোনো বাক্যে ভাষার তার জটিলতা, দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা রয়েছে, দার্শনিকদের কাজ হলো সে দুর্বোধ্যতা, সে অস্পষ্টতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করা।

মোটামুটি ভাবে বিশ্লেষণী দর্শনের চারটি মূল বক্তব্য রয়েছে:

- (১) বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা পদ্ধতি হিসাবে অতি প্রয়োজনীয়। (২) বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যাই হলো দর্শনের প্রধান কাজ।
- (৩) যে কোনো ধরনের তত্ত্ববিদ্যা অর্থহীন (meaningless) ও ফলপ্রসূ নয়।
- (৪) তথাকথিত জীবন সমস্যা ও আদর্শবাচক বা মূল্যবোধ

বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell)

তিনি কিভাবে বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রয়োগ করেছেন সে সম্পর্কে উপরের আলোচনায় কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসেল রূপগত বিশ্লেষণের (Formal Analysis) কথা বলেন এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জগতের সব কিছুকে বিশুদ্ধ যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পরীক্ষা করেছেন। রাসেলের বিখ্যাত গ্রন্থ Principia Mathematica এবং Philosophy of Logical Atomism শীর্ষক প্রবন্ধসমূহে ওই বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

তার মতে বিশ্লেষণের অর্থ হলো কোনো কিছুকে সংজ্ঞায়িত করা। অন্য কথায় বলা যায় কোনো কথা বা কোনো কিছুকে সংজ্ঞা রূপে ব্যক্ত করেই বিশ্লেষণ করা যায়। সে সংজ্ঞা ভাষাজ বা অভাষাজ হতে পারে। সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তিনি বাস্তব সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত “The Analysis of Matter” এ দ্বিতীয় ধরনের সংজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের শব্দগুলোর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তিনি প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। রাসেল যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন তাকে বলা হয় লঘুকরণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Method of Reductive Analysis)।

তাঁর মতে “প্রত্যেকটি দার্শনিক সমস্যা হচ্ছে বিশ্লেষণের সমস্যা এবং মূলত দর্শনের কাজ হচ্ছে যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং পরে যৌক্তিক সংশ্লেষণ।”

রাসেলের দর্শনে বিশ্লেষণের প্রয়োগের ক্ষেত্র চারটি। যথা গাণিতিক যুক্তি বিদ্যা, বিমূর্ত বিশ্বতত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্যা এবং বিজ্ঞান ও সাধারণ জীবনে প্রতীক ব্যবহারের পদ্ধতি। গাণিতিক যুক্তি বিদ্যায় বিশ্লেষণকে বিশ্লেষণী যুক্তিবিদ্যা বলে। আকারগত বিশ্লেষণ হলো জগতের অমূর্ত যৌক্তিক বিশ্লেষণ। এই আকারগত বিশ্লেষণের দুটি দিক আছে। ১. ভাষা বিশ্লেষণ ২. অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ।

ভাষা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হলো ভাষার যৌক্তিক ক্রটির প্রভাব থেকে দর্শনকে মুক্ত করা। এ প্রসঙ্গে রাসেলের দুটি তত্ত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি হল প্রকারতত্ত্ব (theory of types), অন্যটি হলো বর্ণনাতত্ত্ব (Theory of Description)

রাসেলের মতে আকারগত বিশ্লেষণের সাথে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সংযুক্তির ফলে যে দর্শন গড়ে ওঠে তাকে তিনি বলেছেন তত্ত্ব দর্শন বা Metaphysics। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত The analysis of Matter এবং An Outline of Philosophy নামক গ্রন্থদ্বয়ে তিনি সমস্ত উপাদানকে নিরপেক্ষ বিশেষ বলেছেন যাকে তিনি ঘটনা বা Event নাম দিয়েছেন। এখানেই তাঁর মতবাদকে নিরপেক্ষ একত্ববাদ বলা হয়।

(খ) জি. ই. ম্যুর :

বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন জি. ই. ম্যুর। বিশ্লেষণ বলতে তিনি কোনো কিছুর সংজ্ঞা দেওয়াকেই বুঝেছেন। কিন্তু এ সংজ্ঞা শব্দের সংজ্ঞা নয় বরং ধারণা বা অবধারণের সংজ্ঞা। বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে কোনো একটি বিশেষ ধারণা বা অবধারণ দিয়েই। যাকে তিনি নাম দিয়েছেন Analysandum। এই Analysandum এর পরিবর্তে সমার্থ ধারণা বা অবধারণ ব্যবহার করতে হবে। ম্যুরের মতে শব্দ ও ধারণা অথবা বাক্য এবং অবধারণের মধ্যে পার্থক্যকরণ বিশ্লেষণের একটি পূর্বশর্ত। বিশ্লেষণের কাজ হলো ধারণা বা অবধারণের সংজ্ঞা দেয়া এবং এদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করা। ধারণার সুস্পষ্টতা প্রদান করাই বিশ্লেষণের মূল্য উদ্দেশ্য।” তাঁর মতে, দর্শনের অনেক কাজের মধ্যে বিশ্লেষণ একটি কাজ।

ম্যুর-এর বিশ্লেষণী চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় Principia Ethica(1903) গ্রন্থে। এখানে তিনি নৈতিক পদ ‘ভাল’ শব্দটি কি অর্থ প্রকাশ করে, এর সংজ্ঞাদান সম্ভব কিনা প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা তথা বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে “ভালো” একটি সরল, অপ্রকৃতিক এবং অসংজ্ঞায়িত গুণ।

তিনি ছিলেন একজন সহজবুদ্ধির দার্শনিক। দর্শন, তার মতে আকাশচারিতা নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর সহজবুদ্ধি সমর্থিত বিশ্লেষণই হল দর্শন। এ লক্ষ্যে তিনি লণ্ডনের মার্লি কলেজে ১৯১০-১১ সালে যে কুড়িটি বক্তৃতা করেন তার সমন্বয়ে “Some Main Problems of Philosophy” নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি দর্শনের বিষয়বস্তু কি, জড়বস্তুর জ্ঞান কিভাবে হয়, প্রকৃতপক্ষে জড়বস্তুকে জানা যায় কিনা সে সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। জড়বস্তুর জ্ঞান সম্পর্কে ম্যুর বলেছেন যে, এ সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান হতে পারে না।

(গ) ভিনগেনস্টাইন :

রাসেল ও ম্যুরকে অনুসরণ করেছেন ভিনগেনস্টাইন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ “Tractatus Logico Philosophicus” বিংশ শতাব্দীর দর্শন চর্চায় বিশ্লেষণী দর্শনের স্বাক্ষর বহন করছে। ভিনগেনস্টাইনকে আমরা বিশ্লেষণী দর্শনের ক্ষেত্রে দু’ভাবে দেখতে পারি। প্রথম ভাগে, অর্থাৎ Tractatus যুগের ভিনগেনস্টাইন ছিলেন তত্ত্ববিদ্যা বিরোধী। এ ক্ষেত্রে তিনি রাসেল ও ম্যুর থেকে ভিন্নধর্মী বিশ্লেষণী দার্শনিক ছিলেন। কারণ, রাসেল ও ম্যুর বিশ্লেষণী দার্শনিক হয়েও তত্ত্ববিদ্যার বিরোধী ছিলেন না।

‘Tractatus’ কালের বিশ্লেষণী দর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে ভিয়েনা চক্রের শিক, কারন্যাপ, ও সাম্প্রতিক কালের বৃটিশ দার্শনিক এ. জে. এয়ার। এ দল ‘Tractatus’ কালের ভিনগেনস্টাইনকে অনুসরণ করেছেন। সমকালীন দর্শনের ইতিহাসে এরা হলেন তত্ত্ববিদ্যার প্রধান বিরোধী মতাদর্শ বহনকারী। কারন্যাপ দাবী করেন পরখনীতি(theory of verification) ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তত্ত্ববিদ্যার ধ্বংস সাধন সম্পন্ন হয়েছে। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতে বিজ্ঞানের ভাষা বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের জন্য কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করাই হলো দর্শনের কাজ। এ অর্থে দর্শনকে ‘Metaphysics’ না বলে ‘Metascience’ বা ‘Metalanguage’ বলাই শ্রেয়।

বিশ্লেষণী দর্শনের তৃতীয় দলের প্রবক্তা হলেন Philosophical Investigation-এর ভিনগেনস্টাইন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। তার Tractatus যৌক্তিক পরমাণুবাদের দর্শন এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পথ প্রদর্শন। কিন্তু এ বক্তৃতায় তিনি প্রচলিত ভাষা দর্শন এর (Ordinary Language Philosophy) সূচনা করেন। এ সময় তিনি কেন্দ্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শ্লোগানটি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তা হলো কথা বা বাক্যের অর্থ অন্বেষণ নয়, বরং কোনো প্রেক্ষিতে কথা বা বাক্যটি ব্যবহার করা হলো তা যাচাই করাই দার্শনিকদের কাজ। আর প্রয়োজন হলো এগুলো সঠিক প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভাববাদী দর্শনের প্রধান আড্ডাখানা 'অক্সফোর্ডে'ও ভাষা- বিশ্লেষণের দর্শন প্রাধান্য পায়। সাধারণত একে অক্সফোর্ড ফিলোসফি বলা হয়। এখানেও ভিনগেনস্টাইনের প্রভাব কিছুটা রয়েছে। গিলবার্ট রাইল, জন অস্টিন, পি. এফ. স্ট্রাসন হলেন এ দলভুক্ত। অধ্যাপক গিলবার্ট রাইল তাঁর গ্রন্থ, 'The concept of Mind'-এ মন সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিশ্লেষণী দর্শনের জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে বিশ্লেষণী দর্শনের বিশেষজ্ঞ হলেন অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন। পাশ্চাত্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণার বিষয় বস্তু ছিল Strawson ও Austin-এর মধ্যে সত্য (truth) নিয়ে বিতর্ক। প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যার দর্শন, বিশ্লেষণী দর্শন ও ভাষা দর্শনের উপর তার পাণ্ডিত্য উল্লেখযোগ্য। তার দর্শনচর্চা ও গ্রন্থ রচনা এ বিষয়গুলোকে- কেন্দ্র করেই। যুক্তিবাদী হিসাবে নিজস্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে তিনি প্রথম যে বইটি লেখেন সেই বইটির নাম হলো " যুক্তির আলোকে "।

Topics 08 :-

Modern Philosophic Trends in Bangladesh (Materialism, Idealism, Humanism and Mysticism)

Philosophic Approach to Certain

Problems of Practical Life: (Suicide, Abortion, Environmental Pollution, Terrorism, Hoarding, Corruption in Profession, and Dealings with Lower Animals)

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- বাঙালির দর্শনের বৈশিষ্ট্যসমূহ
- বাঙালি বস্তুবাদী,ভাববাদী,মানবতাবাদী ও মরমীবাদী ধারার দর্শন ও দার্শনিকবৃন্দ
- গোবিন্দচন্দ্র দেব ও আরজ আলী মাতুব্বর
- আত্মহত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের অভিমত
- গর্ভপাতের পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তিসমূহ, বাংলাদেশের অবস্থান
- পশুর প্রতি আচরণ সংক্রান্ত মতবাদসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ

Modern Philosophic trends in Bangladesh :

আবহমানকাল ধরে বাংলার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যময় রূপ ও রসের মাধুর্যে আপ্লুত হয়ে মরমি চেতনা উদ্ভূত যে দর্শন জন্ম লাভ করেছে তাকেই বাংলাদেশ দর্শন নামে আখ্যায়িত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রজ্ঞাময় দর্শন বাংলাদেশের আবহমানকালের বিশাল পটভূমিতে অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত আবর্তিত হয়েছে তাই-ই বাংলাদেশ দর্শন ।

বাংলাদেশ দর্শন হলো বাঙালির সংস্কৃতির দর্শন। বাংলাদেশ দর্শন সম্পর্কে ড. প্রদীপ কুমার রায় বলেছেন, “যে প্রজন্মই দর্শন বাংলাদেশের আবহমানকালের বিশাল পটভূমিতে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে এ সময় পর্যন্ত বিবর্তিত হয়েছে তাই বাংলাদেশ দর্শন।”

অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমেদ বলেন, “বাংলাদেশ দর্শন মোক্ষ বা মুক্তি লাভকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।”

অধ্যাপক সাইদুর রহমান বলেন, “বাংলাদেশ দর্শন কেবল সমদর্শন নয়, খালি পরলোক চর্চা নয়, তত্ত্ববিদ্যার নিছক রোমস্থল ও কসরত নয়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের যে কোনো সার্থক দর্শনের ন্যায় বাংলাদেশ দর্শন মূলত জীবনদর্শন। উন্নত মানবজীবন প্রণয়ন ও যাপনের উপায়নুসন্ধান”

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশ দর্শন হলো বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, মনন ইত্যাদি সম্পর্কিত জীবনদর্শন।

বাঙালির দর্শনের উৎপত্তি : বাংলাদেশ দর্শনের প্রথম ভিত্তি বা উৎস হিসেবে আমরা যে বিষয়গুলোকে পাই সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. প্রাক বৈদিক চিন্তাধারা : বাংলাদেশ দর্শনের প্রথম বীজ রোপণ হয় প্রাক-বৈদিক চিন্তাধারায়। প্রাচীন বাংলার অনার্য সম্প্রদায় এর ধারক ও বাহক, যাদের আমরা দ্রাবিড়-অস্ট্রিক বলে থাকি। এরা লোকায়ত বা চার্বাক নামে পরিচিত। তারা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ বলে মনে করতো। বাঙালি দর্শন তথা বাংলাদেশ দর্শনের বস্তুবাদী ধারার সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে।

২. বৈদিক চিন্তাধারা : বাংলায় আর্যদের আগমনের মাধ্যমে বৈদিক চিন্তাভাবনা অনুপ্রবেশ করে। বৈদিক চিন্তাধারায় অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের বিকাশ লক্ষণীয়। বিভিন্ন পূজার্চণা ও ধর্মীয় ধ্যানধারণার আলোকে তাদের দর্শন বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশ দর্শনে বৈদিক চিন্তাধারার প্রভাব অনস্বীকার্য।

৩. বেদের বিরোধী চিন্তাধারা : বেদ বিরোধী চিন্তাধারা বলতে চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনকে বোঝায়। এ তিনটি সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করে নিজস্ব দর্শন রচনা করে যা বাংলাদেশ দর্শনের বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কিত। বাঙালি দর্শনের উৎস হিসেবে এ তিনটি ধারা বাংলাদেশ দর্শনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

৪. ইসলামিক চিন্তাধারা : বাংলাদেশ দর্শনের উৎসভূমি হিসেবে ইসলামি চিন্তাধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। ইসলামের সাম্যবাদ, মানবতাবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও তত্ত্ব দর্শন দ্বারা বাংলাদেশ দর্শন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও বাংলাদেশ দর্শনে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম দার্শনিকদের ক্ষেত্রে এ কথা শতভাগ সত্য।

৫. পাশ্চাত্য প্রভাব : বাংলাদেশ দর্শনের ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার প্রভাব অপরিসীম। প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগবাদ এবং মার্ক্সবাদ দ্বারা বিভিন্ন বাঙালি প্রভাবিত হয়ে দর্শন রচনা করেন।

৬. মরমিবাদ : বাংলাদেশ দর্শনের উৎস হিসেবে মরমি চিন্তাধারা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। বৈষ্ণববাদ, বাউলবাদ এবং সুফিবাদ ব্যতীত বাঙালি দর্শন বা বাংলাদেশ দর্শন চিন্তা করা অসম্ভব। এ মরমিবাদ বাঙালি দর্শনের অধ্যাত্মবাদী ধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

বাঙালির দর্শনের বৈশিষ্ট্য :

বাঙালির দর্শন একটি প্রাচীন দর্শন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙালির দর্শনে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। তাই বাঙালির দর্শনের বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন চিন্তা পরিলক্ষিত হয়।

১। প্রাচীনকালে বাঙালির দর্শন ছিল নৈসর্গবাদী বা প্রকৃতিবাদী:

প্রাচীনকালে বাংলায় লোকায়ত দর্শনের উদ্ভব ঘটে। লোকায়িতরা ছিল প্রাচীন বাংলার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার দিশারী।" রিস ডেভিডস্ বলেন, প্রাচীনকালের লোকায়িতরাই নিসর্গ ও নৈসর্গিক নিয়মের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এই অর্থে তাঁরাই ছিলেন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথিকৃত।

২। আর্থদের আগমনে বাঙালির দর্শন গড়ে উঠে মুক্তি বা মোক্ষকে কেন্দ্র করে:

আর্থদের আগমনের পরে এ দেশের মানুষের মননে চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটে। সেই সময় এদেশে দর্শন চিন্তা মূলত মুক্তি বা মোক্ষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। মোক্ষলাভকে উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে রেখেই দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি ঘটে। আর এটা শুধু বাঙালির দর্শনের বেলায় নয়, সমগ্র ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্রযোজ্য।

৩। বাঙালির দর্শন জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের প্রভাবে প্রভাবিত:

ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালির দর্শনও এর ব্যতিক্রম নয়। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মকে সত্য এবং জগৎকে মিথ্যা বলা হয়েছে। সমস্ত জিজ্ঞাসা আবর্তিত হচ্ছে পারত্রিক জগৎকে কেন্দ্র করে। এই জীবনকে মনে করা হয়েছে কর্মফল। আর এই কর্ম মানুষকে করেছে কর্মহীন ও কর্মবিমুখ। বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে ব্রহ্ম না থাকলেও নির্বাণই ব্রহ্মের স্থান দখল করেছে।

৪। বাঙালির দর্শনে জীবনের প্রতি উদাসীনতা, আলস্য, বাস্তব বিমুখতা, নিয়তিবাদ ইত্যাদি দেখা যায় :

ইহজগৎকে বাদ দিয়ে পরকালের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় বাঙালি উদ্যম হারিয়ে ফেলে। ফলে বাঙালি জীবনের প্রতি হয়ে উঠে উদাসীন, আলস্য তাঁদের পেয়ে বসে। ফলে দৃষ্টি ও মনযোগ পরকালের দিকেই যায়। মানুষ নিয়তিবাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠে।

৫। বাঙালির দর্শন আধ্যাত্মিক(mysticism)

সহজিয়া, মরজিয়া দর্শন, বাউল দর্শন, বৈষ্ণব দর্শন, ভক্তিবাদ, সুফিবাদ ইত্যাদি সবই বাঙালির দর্শন। অধ্যাত্ম চেতনা বাঙালির দর্শনের মূল লক্ষ্য। আধ্যাত্মিকতা শুধু বাঙালির চিন্তার নয় সমস্ত ভারতীয় দর্শনেরই মূল বৈশিষ্ট্য। বৈদিক ও উপনিষদিক যুগ-দর্শনের কথাই বলি, আর নাস্তিক বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের কথাই বলি-প্রতি ক্ষেত্রেই সমস্যা জগৎ নিয়ে নয়, আত্মার সমস্যা নিয়ে, আত্মার মুক্তি নিয়ে।

৬। বেদ-বিরোধী চিন্তাধারা:

বাঙালির দর্শনে যেমন বেদের প্রভাব আছে, তেমনি বেদ বিরোধী চিন্তাধারাও পরিলক্ষিত হয়। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, তন্ত্র, সহজিয়া, ইসলাম, লোকায়ত দর্শন বাউল দর্শন ইত্যাদি বেদ বিরোধী দর্শন। বাঙালির দর্শনে একই সঙ্গে বেদ ও বেদ বিরোধী চিন্তাধারা প্রবাহমান।

৭। বাঙালির দর্শন ধর্ম প্রভাবিত :

বাঙালির দর্শনকে ধর্ম থেকে আলাদা করা যায় না। ধর্ম ও দর্শন উভয়ই মানুষের হৃদয়জাত। তাই এ দেশের দর্শন চিন্তায় ধর্মতত্ত্ব আবেগ ও ভক্তির আধিক্য আছে।

৮। বাঙালির দর্শন সমন্বয়ধর্মী:

জাতি হিসেবে বাঙালি সংকর জাতি। বাঙালির চিন্তা-চেতনায় বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় ঘটেছে। পুরানো ঐতিহ্যের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য কমবেশি লক্ষণীয়। বাঙালির দর্শনে সমন্বয় ঘটেছে ধর্ম ও দর্শনের, ভাববাদের সঙ্গে বাস্তববাদের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির।

৯। বাঙালির দর্শন মানবতাবাদী:

প্রাক-ঐতিহাসিক ও প্রাচীন বাংলার লোকেরা ছিল জড়বাদী। এঁরা জড়বাদী মানবতাবাদের সমর্থক। তবে এঁদের এক অংশ ছিল অধ্যাত্মবাদী। অধ্যাত্মবাদী হিসেবে এঁরা ধর্মীয় মানবতাবাদের বীজ বপন করে। প্রাক-ঐতিহাসিককাল থেকেই বাংলায় দুই ধরনের মানবতাবাদী চিন্তা বিদ্যমান ছিল-সেকুলার (ইহজাগতিক) মানবতাবাদ এবং নব-সেকুলার (পারলৌকিক)

মানবতাবাদ। সেকুলার মানবতাবাদের উৎস হলো জড়বাদী বা লোকায়াত দর্শন। আর নন-সেকুলার মানবতাবাদের উৎস হলো বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ।

বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মীয় মানবতাবাদ বিকশিত হয়েছে। এছাড়া সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ ও বাউল দর্শনে মানবতাবাদী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ মানবতাবাদের সমর্থক ছিলেন। নব্য মানবতাবাদের প্রবর্তক এম.এন রায়, তিনি New Humanism ও Beyond Marxism নামক গ্রন্থ লেখেন।

১০। বাঙালির দর্শনে মার্কসবাদ:

১৯২০-এর দশকে বাংলায় মার্কসীয় চিন্তার আগমনে বাঙালির দর্শনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচিত হয়। এদেশে মার্কসবাদের প্রসারের পেছনে এন. এম. রায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে মার্কসবাদ প্রচারে কয়েকটি পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো : ভারত শ্রমজীবী, দি ভেনগার্ড, দি এভাল গার্ড, দি ম্যাসেস অব ইন্ডিয়া, দি ইন্ডিয়ান সোসালিস্ট, লাম্পল, গণবাণী, ফ্লেইম, মুক্তিযোদ্ধা ও একতা ইত্যাদি।

ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার বাধাগ্রস্ত হয়। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা আত্মগোপন করে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মার্কসবাদ প্রসার লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ মার্কসবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশে মার্কসবাদী দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে বদরুদ্দীন ওমর, রনেশ দাসগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত, সত্যেন সেন, অজয় রায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১। বাঙালির চিন্তায় উপযোগবাদ:

উনিশ শতকে ব্রিটিশ উপযোগবাদী জেমস্ মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিলের ভারত আগমনে এদেশে উপযোগবাদী চিন্তার প্রসার ঘটে। উপযোগবাদী চিন্তার দ্বারা যেসব চিন্তাবিদ প্রভাবিত ছিলেন তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ অন্যতম। ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্যরা উপযোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য কর্মেও উপযোগবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্যদেরও ওপর উপযোগবাদের প্রভাব ছিল।

১২। বাঙালির দর্শনে প্রত্যক্ষবাদী চিন্তার প্রভাব:

উনিশ শতকে বাঙালি চিন্তাবিদদের ওপর অগাস্ট কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব অপরিসীম। স্যামুয়েল লব, জেমস্ গেডেস, হেনরী কটনের মাধ্যমে এদেশে কোঁতের মতবাদের প্রবেশ ঘটে। কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা যারা প্রভাবিত হন তাঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। এঁরা কলকাতায় "পজিটিভিস্ট ক্লাব" গঠন করেন। কোঁতের প্রত্যক্ষবাদী চিন্তার দ্বারা উনিশ শতকের বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখার্জী, সতীশ চন্দ্র মুখার্জী অন্যতম। বঙ্কিম চন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রত্যক্ষবাদের ওপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন।

১৩। বাঙালির বুদ্ধির মুক্তি চিন্তা:

বাংলাদেশের মুক্তবুদ্ধির চিন্তায় সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে মুসলিম সাহিত্য সমাজ। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে মুসলিম সাহিত্য সমাজ গঠিত হয়। সাহিত্য সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ, কুসংস্কার ও অন্ধ আনুগত্য থেকে মুক্তি দান করা। এজন্য এ আন্দোলন "বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন" নামে পরিচিত। এঁরা ইউরোপীয় মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ ইত্যাদি চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্র ছিল শিখা নামক একটি পত্রিকা, এটি ১৯২৬ সালে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং এর স্লোগান ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

১৪। বাঙালির চিন্তায় বিশ্লেষণী দর্শনের প্রভাব :

সমকালে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের যে প্রভাব এদেশের দার্শনিকদের ওপর পড়েছে, তা হলো বিশ্লেষণী দর্শন। তাই একালে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা বিশ্লেষণধর্মী বিশুদ্ধ দর্শন চর্চার কথা বলেছেন।

১৫. বাস্তববাদী দর্শন:

বাঙালির দর্শনে শুধু ভাববাদ নয়, বাস্তববাদী চিন্তাও স্থান পেয়েছে। যাঁদের লেখায় বাস্তববাদের উপাদান পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে ড. মফিজউদ্দীন ও ড. আবদুল মতীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাস্তববাদী দার্শনিক ড. মতীন দর্শনচর্চায় বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতী। দেওয়ান আজরফের ভাষায়, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী প্রবণতাসম্পন্ন এ ব্যক্তিটি [ড. মতীন] চিন্তার প্রতিটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন।” বস্তুত ড. মতীনের প্রতিটি লেখাই যেন বিশ্লেষণ ধর্মী। তিনি নিছক তত্ত্বজ্ঞানের জন্য দর্শন চর্চা করেন নি। তিনি দর্শন চর্চা করেছেন দর্শনকে মানব কল্যাণের উপযোগী করার জন্য। দর্শনের প্রতি তাঁর এই মনোভাব বাস্তববাদী চিন্তার পরিচয় বহন করে।”

ক্রমবিকাশ:

প্রাচীনকালে বাংলায় ষড়্দর্শন চর্চা হতো। অনেক বাঙালি বেদান্ত, ন্যায় দর্শনের টাকা, ভাষা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন। বাঙালির দার্শনিক ঐতিহ্যে বেদ-বিরোধী চিন্তাধারার প্রভাবও কম নয়। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি চিন্তাধারা প্রাচীন বাংলায় লক্ষ করা যায়। চার্বাকরা বাঙালির দর্শনে জড়বাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন বাংলায় জৈন দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে খোদ বাঙালিদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই জৈন ধর্ম গ্রহণ করে। জৈন ধর্মের চেয়ে বৌদ্ধ ধর্মই বাংলায় বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ময়নামতি, চট্টগ্রাম, পাহাড়পুর, বিক্রমপুরসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। শীলতন্ত্র, অতীশ দীপঙ্কর, চন্দ্রগোমী প্রমুখ ছিলেন সে সময়ের নামকরা বৌদ্ধ দার্শনিক। সেন শাসন আমলে এবং মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পর বাংলার বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাস পায়।

ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর ইসলামী চিন্তাধারার সাথে বাঙালির চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটে। এর পূর্বে সুফীরা বাংলায় আসলেও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁদের প্রচার আরও বেগবান হয়। পারস্য, সমরখন্দ, বোখরা, উত্তর ভারত থেকে সুফীরা দলে দলে বাংলায় আগমন করেন। সুফী চিন্তাধারার সাথে বাঙালির দেশজ, তন্ত্র, যোগ, দেহ-সাধনার সমন্বয় ঘটে। দেশি চিন্তার প্রভাবে বাংলার সুফী চিন্তা এক নব্য রূপ লাভ করে। ড. এনামুল হক সাহের এই মতবাদকে “নব্য সুফীবাদ” বলে অভিহিত করেছেন।

বাউল ও বৈষ্ণব দর্শন বাংলার নিজস্ব দর্শন। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যাঁরা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত, শোষিত, নিষ্পেষিত ছিল তাঁরা তন্ত্র, সহজিয়া মতবাদ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কালক্রমে তাঁরা বাউল মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বাউলদের মধ্যে কোন জাতিভেদ নেই। হিন্দু মুসলমান উভয়ই বাউল মতের অন্তর্ভুক্ত। আর ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। তিনি প্রেম দর্শন প্রচার করেন। তাঁর মতবাদ “গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন” নামে পরিচিত। তিনি হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা ভেঙে দিলেন। তাঁর কাছে উঁচু-নীচু সবাই সমান। ব্রাহ্মণ, গুদ্র, চণ্ডাল, কায়স্থ, যবনে কোন ভেদাভেদ নেই। ঈশ্বর প্রেমে সবাই একাকার হয়ে গেল। চৈতন্য পরবর্তী দুইশত বছর ভেসে গেল প্রেমের বন্যায়।

উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তা-চেতনায় এক নব দিগন্তের সূচনা হয় যা রেনেসাঁ নামে পরিচিত। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার মুক্ত হয়ে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনার আহবান জানানেন রেনেসাঁর নায়করা। বাংলা রেনেসাঁ আন্দোলনের নায়ক রাজা রামমোহন রায় আহবান জানানেন অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামি মুক্ত মানবিক চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে। নবাব আবদুল লতিফ ও আমীর আলীও অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস পরিহার করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আপোস-মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

বাংলাদেশের দার্শনিকবৃন্দ:

গোবিন্দচন্দ্র দেব(জিসি দেব)

সমস্বয়ী ভাববাদ:সাম্প্রতিককালের দার্শনিক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের দর্শন সমস্বয়ধর্মী। এটি তাঁর দর্শনের একটি লক্ষণীয় দিক। তাত্ত্বিক দিক থেকে তিনি সমস্বয় ঘটিয়েছেন অভিজ্ঞতাবাদ, যুক্তিবাদ ও স্বজ্ঞাবাদের জড়বাদ ও ভাববাদের-সীম আত্মার অস্তিত্ব ও অসীম পরমাত্মার ধর্ম, কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শনের। তেমনি জীবন-দর্শনেও সমস্বয় ঘটিয়েছেন। সাধারণ মানুষের জৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মোক্ষানুসন্ধানের। তিনি এর নাম দিয়েছেন “মধ্যপথ” দর্শন গ্রন্থে তিনি বলেন একদিকে আধুনিকা উগ্র জড়বাদ আর অন্যদিকে অতি পুরানো অধ্যাত্মবাদ। ১. প্রথমটির আশ্রয় নিলে সবকিছু আধ্যাত্মিকতাকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার কামড়া-কামড়ি নিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর দ্বিতীয়টির আশ্রয় নিলে আধ্যাত্মিকতার নামে বহুলোক ইহলোকের সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই দুই পথের কোন পথেই মানুষের তৃষ্ণা মিটাতে পারে না। তাই যারা ভাবুক, তাঁরা বেছে নেন মধ্যপথ ও এই মধ্যপথেই পান জীবন-দর্শনের মধ্যমণি। সমস্বয়ই গোবিন্দচন্দ্র দেবের জীবনের লক্ষ্য। ড. দেব বলেন, সমস্বর পথের নির্দেশ দেয়। স্থায়ী কল্যান লাভ করতে হলে জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের যোগ সাধন করতে হবে। জ্ঞান আসবে বিজ্ঞান থেকে, আর প্রেমের প্রেরণা আসবে সমস্বয়ী ধর্মী এবং সংস্কার ও সংকীর্ণতা-মুক্ত বিশ্ব-দর্শন থেকে।

দেবের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট নয়টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আইডিয়ালিজম অ্যান্ড প্রগ্রেস (১৯৫২)(Idealism and Progress), আইডিয়ালিজম: এ নিউ ডিফেন্স অ্যান্ড এ নিউ এ্যাপলিকেশন (১৯৫৮)(Idealism: A new defense and new application), আমার জীবনদর্শন (১৩৬৭), এ্যাসপিরেশন অব দি কমন ম্যান (১৯৬৩)(Aspiration of the common man), দি ফিলোসফি অব বিবেকানন্দ অ্যান্ড দি ফিউচার অব ম্যান (১৯৬৩), তত্ত্ববিদ্যাসার (১৯৬৬), বুদ্ধ: দি হিউম্যানিস্ট (১৯৬৯)(Buddha: The humanist)। গ্রন্থগুলো তাঁর জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। দি প্যারাবুলস অব দি ইস্ট (১৯৮৪)(parables of the east) এবং মাই আমেরিকান এক্সপিরিয়েন্স (১৯৯৩)(My American experience) নামক গ্রন্থদুটি তাঁর মরণোত্তর প্রকাশনা।

দর্শনে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ১৯৬৭ সালে দেবকে সম্মানসূচক ‘দর্শন সাগর’ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর ‘একুশে পদক’ প্রদান করে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ভবনে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের গণকবরে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০-১৯৮৫)

বরিশাল জেলার লামচরি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের মজুবে মাত্র কয়েক মাস লেখাপড়া করার পর তিনি নিজের চেষ্টায় নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পৈতৃক পেশা কৃষিকাজ দিয়েই তাঁর কর্মজীবনের শুরু। কৃষিকাজের অবসরে জমি জরিপের কাজ করে তিনি আমিনি পেশার সূক্ষ্ম গাণিতিক ও জ্যামিতিক নিয়ম সম্পর্কে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন।

আরজ আলী মূলত বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। মানবজীবন, প্রকৃতি-পরিবেশ, জড়জগৎ ও বিশ্ব-সংসার থেকে পাঠ নিয়ে তিনি নিজস্ব মতবাদ গড়ে তোলেন। তিনি দৃঢ় মনোবল ও বিশ্বাস নিয়ে সকল অন্ধতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তাঁর বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার কথা তিনি একাধিক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি: সত্যের সন্ধান (১৯৭৩), সৃষ্টিরহস্য (১৯৭৭), অনুমান (১৯৮৩), মুক্তমন (১৯৮৮) ইত্যাদি। তাঁর বেশ কিছু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি আরজ আলী মাতুব্বরের রচনাবলি নামে প্রকাশিত হয়েছে।

আরজ আলীর রচনায় মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদী দার্শনিক প্রজ্ঞার ছাপ রয়েছে। মানবকল্যাণ ও বিশ্বধর্ম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রদান, পাঠাগার স্থাপন ও রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও তিনি নিজ দেহ ও চক্ষু মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ(১৯০৮-১৯৯৯): একজন শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, লেখক, জাতীয় অধ্যাপক। ১৯০৮ সালের ১ জানুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলায় তাঁর জন্ম।মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন দৃঢ় সমর্থক।তিনি ১৯৪৯ সালে তমদুন মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আজীবন ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

তিনি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সভাপতি ছিলেন।তিনি পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসেরও একজন সক্রিয় সদস্য এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তমদুনের বিকাশ, ইসলাম ও মানবতাবাদ, মরমী কবি হাসন রাজা, ধর্ম ও দর্শন ইত্যাদি।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ অবদানের জন্য মোহাম্মদ আজরফ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার,একুশে পদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর পুরস্কারে ভূষিত হন।

Philosophic Approach to Certain Problems of Practical Life:

আত্মহত্যা(Suicide)

আত্মহত্যা হচ্ছে আত্মবিনাশ, আত্মহনন ও আত্মবিলোপ। কোন ব্যক্তি যখন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তানুসারে স্বেচ্ছায় এবং স্ব-দায়িত্বে নিজেই নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে আত্মহনন ও আত্মবিলোপের পথ বেছে নেন তখন তাকে আত্মহত্যা বলে। অধিকাংশ সমাজই আত্মহত্যাকে বৈধ বলে অনুমোদন করেনি। এমনকি অনেক ধর্মও আত্মহত্যাকে অনুমোদন করে না। ইসলাম ধর্ম আত্মহত্যাকে মানব হত্যার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। খ্রিস্টান ধর্ম আত্মহত্যাকে হত্যার সমতুল্য অপরাধ বলে অভিহিত করেছে। ইহুদি ধর্মও আত্মহত্যাকে অপরাধ বলে মনে করে। ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন আত্মহত্যা স্বীকৃত নয় তেমনি মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ইহা অনুমোদন যোগ্য নয়।

আত্মহত্যা সম্পর্কে প্রাচীন যুগের ধর্মতাত্ত্বিক নীতিদার্শনিক সম্প্রদায়ের মত:

প্রাচীন গ্রীসের আইনে আত্মহত্যাকে অমানবিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ এটিকে সম্পূর্ণ মন্দ কাজ বলে প্রত্যাখান করতেন না। মহামতি প্লেটো সফ্রেটিস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, সফ্রেটিস মনে করতেন যে মানুষ দেবতার সম্পদ এবং তাই মানুষের আত্মহত্যা করা উচিত নয়। কারণ তাতে দেবতাগণ রুষ্ট হন এবং মানুষের ওপর অভিশাপ দেন। প্লেটো চরম দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতির উপায় হিসাবে আত্মহত্যাকে সমর্থন করেছেন। **এরিস্টটল** আত্মহত্যাকে সমর্থন করেননি। তিনি এটিকে কাপুরুষোচিত কাজ, রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী এবং অপরাধমূলক কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি নিকেমেকিয়ান এথিক্স গ্রন্থের নবম পুস্তকে আত্মহত্যার বিরোধিতা করেন। তিনি আত্মহত্যাকে অন্যায় বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ তাঁর মতে আত্মহত্যা নিজের দেহের ক্ষতিসাধন কল্পে করা হয়, কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্তের জন্য নয়। তাই এটি দেশে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধ কাজ। এর পরিণতি নিজের ওপর নয়, বরং রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়।

এপিকিউরাস মনে করতেন যে, যদি জীবনের সুখ ফুরিয়ে যায় তাহলে একজন মুক্ত ও স্বাধীন মানুষের পক্ষে এ নশ্বর জগত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ হলো জীবনের অবসান ঘটানো

স্টয়িক দার্শনিকগণ মনে করতেন যে মানুষ স্বাধীন এবং তাই প্রত্যেক মানুষই নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিজের জীবন অবসান ঘটানোর জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন। রোমান দার্শনিক সেনেকা, আত্মহত্যাকে সমর্থন করতেন। তার যুক্তি এই ছিলো যে, আত্মহত্যা একজন বৃদ্ধ মানুষকে দুঃখ-কষ্টভোগ ও বার্ধক্যের ক্ষয় থেকে নিষ্কৃতি দিতে সাহায্য করে।

মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ধর্মযাজক **সেন্ট অগাস্টিনের** মতে আত্মহত্যা অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ। যে নিজেকে পাপমুক্ত করার জন্য আত্মহত্যা করে সে নিকৃষ্ট পাপী। টমাস একুইনাসের মতেও আত্মহত্যা অন্যায় ও অনৈতিক কাজ।

ভলটেয়ারের মতে, কোন প্রকার প্রতিবাদ ব্যতীত স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া কাপুরুষোচিত ও অন্যায় কাজ নয়, বরং এটি প্রকৃতির ওপর বিজয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি এই যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু যদি অন্যায় না হয় তাহলে নিজের সন্তুষ্টি ও ভালোর জন্য এবং অশান্তি ও জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা অন্যায় হবে কোন যুক্তিতে? তাছাড়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে অতীতে যে সকল বীরগণ আত্মহত্যা করেছিলেন তারা কেউই কাপুরুষ ছিলেন না।

আত্মহত্যা সম্পর্কে আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মতবাদ:

ডেভিড হিউমের মতে, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং মানুষের জীবন একটি ঝিনুকের চেয়েও মূল্যহীন। তাই কোন মানুষ যদি স্বেচ্ছায় নিজের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চান এবং তার ফলে যদি সমাজের তেমন কোন ক্ষতি না হয় সেক্ষেত্রে এটি অন্যায় বলে বিবেচ্য নয়। তার জন্য এই পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করার পথ হয়তো চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে যদি কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা থেকেও থাকে, তা এতই নগণ্য যে তাতে সমাজের কিছু যায় আসে না। তাঁর মতে কোন ব্যক্তি যখন নিজেকে সমাজের বোঝা মনে করেন এবং সে নিজেকে সমাজ থেকে সরিয়ে নিতে চান তখন তা অন্যায় বলে গণ্য হবে না, বরং প্রশংসনীয় কাজ বলে মনে করা হবে।

আধুনিক যুগের প্রখ্যাত দার্শনিক **জন লক** আত্মহত্যা অনুমোদন না করে এটিকে অন্যায় কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে যদিও সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের সমান অধিকার ও সুযোগ রয়েছে, তবুও তার আত্মহত্যা করার স্বাধীনতা নেই। তিনি আত্মহত্যাকারীকে অপরাধী, মানব জাতীর জন্য বিপজ্জনক এবং সমগ্র অস্তিত্বশীল প্রাণীর সঙ্গে প্রতারণা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট সম্পত্তি। তাই তারা স্বাধীন হলেও তাঁর সম্পত্তি বিধায় স্বাধীন ইচ্ছায় তাদের এ সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়। আত্মহত্যা করা ঈশ্বরের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপের নামান্তরমাত্র।

জার্মান দার্শনিক **ইমানুয়েল কান্টের** মতে আত্মহত্যা অনৈতিক ও অন্যায়। তাঁর মতে নৈতিকতার ভিত্তি প্রজ্ঞা ও স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল। একমাত্র প্রজ্ঞাবান মানুষই স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকারী। তাই কোন মানুষের নিজের জীবন সংহারের কোনরূপ অধিকার থাকতে পারে না।

দুঃখবাদী দার্শনিক **শোপেনহাওয়ার** আত্মহত্যা কে ভ্রান্তির বেড়া জাল বলে গণ্য করেছেন। কেননা এটি মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে প্রকৃত মুক্তি না দিয়ে কেবল একটা আপাত মুক্তি দিয়ে থাকে। তার মতে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষয়-বৃদ্ধি বা জন্ম-মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু সার্বিক ইচ্ছাশক্তির কোন মৃত্যু বা বিনাশ নেই, এ অবিনাশী। আর যে ইচ্ছাশক্তি স্বতন্ত্র ও বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকাশ করে তার কেবল বিনাশ ঘটতে পারে। তাই আত্মহত্যার অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তির একটা বিশেষ প্রকাশ বা অভিব্যক্তির বিনাশ, সার্বিক ইচ্ছাশক্তির বিনাশ নয়। আবার একই সময় তিনি আত্মহত্যা যে পাপ ও অপরাধ- এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে আত্মহত্যাকে অপরাধ মনে করা অযৌক্তিক। কেননা এ বিশ্বজগতে এমন কোন কিছুই নেই যার ওপর কারোর নিজের জীবন ও দেহের চেয়ে বেশি অধিকার আছে।

আত্মহত্যা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ:

সিগমন্ড ফ্রয়েড আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে শুধু মাত্র সামাজিক জটিলতা বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আত্মহত্যা সংঘটিত হয় না, বরং মানুষের মানসিক আচরণ এর জন্য দায়ী। জীবনকাল প্রলম্বিত হোক এটা চাওয়া মানুষের সহজাত ধর্ম। তারপরও সে কেন মরতে চায়? ফ্রয়েডের মতে মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে একটি হলো তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার বাসনা। আত্মহত্যাকারী স্বেচ্ছায় নিজের জীবনের বিনাশ ঘটায়। সে আত্মহত্যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হত্যার প্রতীকী ভূমিকা পালন করে। আত্মহত্যাকারী নিজের জীবনের বিনাশের মাধ্যমে অন্যের প্রতিনিধিত্বকে নষ্ট করতে চায়। ফ্রয়েড এ কথা দ্বারা এই বুঝাতে চাচ্ছেন যে আত্মহত্যার প্রবণতা প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী নয়। তিনি আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিশুর শৈশবের মানসিক বিকাশের পথের বাঁধা ও অত্যধিক চাপকে দায়ী করেছেন।

আরো পরে ফ্রয়েড এ মতবাদটির দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেষ্টা করেন। সে প্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন যে উপরোক্ত সহজাত প্রবৃত্তিটি ছাড়াও আমাদের আরো দুটি প্রেমাণ রয়েছে। একটিকে বলে ইরোজ-এটি হচ্ছে বাঁচার প্রবৃত্তি। অন্যটি হচ্ছে থানাটোস- এটি হচ্ছে মৃত্যুর প্রবৃত্তি। এ দুটি প্রবৃত্তিই আমাদের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান এবং একে অপরকে আকৃষ্ট করে। মৃত্যুর প্রবৃত্তিটি যখন বাঁচার প্রবৃত্তিটির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন মানুষ আত্মহত্যা করতে চায়।

এমিলি ডুরখেইমের তত্ত্বটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৯৭ সনে ল্য সুইসাইড (La Suicide) গ্রন্থে আত্মহত্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে আত্মহত্যার পেছনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ বা নৈতিক কর্তব্যবোধ প্রধান কারণ নয়, বরং সামাজিক অবকাঠামো ও ঐতিহ্যই প্রধান কারণ। তিনি মনে করেন যে সমাজের প্রতিটি মানুষ কম-বেশি প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণ ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এরা উভয়ই পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অতিমাত্রার সম্পৃক্ততা ও উদাসীনতা উভয়ই মানুষকে আত্মহত্যা করতে উৎসাহী করে তোলে। সমাজের ওপর অধিক সম্পৃক্ততা ও নির্ভরশীলতা দুর্বলচিত্ত মানুষকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। প্রতিটি মানুষের কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। তারা প্রতিটি কাজকর্ম স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে ক্ষোভ, দুঃখ, অনুশোচনা ও হতাশায় সমাজের ওপর থেকে আস্থা হারায় ও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এমিলি ডুরখেইম সমাজের অবকাঠামো ও কার্যাবলির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে চার প্রকার আত্মহত্যার বর্ণনা দিয়েছেন—আত্মগত আত্মহত্যা, পরার্থমূলক আত্মহত্যা, অ্যানোমিক আত্মহত্যা এবং গোঁড়া আত্মহত্যা।

গর্ভপাত (Abortion)

An abortion is a medical procedure to end a pregnancy. It uses medicine or surgery to remove the embryo or fetus and placenta from the uterus. It's the expulsion of a fetus from the uterus before it has reached the stage of viability (in human beings, usually about the 20th week of gestation). An abortion may occur spontaneously, in which case it is also called a miscarriage, or it may be brought on purposefully, in which case it is often called an induced abortion.

There are **24 countries** in the world where abortion is completely prohibited. These include Andorra and Malta in Europe, El Salvador and Honduras in Central America, Senegal and Egypt in Africa, and the Philippines and Laos in Asia.

More than 50 countries and regions permit abortions only when the woman's health is at risk. গর্ভপাত হচ্ছে এক প্রকার জীব হত্যা। মানব জ্ঞকে হত্যা করাকেই গর্ভপাত বলা হয়। কোন মহিলা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও গর্ভধারণ করেন এবং পরবর্তীতে তা নষ্ট করে ফেলেন তাহলে তাকে গর্ভপাত বলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ২৮ সপ্তাহের মধ্যে জ্ঞের বিনাশ ঘটানো হলে তাকে গর্ভপাত বলা হয়। ১৯৬৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র সুইডেন ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিলো। ১৯৭০ সালে আমেরিকান স্টেট ল গর্ভপাতের পক্ষে আইন পাস করে। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র গর্ভপাতের পক্ষে রায় দিলে ফেডারেল জাস্টিস কমিশন কর্তৃক আইন হিসাবে গৃহীত হয়।

গর্ভপাত সম্পর্কিত বিতর্ক:

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের 'অনুসারীগণ গর্ভপাতের বিরোধিতা করে গর্ভপাতকে একটি অনৈতিক কাজ বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে গর্ভপাত জ্ঞহত্যার সমতুল্য এবং তাই গর্ভপাত পাপ ও অন্যায় কাজ। রক্ষণশীলরা বিশ্বাস করেন যে, জ্ঞ ও মানব শিশুর মধ্যে আমরা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা দেখতে পাই না যার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে এটা জ্ঞ বা এটা মানব সত্তা। জ্ঞ ও মানব সত্তার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন জীবন প্রক্রিয়া বিদ্যমান যা কোন সীমারেখার দ্বারা চিহ্নিত ও নির্ধারণ করা যায় না। তাই তাঁদের মতে গর্ভপাত যেহেতু জ্ঞ হত্যার নামান্তর সে কারণে গর্ভপাত পাপ ও অন্যায়। উদারপন্থীরা মানব জ্ঞকে মানবসত্তা বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তাই গর্ভপাতকে তাঁরা অন্যায় মনে করেন না। কোন সীমারেখা পর্যন্ত গর্ভপাত বৈধ সে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে জন্মের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, কারো মতে মাতৃগর্ভে জ্ঞের গতি সঞ্চালন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এবং অন্য কারো মতে গর্ভধারণের বাইরে জীবনধারণ সক্ষম হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত গর্ভপাত বৈধ। উদারপন্থীদের মতে জন্ম হচ্ছে একটা দৃশ্যমান সীমারেখা। কারণ

জন্মের পরই একটা শিশুকে দেখতে পাওয়া যায়। এর আগে জ্রণের গঠন আমরা দেখতে পাই না বা তার মৃত্যুতেও বিচলিত হই না।

গর্ভপাতের বিপক্ষের যুক্তিগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

এক. গর্ভপাত নরহত্যা : নরহত্যা হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নির্দোষ ব্যক্তির জীবনাবসন ঘটানো। মানব জ্রণ মাতৃগর্ভে সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই মানবসত্তা। যেহেতু নিরপরাধ মানুষ হত্যা অন্যায়, মানব জ্রণ জন্ম মুহূর্ত থেকে মানবসত্তা বিধায় জ্রণহত্যাও অন্যায়।

দুই. গর্ভপাত মন্দ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। মৃত্যু ঘটানোর যে কোন উদ্যোগ যদি মৃত্যু প্রক্রিয়ার সহায়তা করে তাহলে তা অবশ্যই অন্যায়। গর্ভপাতের ফলে জ্রণের মৃত্যু ঘটে। গর্ভপাতের বৈধতার সুযোগ নিয়ে হিটলার অগ্নি চেম্বারে অসংখ্য মানুষের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। যে কোন কারণে হোক একবার গর্ভপাত বৈধতার সার্টিফিকেট পেলে এই বৈধতার দোহাই দিয়ে গণহত্যাযজ্ঞ বা গণভাবে গর্ভপাত সংঘটিত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই গর্ভপাত অন্যায়।

তিন. গর্ভপাত নারীদের মানসিক ঝুঁকি ও অশান্তি বাড়িয়ে দেয় : রূপ গর্ভধারে জন্ম নেয়ার পরে মা ও জ্রণের মধ্যে একটি জৈবিক সম্পর্ক ও আধ্যাত্মিক মায়ামমতার বন্ধন সৃষ্টি হয়। জৈবিক সম্পর্কের কথা ছেড়ে দিলেও মার সঙ্গে জ্রণের আবেগগত ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক উপেক্ষা করা যায় না। এর পরে গর্ভপাত করা হলে মার শরীর ও মনের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে এবং নানা মানসিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে, যা সহ্য করা মার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। গর্ভপাতের ফলে শুধু জ্রণের মৃত্যু ঘটায় না, মা'রও মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যু ঘটায়।

চার. গর্ভপাতের বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে অনাকাজ্জিত গর্ভধারণ বা শিশু জন্মদানে যারা অনাগ্রহী তাদের উচিত শিশু জন্মের পর নিঃসন্তান দম্পতিকে দত্তক দেয়। অথবা অনাথ আশ্রম বা কোন সেবা প্রতিষ্ঠানে রেখে আসা উচিত। এখন যত্রতত্র এরূপ প্রতিষ্ঠান দেখা যায়।

গর্ভপাতের পক্ষের যুক্তিগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

এক. গর্ভধারণ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। গর্ভধারণকালীন সময় নারীকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। এমনকি গর্ভধারণের জন্য তাঁকে সারা জীবন স্বাস্থ্যগত জটিলতায় ভুগতে হয়। এসব ঝুঁকি মাথায় নিয়েই গর্ভধারণ করে এবং সন্তান জন্ম দেয়। কাজেই গর্ভধারণী মা নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে পূর্ণ মেয়াদের জন্য গর্ভধারণ করবে না গর্ভপাত করাবে।

দুই. জ্রণ অনাকাজ্জিত বা প্রতিবন্ধী হতে পারে; বর্তমান সমাজ জনসংখ্যাধিক্য, পরিবেশ দোষণ, দারিদ্র্যজনিত সমস্যায় জর্জরিত। এগুলো অপরাধ, রোগ-শোক, ক্ষুধা- দারিদ্র্য বাড়ছে। উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর সকল শিশু যাতে সবল ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় সেদিকে যত্নবান হওয়া উচিত। কোন মহিলা যদি এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ও অনাকাজ্জিত শিশুর লালন-পালনে আগ্রহী না হন তাহলে তার সৃষ্ট সমস্যার ভার অন্যের ওপর চাপানো ঠিক নয়।

তিন. অনাকাজ্জিত গর্ভধারণে বাধ্য নন। কোন সময় ধর্ষণজনিত কারণে গর্ভধারণ করতে হয়। ধর্ষণ জঘন্য অপরাধ। অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণের দায়-দায়িত্ব মহিলার ওপর বর্তানো অন্যায়। এটি আরো পাশবিক আচরণ ও নারীর ওপর মানসিক নির্যাতন। নারীর স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায়।

চার. নারীর স্বাধীন অধিকার খর্ব করা অনুচিত। নারীর নিজের শরীর ও মনের ওপর অধিকার রয়েছে। পূর্ণ মেয়াদের জন্য গর্ভের বোঝা নারীকেই বহিতে হয়। এজন্য তাদেরকে অবর্ণনীয় শারীরিক ঝুঁকি ও মানসিক কষ্টের বোঝা সহ্য করতে হয়। কাজেই পূর্ণ মেয়াদের জন্য গর্ভধারণ করবে কি করবে না সে ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবিদার নারীই। উপরন্তু ভ্রূনরূপ শিশু নারীরই দেহের অংশবিশেষ। তাই তারই অধিকার থাকা উচিত পূর্ণ মেয়াদের জন্য গর্ভধারণ করবে নাকি মেয়াদ পূর্তির পূর্বে গর্ভপাত ঘটাবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গর্ভপাত কি বৈধ?

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, শুধুমাত্র মায়ের জীবন রক্ষায় গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া যায়। এ ছাড়া যেকোনো ধরনের গর্ভপাতের ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে।

দণ্ডবিধি আইনে গর্ভপাত সংক্রান্ত পাঁচটি ধারা:

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৩১২ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত করায় এবং যদি সে গর্ভপাত সরল বিশ্বাসে উক্ত স্ত্রীলোকের জীবন বাঁচাবার উদ্দেশ্যে না করা হয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে; এবং যদি স্ত্রীলোকটি শিশুর বিচরণ অনুভব করে, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩১৩ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত অপরাধটি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের সম্মতি ছাড়া সম্পাদন করে, স্ত্রীলোকটি আসন্ন প্রসবা হোক বা না হোক, তবে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা ১০ বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩১৪ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত করানোর উদ্দেশ্যে কৃত কোনো কাজের ফলে সে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু ঘটায়, তবে সে ব্যক্তি ১০ বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৩১৫ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শিশুর জন্মের পূর্বে এমন কোনো কাজ করে, যাতে শিশুটি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হতে না পারে বা জন্মের পরে তার মৃত্যু হয় এবং অনুরূপ কাজের ফলে শিশুটি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ট না হয় বা ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার মৃত্যু হয় এবং যদি কাজটি মাতার জীবন রক্ষার জন্য সরল বিশ্বাসে কৃত না হয়, তবে সে ব্যক্তি ১০ বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

৩১৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কার্য করে, যার দ্বারা সে কোনো মৃত্যু ঘটালে অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতো এবং অনুরূপ কার্যের সাহায্যে একটি জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটায়, তবে উক্ত ব্যক্তি যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ ১০ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

আমাদের দেশে ধর্ষণের ফলে কোন নারী গর্ভবতী হলে সমাজ তাকে ভাল চোখে দেখে না। এমতাবস্থায় গর্ভপাত করার অনুমতি না পেলে সে একটি পিতৃহীন সন্তান জন্ম দিবে এবং তাকে সমাজের নানা বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে। সমাজের সবাই মা ও সন্তানকে বাঁকা চোখে দেখবে। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতির জন্য তারা কেউই মোটেও দায়ী নয়। এ ছাড়া রোগাক্রান্ত ও পুষ্টিহীন দুর্বল মায়াদের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার্থে গর্ভপাত নৈতিকভাবে সমর্থিত হওয়া উচিত। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা রোধকল্পে, সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে, একজন ধর্মিতা নারীর জীবন ও মানসম্মান বাঁচানোর জন্য, দারিদ্র বিমোচনের জন্য, মায়াদেরকে রক্তশূন্যতা ও পুষ্টিহীনতার হাত থেকে বাচানোর জন্য গর্ভপাত নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। তবে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন গর্ভপাতের সুযোগ নিয়ে সমাজে অবাধ যৌনাচারে উৎসাহিত করা না হয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা (Environmental Ethics)

নীতিবিদ্যা হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির মূল্যায়ন ও সুবিচার আলোচনা। সাম্প্রতিককালে পরিবেশের আচরণের মূল্যায়নও নীতিবিদ্যার কাজ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

মোট দাগে নীতিবিদ্যাকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. মানব-কেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা (Anthropocentric ethics)
২. অমানব-কেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা (Non- anthropocentric ethics)

এই অমানব-কেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ নীতিবিদ্যা। পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো মূলত প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি নতুন সংযোজন। আমাদের চারপাশে বিরাজমান অসংখ্য উচ্চ ও নিম্ন প্রজাতির প্রাণী, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বায়ুমন্ডল, ইকোসিস্টেম এসব নিয়েই পরিবেশ গঠিত। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার মূল্য, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবেশ দূষণের কারণ ও প্রতিকারের উপায় মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করা হয়। পরিবেশ নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব, এমনকি বর্তমান সমাজে পরিবেশে বিরাজমান জীবজন্তুর কতটুকু স্বাধীনতা ভোগের অধিকার আছে নাকি আদৌ কোন অধিকার নেই—এ সকল নিয়ে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনা কেন্দ্রীভূত। মোট কথা পরিবেশ নীতিবিদ্যা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতে বিরাজমান মূল্যের একটি সুবিন্যস্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। প্রাণী, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বায়ুমন্ডল, ইকোসিস্টেম প্রভৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুসন্ধানই পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল কাজ। পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো পরিবেশ ও নৈতিকতার একটি মিশ্র ও সমন্বিত পর্যালোচনা ও সবিচার বিশ্লেষণ।

লিওপল্ড ১৯৪৯ সনে তাঁর "দ্য ল্যান্ড এথিক্স" "শীর্ষক প্রবন্ধে ভূমি নীতিবিদ্যা কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তাঁকে ভূমি নীতিবিদ্যার জনকও বলা হয়। তিনি ভূমি নীতিবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে নীতিবিদ্যার বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রথমে নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। পরবর্তীতে ব্যক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক নৈতিক আলোচনা ভূমি নীতিবিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে মানব সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে পরিবেশ-চিন্তা নানাভাবে মানব আচরণের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তাঁর ভূমি নীতিবিদ্যার প্রধান উপাদানসমূহ হলো—ভূমি, পানি, উদ্ভিদ এবং জীবজন্তু।

Dealings with Lower Animals:

মানবের প্রাণীকুল তথা নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী স্বাধীনভাবে চিন্তা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেনা। তাই তাদের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন মানুষের কর্তব্য।

Peter singer এর মতে,

If a being suffers, there can be no moral justification for refusing to take that suffering into consideration. No matter what the nature of the being, the principle requires that its suffering can be counted equally.....

এ প্রসঙ্গে তিনি তার "Animal Liberation" (1975) গ্রন্থ রচনা করেন।

টম রেগান তার The case for animal right (1985) গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, পশুরও অধিকার আছে, তাই তারা সমবিবেচনা পাওয়ার যোগ্য।

জীবজন্তুর অধিকার সম্পর্কিত কয়েকটি মতবাদ:

জীবজন্তু ও পশুর অধিকার সম্পর্কে অনেকগুলো মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত মতবাদগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো প্রাণীদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে।

১. মর্যাদাহীনতত্ত্ব : প্রাণীর প্রতি মানুষের আচরণ সম্পর্কিত এ তত্ত্বটি প্রাণীর কোন মর্যাদা বা মূল্য আছে বলে স্বীকার করে না। ফরাসি দার্শনিক **রেনে ডেকার্ট** এ মতের একজন অন্যতম সমর্থক। তাঁর মতে প্রাণীর কোন প্রকার নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না। কারণ প্রাণীর কোন আত্মা নেই। একটি পাথর ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলা আর একটি পুতুলের হাত ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে কোন প্রকার মৌলিক পার্থক্য নেই। দুটোই সমান আনন্দের কাজ। দার্শনিক **হুইলের** মতে প্রাণীর সুখ-দুঃখের অনুভূতি ভিন্ন প্রকৃতির। প্রাণিবিজ্ঞানী **জেকসের** মতে প্রাণী হলো শুধুমাত্র মানুষের জন্য একটি খাদ্যসামগ্রী মাত্র। এ সকল মতবাদ থেকে এটা বোঝা যায় যে, প্রাণীর কোন অধিকার স্বীকার করা হয় না। তাই এদের সমবিবেচনার অধিকার ও মুক্তির দাবি করারও কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

২. পরোক্ষ দায়িত্বতত্ত্ব : এ তত্ত্বানুসারে প্রাণীর সরাসরি কোন প্রকার বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকার করা না হলেও এদের বেঁচে থাকার পরোক্ষ অধিকার আছে বলে স্বীকার করা হয়। এ মতের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে আমাদের প্রাণীদের প্রতি

কোন প্রকার নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণ করা উচিত নয় এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কারণ এদের সুখ-দুঃখ অনুভব করার ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া এদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের পরিণতি আমাদেরকেই ভোগ করতে হতে পারে। এক সময় তা অন্যান্য মানুষের ওপর আরোপ করা হবে না সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাই আমাদের সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করা কর্তব্য। আর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করার ফলে প্রকারান্তরে ও পরোক্ষভাবে আমরা মানুষের প্রতিও সহানুভূতিশীল হতে শিখবো।

৩. সমান মর্যাদাতত্ত্ব : এ মতানুসারে মানুষ ও প্রাণীর জীবনের মূল্য ও অধিকার সমান। মানুষ ও প্রাণী উভয়ই সমানভাবে পরিবেশে বিচরণ করছে। তাই এরাও মানুষের সমান অধিকারের সাথে জীবনযাপন করার অধিকার দাবি করার ক্ষমতা রাখে। উভয়ের অধিকারই সমান গুরুত্বপূর্ণ। টম রেগান এ মতের অন্যতম প্রবক্তা। **টম রেগান** প্রাণীকুলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটি নীতি অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন।

ক. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রাণীর বংশবৃদ্ধি অবৈধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খ. ব্যবসায়িক লক্ষ্যে প্রাণী হত্যা, শিকার ও লালনপালন অন্যায়া।

গ. ওষুধ ও রোগ পরীক্ষা বা অন্য কোন কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রাণীর ব্যবহার করা অনুচিত।

টম রেগান প্রাণীর জীবনধারণ ও এদের জীবন প্রণালী পরিচালনার অধিকারকে মানুষের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এ দাবির পক্ষে তিনি যে যুক্তিটি উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপ :

ক. সকল মানুষের জীবনধারণের নৈতিক অধিকার আছে;

খ. প্রাণীর জীবনধারণের নৈতিক অধিকার আছে;

গ. মানুষ তার নৈতিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে;

ঘ. যেহেতু প্রাণীরও জীবন আছে, সুতরাং তারও জীবনধারণের নৈতিক অধিকার আছে।

৪. সমবিবেচনাতত্ত্ব : প্রাণীর অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্বার্থের সমান বিবেচনার নীতি অনুসরণের কথা সর্বপ্রথম বলেন **পিটার সিঙ্গার** তাঁর Animal Liberation এবং Practical Ethics সহ অনেক গ্রন্থে এবং বহু প্রবন্ধে। প্রাণী ও মানুষের মর্যাদা সমান নয়। তবে প্রাণীর অধিকার সংরক্ষণের সময় সমান বিবেচনা প্রাপ্য। আমাদের সকলের উচিত আমাদের নিজেদের জীবনের মতো প্রাণীর জীবনকেও মূল্যবান মনে করা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে অপ্রয়োজনে ও অকারণে প্রাণীদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া না হয়, হত্যা বা নিধন করা না হয়। জেরেমী বেনথামও এ মতের প্রধান প্রবক্তাদের অন্যতম। পিটার সিঙ্গার যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পশুর বাঁচার অধিকার আছে বলে দাবি করেন সেগুলো হলো:

* পশুদের মানুষের মতো বুদ্ধি আছে। যেমন, বানর, তিমি, ডলফিন, শিম্পাঞ্জি এরা মানুষের মতো সুখ, দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করতে পারে।

*পশুরা আত্মসচেতন।

*পশুরা মানুষের মতো দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে ভালবাসে।

* পশুদের অভিপ্রায় ও স্মৃতিশক্তি আছে। তিন/চার বছরের শিশুর চেয়েও এদের মুতিশক্তি অনেক প্রখর।

*পশুদের মানুষের মতো অনুভব করার ক্ষমতা আছে।

৫. পশুর অধিকারতত্ত্ব সম্পর্কে কলিকোটের ত্রিমুখী ব্যাখ্যা : বায়ার্ড কলিকোটের মতে, পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও পশুর অধিকারতত্ত্ব ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ এদের উভয়েরই নৈতিক প্রেক্ষাপট আলাদা। তিনি পশুর অধিকার সম্পর্কিত বিতর্কটি ত্রিমাত্রিক ব্যাখ্যার সাহায্যে সমাধান করার চেষ্টা করেন।

সন্ত্রাসবাদ(Terrorism)

সন্ত্রাসবাদ হলো কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের একটি সাধারণ পরিবেশ তৈরি করার জন্য এবং এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহিংসতার পরিকল্পিত ব্যবহার। ডানপন্থী এবং বামপন্থী উভয় উদ্দেশ্য সম্পন্ন রাজনৈতিক

সংগঠন, জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী, বিপ্লবী এবং এমনকি সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা পরিষেবা এবং পুলিশের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা সন্ত্রাসবাদ অনুশীলন করা হয়েছে।

তাই সন্ত্রাসবাদ হল ভয় তৈরি করার জন্য সহিংসতার পরিকল্পিত ব্যবহার, এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা, যখন সরাসরি সামরিক বিজয় সম্ভব হয় না। এর ফলে কিছু সমাজ বিজ্ঞানী গেরিলা যুদ্ধকে "দুর্বলদের অস্ত্র" এবং সন্ত্রাসবাদকে "দুর্বলদের অস্ত্র" হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের অবস্থান :

সন্ত্রাসবাদ সূচকের (২০২৫) সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের প্রভাব 'নিম্ন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের ১২তম সংস্করণে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের প্রভাব ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়ার গড় পরিস্থিতির তুলনায় কম ছিল। প্রতিবেদনে ২০১২ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের মূল প্রবণতা ও ধরনগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়।

২০২৫ সালের গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই) সূচকে বাংলাদেশ ৩.০৩ স্কোর পেয়েছে। শূন্য স্কোর মানে কোনো প্রভাব নেই, আর ১০ স্কোর বোঝায় সর্বোচ্চ প্রভাব। এই স্কোরের ভিত্তিতে ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৩৫তম স্থানে রয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় উন্নতি বোঝায়। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ছিল ৩২তম স্থানে।

জিটিআই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের প্রবণতা বিশ্লেষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক। স্কোর নির্ধারণে হামলার সংখ্যা, প্রাণহানি, আহতের সংখ্যা ও জিম্মিদের পরিস্থিতির মতো নানা উপাদান বিবেচনা করা হয়। পাশাপাশি সংঘাত ও আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে সন্ত্রাসবাদের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়।

২০২৪ সালেও বুরকিনা ফাসো সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশ হিসেবে রয়ে গেছে। এর পরেই রয়েছে পাকিস্তান ও সিরিয়া।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ জিটিআই স্কোরের তালিকায় শীর্ষ দশে দক্ষিণ এশিয়ার দুটি দেশ রয়েছে — আফগানিস্তান ও পাকিস্তান।

এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশ পাকিস্তান, যার স্কোর ৮.৩৭৪। এটি ২০২৫ সালের জিটিআই সূচকে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। আফগানিস্তান ৭.২৬২ স্কোর নিয়ে নবম স্থানে, আর ভারত ৬.৪১১ স্কোর নিয়ে ১৪তম স্থানে রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি মূল্যায়নকৃত দেশের মধ্যে একমাত্র ভুটান ও শ্রীলঙ্কার জিটিআই স্কোর শূন্য, অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে সেখানে কোনো সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। এ অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে কম প্রভাবিত দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে নেপাল, ৬৮ তম।

Hoarding (মজুদদারি)

মজুদদারি হলো মুনাফার লোভে বা বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য জমিয়ে রাখা, যা সমাজে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এবং এর ফলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে। এই প্রথা মানুষের প্রতি শোষণ এবং খাদ্যদ্রব্যের সুষম বণ্টন নষ্ট করে যা মানবিক নীতি ও কল্যাণকামিতা'র পরিপন্থী, এটি অনৈতিক।

Topics 09:-

Moral Standard(Evolution of moral standard, The nature of moral standard), Theories of moral standard: Hedonism, Perfectionism and Law(Categorical Imperative).

Right and Duty: Mutual involvement of right and duty. Duties towards one's fellow-human beings.

Moral Pathology: Wrong-doing and punishment. Main theories of punishment: The Retributive Theory, the Deterrent Theory and the Reformatory Theory.

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- নৈতিক বিবর্তনের ক্রমবিকাশের ধারাসমূহ
- সুখবাদের বিভিন্ন প্রকারভেদ, বিশেষত মিল ও বেঙ্হামের সুখবাদ
- পূর্ণতাবাদ, হেগেলের মত; কান্টের শর্তহীন আদেশ
- শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদগুলোর আলোচনা

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ

Nature of moral standard

নীতিশাস্ত্র মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। নীতিশাস্ত্রে মানুষের আচরণ বলতে তার অভ্যাসজাত ও ঐচ্ছিক ক্রিয়াকেই বুঝিয়ে থাকে। মানুষের যে ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত ও অভ্যাসজাত নয়, তার দোষ-গুণ বিচারের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই মানুষের যে কাজ ঐচ্ছিক ও অভ্যাসজাত নয়, তা নীতিশাস্ত্রের আলোচনা বহির্ভূত।

ব্যুৎপত্তির দিক দিয়েও নীতিশাস্ত্র মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। ইংরেজি 'এথিক্স' (ethics) শব্দটি গ্রিক শব্দ 'এথিকা' (ethica) থেকে উদ্ভূত, যা 'এথোস' (ethos) শব্দ থেকে এসেছে। এই 'এথোস' শব্দটির তাৎপর্য হলো আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও অভ্যাস। আবার ইংরেজি ভাষায় নীতিশাস্ত্রের এক নাম 'নীতিদর্শন' (moral Philosophy)। এই 'মরাল' শব্দটি লাতিন 'মোরস' (mores) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই শব্দটির অর্থও আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও অভ্যাস। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নীতিশাস্ত্রের (ethics) ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও অভ্যাস যে তার আচরণকে নির্দেশ করছে তা বলাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ ম্যাকেনজি প্রদত্ত নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা প্রণিধানযোগ্য। নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা আলোচনাকালে তিনি বলেছেন, "আচরণের ভালো বা ঠিকত্বের আলোচনাই নীতিশাস্ত্র। এই শাস্ত্র আচরণের সাধারণ নিয়ম এবং এটা ঠিকতা বা অনৈতিকতা, ভালো বা মন্দ প্রবণতার প্রেক্ষিতে মানুষের ক্রিয়াবলির বিচার করে।"

"Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct. It is the general theory of conduct and considers the actions of human being with reference to their rightness or wrongness, their tendency to good or to evil," - (Mackenzie, A Manual of Ethics)

Evolution of moral standard

সহজাত প্রবৃত্তির স্তর(The Level of Instinct)

সহজাত প্রবৃত্তির স্তরে ব্যক্তির কাছে ন্যায় বলে পরিগণিত আচরণ ব্যক্তির মৌলিক অভাব এবং সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে নিরূপিত হয়। সব থেকে আদিম অবস্থায় মানুষ সম্পর্কে দু'ধরনের বিরুদ্ধবাদক বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনা ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) ও দ্বিতীয় বর্ণনা ইংরেজ দার্শনিক হবস্-এর (১৫৮৮-১৬৭৯) লেখায় পাওয়া যায়।

রুশোর মতে, মানুষ স্বভাবতঃই স্বাধীন ও ভাল এবং প্রথা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আরোপিত কৃত্রিম বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত মানুষের আদিম জীবন শান্তি, ঐক্য, সদিচ্ছা ও প্রশান্তির জীবন। পক্ষান্তরে, **হবসের মতে**, স্বাভাবিক মানুষ কেবল যা তাকে সন্তুষ্ট করতে বা সুখ দিতে পারে ও যা তার কাছে আনন্দদায়ক, তা চায়। স্বভাবত প্রত্যেকটি মানুষ মনে করে যে, সব জিনিসের উপর তার অধিকার রয়েছে এবং যেহেতু সব জিনিসই অর্জিত ও হিংস্র, সেহেতু এগুলো একে অপরের সঙ্গে সংগ্রাম বা সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে বাধ্য।

প্রথার স্তর(The level of Custom)

প্রথার স্তরে মানুষের আচরণের ঐসব রূপকে ন্যায় বলা হয়, যেগুলো সে যে সমাজে বসবাস করে, সে সমাজের গোত্র বা দলগত ব্যবহারের আদর্শ বা প্রথাগত রূপের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে থাকে। প্রথার স্তরে ভাল ক্রিয়া তাই, যা সম্পাদিত হয় এবং মন্দ ক্রিয়া তাই যা সম্পাদিত হয় না।

বিবেকের স্তর(The Level of Conscience)

প্রথার স্তরে নৈতিক জীবনের কর্তৃত্ব বা প্রাধিকার (authority) ব্যক্তির বাইরের ব্যাপার এবং এই স্তরে তার দল বা গোত্রের দ্বারা যা অনুমোদিত, তা ব্যক্তিকে অবশ্যই করতে হয়। কিন্তু বিবেকের স্তরে নৈতিক জীবনের কর্তৃত্ব ব্যক্তির ভিতরের ব্যাপার এবং এ একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি, যা ব্যক্তিকে সঠিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে চালিত করে। এই স্তরে সেই আচরণকে ন্যায় বলা হয়, যা ব্যক্তির নিজস্ব বিচারের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে থাকে। এটিই প্রথার স্তর থেকে বিবেকের স্তরে নৈতিকতার বিকাশ।

গ্রিক নীতিবিদ্যা(Greek Ethics)

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ যুগের বিস্তার

সোফিস্টদের মত ঃ প্রাচীন গ্রিসে যদিও সোফিস্টদের এবং সক্রেটিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৬৯- ৩৯৯), প্লেটো (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) ও অ্যারিস্টটল-এর (খ্রিঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) আলোচনাতে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়, তথাপি নীতিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রিক দার্শনিক হিরাক্লিটাস (খ্রিঃ পূঃ ৫৩৫-৪৭৫) ও ডেমোক্রিটাস-এর (খ্রিঃ পূঃ আনুমানিক ৪৬০- ৩৭০) অবদানকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। “তোমার আত্মাকে শুষ্ক রাখ,” বা “শুষ্ক আত্মা (বা শুষ্ক আলোক) উত্তম”- হিরাক্লিটাসের এসব নীতিবাক্য এবং “সুখ নীতিশিক্ষার মূলসূত্র”-ডেমোক্রিটাসের এই নীতিবাক্য গ্রিকদের চিন্তাধারায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই দুই চিন্তাবিদকে ঐসব চিন্তাধারার স্থপতি বলে মনে করা হয়, যেসব চিন্তাধারা পরবর্তীকালে স্টোয়িক ও এপিকিউরীয় চিন্তাধারায় বিকশিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম নৈতিক সমস্যাকে সর্বসমক্ষে নিয়ে আসার জন্য সোফিস্টরাই কৃতিত্ব পাওয়ার প্রথম দাবী রাখেন। “মানুষ সব কিছুর পরিমাপক”-সোফিস্টদের এই মূলবাণী থেকে এটা বেশ বুঝা যায় যে, নৈতিকতার কোন ধরাবাঁধা বা স্থিরীকৃত মানদণ্ড নেই, বরং ব্যক্তি নিজেই কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায়, তা নিরূপণ করে; অর্থাৎ নৈতিকতা ব্যক্তিনির্ভর।

সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতঃ সক্রেটিস নিজেকে কেবল জ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বরং তিনি জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার কথাও বলেন। তিনি এ করতে গিয়ে সদগুণকে জ্ঞানের সঙ্গে একীকরণ করে বলেন, “**জ্ঞানই সদগুণ**”(Knowledge is virtue) তিনি মনে করেন যে, নৈতিক ক্রিয়া জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে, কোন মানুষের ন্যায় সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে তার পক্ষে ন্যায় কাজ করা সম্ভব নয়। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যায় কাজ করতে পারেন না, কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিই অন্যায় কাজ করতে পারে। ন্যায়ের ভিত্তি প্রকৃত জ্ঞান ও অন্যায়ের ভিত্তি অজ্ঞতা। “**নিজেকে জান**”(Know thyself)-এ সূত্রটি থেকে এটা বেশ বুঝা যায় যে, তিনি এটা ভালভাবে উপলব্ধি করেন যে, সৎ জীবনের জন্য আত্মজ্ঞান বা মানব স্বভাব-সম্পর্কীয় জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্লেটোর মতে, নৈতিক বিষয়ের এই জ্ঞান হচ্ছে তত্ত্ববিদ্যক বা আধিবিদ্যক জ্ঞান। তাঁর মতে, **ধারণার জগত** হচ্ছে সত্তার জগত এবং এই জগতই প্রকৃত জগত। আমাদের ইন্দ্রিয়জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তুর মৌলিক সত্তা হচ্ছে ভাব বা ধারণা। এই ধারণাসমূহের মধ্যে সব থেকে মৌলিক ধারণাই শুভ বা কল্যাণের ধারণা।

অন্যান্য চিন্তাবিদদের মত : প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সমকালীন দুটো নৈতিক চিন্তা- গোষ্ঠী ' দেখা যায় এবং এদের একটি হচ্ছে, 'সিরেনাইক' ও অপরটি 'সিনিক'। সিরেনাইকদের মতে, ভাল ক্রিয়া তাই, যা সুখ দেয়, অর্থাৎ সুখই জীবনের লক্ষ্য। আর সিনিকদের মতে, শুভত্বের সঙ্গে সুখের কোন সম্পর্ক নেই এবং শুভ বা সৎ জীবন মানব কামনা ও তার সন্তুষ্টি থেকে স্বতন্ত্র। পরবর্তী গ্রিক চিন্তায় সিরেনাইকদের অনুসরণ করেন এপিকিউরীয়েরা ও সিনিকদের অনুসরণ করেন স্টোয়িকেরা। এপিকিউরীয়েরা সুখসম্পর্কীয় মতবাদের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে বলেন যে, সুখই ভাল এবং সুখই মানুষের লক্ষ্য হওয়া

কৃতির উচিত। স্টোয়িকেরা সুখের অনুভূতির পরিবর্তে বৌদ্ধিক (rational) জ্ঞান বা কর্তব্যের বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের উপর জোর দেন।

মধ্যযুগীয় নীতিবিদ্যা(Medieval Ethics)

মধ্যযুগীয় নীতিবিদ্যায় ধর্মের প্রভাবই বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় এবং ধর্মীয় বিধি- জ্ঞানই বিধান ও ধর্মযাজকদের বক্তব্য ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকরণের ক্ষেত্রে প্রধান নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। মধ্যযুগীয় নীতিবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও প্রকৃত ধর্মযাজকদের বক্তব্য অনুসারে নৈতিক ক্রিয়াবলীর বিবেচনা করা এবং ফলে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা-র (casuistry) প্রাধান্যই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় বেশী দেখা যায়। এ যুগের চিন্তা- বিদদের মধ্যে সেন্ট অগাস্টিন (আনুমানিক ৩৫৩-৪৩০), সেন্ট অ্যানসেল্ম (১০৩৩-১১০৯) ও থমাস অ্যাকুইনাস-এর (আনুমানিক ১২২৬-১২৭৪) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক নীতিবিদ্যা(Modern Ethics)

ক. কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেন যে, নৈতিক অবধারণ গঠনের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য হচ্ছে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল নিছক বিষয়ীগত ব্যাপার, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যা পছন্দ করে, তা তার কাছে ন্যায় এবং যা অপছন্দ করে, তা তার কাছে অন্যায়। প্রাচীন গ্রিসের অধিকতর কঠোর মনোভাবাপন্ন সোফিস্টদের এবং আধুনিককালের সংশয়বাদীদের এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

খ. কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেন যে, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নিছক প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টি বা স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করে এবং এই দলের কঠোর মনোভাবাপন্ন চিন্তাবিদেদেরা মনে করেন যে, নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কে যা কিছু বলা যায়, তা এই বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিমিত (moderate) স্বজ্ঞাবাদের ধারক ও বাহকদের মধ্যে স্যারফটবেরী ও হাচিসন-এর 'নীতিবোধ' সম্প্রদায় ('Moral নৈতিক Sense' School) এবং থমাস রীড (Thomas Reid) পরিচালিত স্কটিশ 'সহজ বুদ্ধি' সম্প্রদায় ('Common Sense' School) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ. কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেন যে, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য কোন এক নিয়মের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই নিয়মের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নৈতিকতা-সম্পর্কীয় নিয়ম সম্পর্কে দুটি নীতিদার্শনিক সম্প্রদায় দেখা যায়। প্রথম নীতিদার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে, নৈতিক নিয়ম হচ্ছে মানব স্বভাবের নিয়ম, যা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সংগঠনের পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বাটলার (১৬৯২-১৭৫২) যদিও এই নীতিদার্শনিক সম্প্রদায়ের একজন উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ, তথাপি এর অনুরূপ মত হিউম (১৭১১-১৭৭৬) ও অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) পোষণ করেন। তাঁরা সবাই নৈতিকতার মূলকে আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে বিবেক বা নীতিবোধকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন।

ঘ. কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেন যে, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য আমাদের ক্রিয়ার ফলাফল, বিশেষভাবে আমাদের কামনার তৃপ্তি এবং আমাদের ও অন্যদের সুখ সৃষ্টির শক্তির উপর নির্ভর করে। প্রাচীন যুগে গ্রিসে সিরেনাইক ও এপিউরীয়দের এবং আধুনিক যুগে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ও সিজউইক (১৮৩৮-১৯০০) সহ ইংরেজ উপযোগবাদীদের মধ্যে এই মত পরিলক্ষিত হয়।

নৈতিক মানদণ্ড-সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের শ্রেণীকরণ(The Classification of the theories of the Moral Standard)

নৈতিক মানদণ্ড-সম্পর্কীয় মতবাদসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। **নিরপেক্ষ নীতিবিদ্যা (Absolute Ethics)** মনে করে যে, একটা সার্বিক ও শাস্ত্র নৈতিক নীতিমালা বা রীতি-নীতি রয়েছে, যা কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে সর্ব যুগে সব মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, **সাপেক্ষ নীতিবিদ্যা (Relative Ethics)** মনে করে যে, নৈতিক নীতিমালা বা রীতি-নীতি সার্বিক ও শাস্ত্র নয়, বরং পরিবর্তন সাপেক্ষ, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নরূপে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বিষয়গত ও বিষয়ীগত নীতিবিদ্যা : বিষয়ীগত নীতিবিদ্যা সাপেক্ষ নীতিবিদ্যার এমন একটা রূপ, যা মনে করে যে, যে পরিস্থিতি বা অবস্থা নৈতিক অবধারণে পরিবর্তন আনে, তা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বা পরিস্থিতি,

অর্থাৎ ব্যক্তির কাছে যা পছন্দীয়, তাই ভাল। সাপেক্ষ নীতিবিদ্যার এমন অনেক রূপ আছে, যেগুলো বিষয়গত নয়, যেমন, যে মতবাদ মনে করে যে, আর্থিক অবস্থার উপর বহু বিবাহের ন্যায়ত্ব বা অন্যায়ত্ব নির্ভর করে, তা বিষয়গত, কিন্তু সাপেক্ষ।

প্রকৃতিবাদ ও অপ্রকৃতিবাদ : নীতিবিদ্যায় প্রকৃতিবাদ ও অপ্রকৃতিবাদ-ও (Naturalistic and Non-naturalistic theories) পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতিবাদ সাধারণত বর্ণনামূলক বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে প্রকৃতিবাদের সব থেকে সাধারণ রূপ মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে নৈতিক ধারণার বিশ্লেষণ করে।

পরিণতিমুক্ত ও পরিণতিমূলক মতবাদ ঃ সি.ডি.ব্রড নৈতিক মতবাদসমূহকে পরিণতিমুক্ত বা কর্তব্যবিষয়ক ও পরিণতিমূলক মতবাদ হিসেবে শ্রেণীকরণ করেন। কর্তব্যবিষয়ক মতবাদ মনে করে যে, একটা কাজের ফলাফলের উপর কাজটির ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে স্বয়ং কাজটির উপর। পক্ষান্তরে, পরিণতিমূলক মতবাদ মনে করে যে, কাজের ন্যায়-অন্যায় নির্ভর করে কাজটির ফলাফলের উপর।

সাম্প্রতিক নীতিবিদ্যা(Contemporary Ethics)

নীতিবিদ্যার গতানুগতিক মতের আমূল পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে নীতিবিদ্যায় **পরনীতিবিদ্যা(Metaethics)** নামে এক নতুন আলোচনার বা ধারার উদ্ভব হয়েছে। নীতিবিদ্যার এই নতুন ধারার পিছনে জি ই ম্যুরের অবদান যথেষ্ট রয়েছে। তিনি যৌক্তিক ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৈতিক পদ ও ধারণার অর্থ পরিষ্কার করে নৈতিক বিষয়াবলীর আলোচনার কথা বলেন। এই বিশ্লেষণী ধারার সূত্র ধরেই সাম্প্রতিক নীতিবিদ্যায় নৈতিক অবধারণের স্বরূপ সম্পর্কে প্রকৃতিবাদ, অপ্রকৃতিবাদ, আবেগবাদ, নির্দেশবাদ, বর্ণনাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

প্রকৃতিবাদী: হবস, বেহাম, মিল, স্পেন্সার প্রমুখ।

অপ্রকৃতিবাদী: প্লেটো, জি,ই ম্যুর, প্রিচার্ড, রস প্রমুখ।

আবেগবাদী: এ.জে এয়ার, আর এল স্টিভেনসন, মরিজ স্লিক, কারন্যাপ প্রমুখ

নির্দেশবাদী : আর এম হেয়ার এর প্রবক্তা।

বর্ণনাবাদী: এই মতবাদকে নব্য প্রকৃতিবাদও(neo naturalism) বলা হয়। এর সমর্থক ডেভিড হিউম, জে আর সার্ল(তার How to derive ought from is প্রবন্ধ), জি জে ওয়ারনক প্রমুখ।

সুখবাদ(Hedonism)

১. সুখবাদের স্বরূপ (nature of hedonism) :

সুখবাদ অনুসারে সুখই নৈতিক আদর্শ, যার আলোকে মানুষের কাজের নৈতিক গুণাবলি নির্ধারিত হয়। সুখই (Hedone) মানব জীবনের পরমকল্যাণ। যে কাজ সুখ দেয় ও দুঃখ দেয় তা অনুচিত। সুখ অন্বেষণ করা এবং দুঃখ পরিহার করাই মানুষের কর্তব্য। সুখবাদের দুটি ভিত্তি রয়েছে। যথা- **মনস্তাত্ত্বিক (psychological)** এবং **পরাবৈজ্ঞানিক (metaphysical)**। সুখবাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি এই যে, মানুষ স্বভাবত সুখ অন্বেষণ করে এবং দুঃখ পরিহার করে। বেহাম, জে. এস. মিল প্রমুখ বলেন যে, আমরা স্বভাবের তাগিদে সুখের সন্ধান করি এবং দুঃখের নিরসনে তৎপর হই। সুখই আমাদের স্বাভাবিক কাম্যবস্তু। আমরা যে বস্তু পেতে চাই তা শুধু সুখ অর্জনের জন্য। কাজেই কামনার লক্ষ্য হলো সুখ এবং এই সুখ লাভের উপায় হলো বস্তু।

সুখবাদের পরাবৈজ্ঞানিক ভিত্তি এই যে, মানুষের মন সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সত্ত্ব (sensuous)। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি মনের প্রধান কামনা। মন কতকগুলি সংবেদন, অনুভূতি ও প্রবৃত্তি এবং আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি। মানুষের বুদ্ধি বা বিচারশক্তি থাকলেও এর স্থান মানবজীবনে গৌণবুদ্ধি প্রবৃত্তি দাস। অধিকাংশ সুখবাদীর মতে বুদ্ধির একমাত্র কাজ হলো প্রবৃত্তির লক্ষ্য অর্জনের উপায় নির্দেশ করা। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বুদ্ধির কাজ; বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের আঞ্জাবহ। কাজেই, সুখবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়ই নীতিশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়।

২. সুখবাদের প্রকারভেদ (types of hedonism) :

সুখবাদকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে যথা- (ক) মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ (psychological hedonism) এবং (খ) নীতিশাস্ত্রসম্মত সুখবাদ (ethical hedonism)। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ অনুসারে সুখই মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক “কাম্যবস্তু। আমরা স্বভাবত সকল সময় সুখ অন্বেষণ করি ও দুঃখ পরিহার করতে চেষ্টা করি। পক্ষান্তরে, নীতিশাস্ত্রসম্মত সুখবাদ অনুসারে সুখই মানুষের কাম্যবস্তু হওয়া -উচিত, অর্থাৎ সকল সময় আমাদের সুখ কামনা করা উচিত।

নীতিশাস্ত্রসম্মত সুখবাদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) আত্মসুখবাদ (egoistic hedonism) এবং (২) পরসুখবাদ (altruistic hedonism)।

এই আত্মসুখবাদ আবার দুইভাগে বিভক্ত যথা (ক) স্থূল আত্মসুখবাদ (gross egoistic hedonism or gross egoism) এবং (খ) সূক্ষ্ম আত্মসুখবাদ (refined egoistic hedonism or refined egoism)।

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ (Psychological Hedonism)

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ অনুসারে সুখই মানুষের একমাত্র কাম্যবস্তু। প্রত্যেক মানুষ সর্বদা সুখ অন্বেষণ করে এবং দুঃখ পরিহার করতে সচেষ্ট হয়। সুখই মানুষের কাজের একমাত্র প্রেরণা। আমরা কোনো বস্তুকে তার নিজের জন্য কামনা করি না, বস্তুটি সুখ আনয়ন করে বলে বস্তুটি কামনা করি। অর্থাৎ সুখের আশায় আমরা কোনো বস্তু পেতে চাই, শ্রেফ বস্তুটির জন্য নয়। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখান্বেষণেই জীবনের লক্ষ্য।

প্রাচীন সিরেনিক চিন্তাবিদরা (cyrenaics) এই মতের সমর্থক। বর্তমান যুগে হিউম, বেঙ্হাম, জে.এস. মিল, বেন প্রমুখ চিন্তাবিদ এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বেঙ্হাম বলেন, “প্রকৃতি মানুষকে সুখ ও দুঃখ এই দুই প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছে। আমাদের কি করা উচিত এবং কি করব তা একমাত্র তারাই নিরূপণ করে থাকে।”

"Nature has placed mankind under the governance of two sovereign matters, pain and pleasure. It is then alone to point out what we ought to do as well as what we shall do." - Bentham

সমালোচনা :

১. রাশডালের (Rashdall) মতে, মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। এই মতবাদ (hysteron proteron) অনুপদিষ্ট। তিনি বলেন কোনো বস্তুকে কামনা করার ফলে তা আরামদায়ক বলে অনুভূত হয়- কোনো বস্তু আরামদায়ক বলে তা কামনা করা হয় না। কোনো কাম্যবস্তু লাভ হলে তা সুখ আনয়ন করে।

২. ড. সিগউইক (Dr. Sidgwick) মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের একটি প্রধান ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, “সুখের প্রতি আকর্ষণ যদি অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে সে সুখ আর পাওয়া যায় না।” "The impulse towards pleasure, if too predominant, defeats its own aim." - Sidgwick

যতই আমরা সুখ পেতে চাই ততই আমরা সুখ হারাই। সুখ পেতে হলে সাময়িকভাবে আমাদেরকে সুখ বিস্মৃত হতে হয়, অর্থাৎ সুখ পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো সুখ বিস্মৃত হওয়া। এটাকে বলা হয় **সুখবাদের কুটাম্বাস (paradox of hedonism)**; এটা সর্বত্র সত্য নয়। পরিপূর্ণভাবে সুখ পেতে হলে সুখ সম্পর্কে কিছুটা নির্লিপ্ত থাকা আবশ্যিক। যখন আমরা সিনেমা দেখি, তখন সিনেমা প্রদর্শনের প্রতি লক্ষ্য করি, সুখের প্রতি নয়। সুখের প্রতি সচেতনতা সুখকে হারানোর শামিল।

নীতিশাস্ত্রসম্মত সুখবাদ (Ethical Hedonism)

নীতিশাস্ত্রসম্মত সুখবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের উচিত তার সর্বাধিক সুখ অনুসন্ধান করা। সুখই মানুষের একমাত্র কাম্যবস্তু। যদিও আমরা সর্বদা সুখ অন্বেষণ করি না, তবে সুখ অন্বেষণ করা আমাদের উচিত। যে কাজ ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ আনয়ন করে সেই কাজ ভালো, আর যে কাজ ব্যক্তির সর্বাধিক দুঃখ আনয়ন করে সেই কাজ মন্দ। অতএব বলা যায় যে, সুখই ব্যক্তির কার্যাবলির নৈতিক মাপকাঠি।

নীতিশাস্ত্রসম্মত সুখবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- (ক) আত্মসুখবাদ (egoistic hedonism) এবং (খ) পরসুখবাদ (altruistic Hedonism)। আত্মসুখবাদ অনুসারে —প্রত্যেক মানুষের উচিত তাঁর নিজের সর্বাধিক সুখ অনুসন্ধান করা।

বাঁজির সুখই নৈতিক আদর্শ। পক্ষান্তরে, পরসুখবাদ অনুসারে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। এই মতানুসারে সর্বাধিক সুখই নৈতিক আদর্শ।

আত্মসুখবাদ আবার দুই প্রকারের হতে পারে। যথা (ক) স্কুল আত্মসুখবাদ এবং (খ) সূক্ষ্ম আত্মসুখবাদ।

(ক) স্কুল আত্মসুখবাদ (gross egoistic hedonism or gross egoism) : এই মতবাদ অনুসারে সকল সুখ একই জাতীয়- সুখের কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। সুখের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা হলো পরিমাণগত। নৈতিক ও মানসিক সুখের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই- সবই সুখ। সুখের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে তা হলো তীব্রতা ও স্থায়িত্বের (intensity and duration) পার্থক্য। মানসিক সুখের তুলনায় নৈতিক সুখ অধিকতর কাম্য। কেননা দৈহিক সুখ তীব্র, স্থায়ী এবং মানসিক সুখ ক্ষীণ ও দুর্বল। ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানে সুখ পরিত্যাগ করা নির্বুদ্ধিতা। অতীত মৃত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; একমাত্র বর্তমান নির্ভরযোগ্য। সুতরাং বর্তমানের প্রত্যেক মুহূর্তকে সুখ আনন্দের কাজে ব্যয়িত করাই জীবনের লক্ষ্য।

গ্রিক দার্শনিক অরিস্টিপাস (Aristippus)-এর মতবাদের মধ্যে স্কুল আত্মসুখবাদের মূল বক্তব্যের আভাস পাওয়া যায়। তিনি সিরেনিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারে এই মতবাদকে সিরেনিসিজম (cyrenaicism) বলা হয়ে থাকে। তাঁর মতে মানুষের নিজের সুখই তার একমাত্র কাম্য। যে কোনো উপায়ে সুখ ভোগ করা মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর সুখবাদ ভারতের চার্বাকদের মতবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয় : “যাবৎ জীবৎ, সুখং জীবৎ, ঋণ কৃত্বা মৃতং পিবেৎ” [যতদিন বাঁচ, সুখে বাচো, ঋণ করেও ঘি খাও]।

(খ) সূক্ষ্ম আত্মসুখবাদ (refined egoistic hedonism or refined egoism) : গ্রিক দার্শনিক অ্যাপিকিউরিয়াস এই মতবাদের প্রধান প্রচারক। তাই এই মতবাদ-এর প্রচারকের নামানুসারে ‘অ্যাপিকিউরিয়ানিজম’ (epicureanism) নামে অভিহিত হয়। অ্যাপিকিউরিয়াস মানব জীবনে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং সাময়িক সুখের পরিবর্তে স্থায়ী সুখকে প্রাধান্য দান করে। তাঁর মতে, মানব জীবনের লক্ষ্য সুখ লাভ, তবে বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত এই সুখ লাভ হয় না। অনুভূতির পরিচালনায় সুখ-লাভের পথ অনিশ্চিত ও বহু দিক দিয়ে কণ্টকিত। একমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই পরিপূর্ণ সুখ অর্জন করা যায়, যদি ভবিষ্যতে বৃহত্তর সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বর্তমানের সুখ বর্জন করাই আমাদের উচিত। অভাব ও কামনার হাস করেই আমরা প্রকৃত সুখ পেতে পারি; অভাব ও কামনা বুদ্ধির দ্বারা নয়। মনের শান্তি ও সমতা লাভ এবং দুঃখ পরিহারের মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়।

সূক্ষ্ম আত্মসুখবাদ স্কুল আত্মসুখবাদের উন্নততর রূপ। স্কুল আত্মসুখবাদ শুধু বর্তমানের সাময়িক সুখ ও দৈনিক সুখকে মানব জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করে; কিন্তু সূক্ষ্ম আত্মসুখবাদ অনুসারে সাময়িক ও দৈহিক সুখের তুলনায় স্থায়ী ও মানসিক সুখ অধিকতর কাম্য। অ্যাপিকিউরিয়াসের সূক্ষ্ম আত্মসুখবাদের চারটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। যথা-

(১) যে সুখ কোনো দুঃখ উৎপাদন করে না তা পেতে হবে, (২) যে দুঃখ কোনো সুখ উৎপাদন করে না তা পরিহার করতে হবে।

(৩) যে আনন্দ অধিকতর আনন্দ লাভের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ বা দুঃখ উৎপাদন করে তা পরিহার করতে হবে ও (৪) যে দুঃখ পরে অধিকতর আনন্দ আনে বা অধিকতর দুঃখ পরিহার করতে সাহায্য করে তা সহ্য করতে হবে

পরসুখবাদ/উপযোগবাদ (Hedonism/ Utilitarianism)

আধুনিক কালে আত্মসুখবাদ নৈতিক মতবাদ হিসাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। আজকের নীতিশাস্ত্র সার্বিকতার (universalism) দিকে এগিয়ে চলছে। সুখবাদীরাও আত্মসুখবাদের পরিবর্তে পরসুখবাদকে নৈতিক মতবাদ হিসাবে সমর্থন করেছেন। পরসুখবাদ অনুসারে সর্বসাধারণের সুখই ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত। আমাদের পক্ষে সর্ব সাধারণের সুখ কামনা করা সম্ভব না হলে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ (The greatest happiness of the greatest number) আমাদের কামনা করা উচিত। এই মতবাদ অনুযায়ী ‘সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই নৈতিক আদর্শ’।

যে কাজ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ আনয়নে সমর্থ সেই কাজ যথোচিত, আর যে কাজ তা পারে না তা অনুচিত। কাজেই আমাদের কর্তব্য আমাদের সাধ্যানুযায়ী অধিক অধিক সংখ্যক লোকের সুখ কামনা করা। পরসুখবাদকে উপযোগবাদ ও (utilitarianism) বলা হয়। কেননা কোনো কার্য ভালো কি মন্দ তা কার্যটির উপকারিতা বা উপযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

বেহাম ও মিল এই মতবাদের প্রচারক। বেহাম ও মিলের মতে সর্বসাধারণের সুখই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। তবে এই দুই চিন্তাবিদেদের মতবাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বেহাম সুখের শুধু পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকার করেন; কিন্তু মিল সুখের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের পার্থক্যই স্বীকার করেন। বেহামের পরসুখবাদ, স্থূল পরসুখবাদ এবং মিলের পরসুখবাদ সূক্ষ্ম পরসুখবাদ নামে পরিচিত।

বেহামের স্থূল উপযোগবাদ বা স্থূল পরসুখবাদ (utilitarianism or gross altruistic hedonism) : বেহামের স্থূল সুখের পরিমাণের সাহায্যেই সুখের মূল্য বিচার করা যায়। দৈহিক ও মানসিক সুখের মধ্যে কোনো গুণগত প্রভেদ নেই। এদের মধ্যে যদি কোনোরূপ পার্থক্য থাকে তবে তা পরিমাণগত পার্থক্য। দৈহিক সুখ মানসিক সুখের তুলনায় তীব্রতর, ফলে মানসিক সুখের তুলনায় দৈহিক সুখই প্রধান কাম্যবস্তু হওয়া উচিত। যে পরিমাণের মাধ্যমে সুখের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করা হয় তার বিভিন্ন মান (dimensions) আছে এবং বেহাম সুখের সাতটি মান স্বীকার করেছেন। যথা- (১) তীব্রতা (intensity), (২) স্থায়িত্ব (duration), (৩) নিশ্চয়তা (certainty), (৪) নৈকট্য (nearness), (৫) উর্বরতা (fruitfulness of fecundity) (৬) বিশুদ্ধি (purity) এবং (৭) বিস্তৃতি (extent)।

১. তীব্রতা (intensity) : ক্ষীণতর সুখের তুলনায় তীব্রতর সুখ আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। বেহামের মতে মানসিক সুখের চেয়ে দৈহিক সুখ অনেক বেশি তীব্র। কাজেই দৈহিক সুখ আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

২. স্থায়িত্ব (duration) : স্বল্পস্থায়ী সুখের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী সুখ আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

৩. নিশ্চয়তা (certainty) : অনিশ্চিত সুখের প্রতি ধাবিত না হয়ে যে সুখ নিশ্চিত অর্থাৎ যে সুখ আমাদের ধরাছোঁয়ার ভিতরে তা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

৪. নৈকট্য (nearness) : বেহাম দূরবর্তী সুখের তুলনায় নিকটবর্তী সুখকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে দূরবর্তী সুখের পরিবর্তে নিকটবর্তী সুখ, ভাবী সুখের পরিবর্তে বর্তমান সুখ আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

৫. উর্বরতা (fruitfulness of fecundity) : যখন একটি সুখ একাধিক সুখ আনয়ন করে তখন তাকে উর্বর সুখ বলা হয়। কিন্তু যে সুখ অন্য কোনো সুখ আনয়ন করতে পারে না তাকে অনুর্বর সুখ বলে। বেহাম বলেন যে, অনুর্বর সুখের পরিবর্তে উর্বর সুখই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

৬. বিশুদ্ধি (purity) : যে সুখের মধ্যে দুঃখের ছোঁয়াচ নেই সেই সুখই বিশুদ্ধ সুখ আর যে সুখ দুঃখ মিশ্রিত তাকে বিশুদ্ধ সুখ বলা যায় না। মিশ্রিত সুখের পরিবর্তে বিশুদ্ধ সুখই আমাদের কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭. বিস্তৃতি (extent) : সুখের বিস্তৃতি বলতে বুঝায় যত লোক সুখ ভোগ করে তাকে। যে সুখের বিস্তৃতি যত অধিক সে সুখ ততই আদরণীয়। যে সুখ যত অধিক সংখ্যক লোক উপভোগ করে সে সুখের বিস্তৃতি ততই বেশি। বেহামের মতে স্বল্প বিস্তৃতি সুখের তুলনায় অধিক বিস্তৃতি সুখই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

উপরোক্ত সাতটি মানের সাহায্যে সুখের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতিকে সুখবাদের গণনা-প্রণালি (hedonistic calculus) বলা হয়ে থাকে। বেহাম উক্ত গণনা-প্রণালির সাহায্যে সুখের পরিমাণ নির্ধারণ করে কাজ পদ্ধতি স্থির করতে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, “সুখ ওজন কর, দুঃখ ওজন কর এবং যেভাবে পাল্লা দাঁড়ায় তাই ভালো-মন্দের প্রশ্ন সমাধান করবে”

"Weight pleasure, weight pains, and as the balance stands will stand the question of right and wrong" - Bentham (Principles of Ethics by P.B. Chatterjee)

বেঙ্হাম পরসুখবাদ স্বীকার করলেও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা স্বভাবত আমাদের নিজেদের সুখই অন্বেষণ করে থাকি। তিনি বলেন, “প্রকৃতি মানুষকে সুখ-দুঃখ, এই দুই প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছে। আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কি করব তা একমাত্র তারাই নিরূপণ করে থাকে।” তিনি পুনঃ পুনঃ মানুষের আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। বেঙ্হামের মতে, যেহেতু মানুষ স্বভাবত সুখ কামনা করে সেহেতু তার সুখ কামনা করা উচিত। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ নৈতিক সুখবাদের ভিত্তি।

এখন প্রশ্ন ওঠে, বেঙ্হামের মতে মানুষ যদি স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয় তবে কিভাবে সে পরসুখবাদ সমর্থন করতে পারে? মানুষ যদি স্বভাবত নিজের সুখ কামনা করে, তবে সে পরের সুখ চাইবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বেঙ্হাম নৈতিক নিয়ন্ত্রণের (moral sanctions) সহায়তা নিয়েছেন। নৈতিক নিয়ন্ত্রণ কোনো কর্মপন্থাকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। বেঙ্হাম চার প্রকার নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ, (২) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, (৩) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং (৪) ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, বেঙ্হামের নৈতিক নিয়ন্ত্রণসমূহ বহিনিয়ন্ত্রণ— যা মানুষকে নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করে অপরের স্বার্থ কামনায় বাধ্য করে। সুতরাং তাঁর মতে বহিনিয়ন্ত্রণের প্রভাবেই মানুষ আত্মসুখবাদ থেকে পরসুখবাদে উন্নীত হয়।

মিলের সূক্ষ্ম উপযোগবাদ বা সূক্ষ্ম পরসুখবাদ (Mill's refined utilitarianism or refined altruistic hedonism):

সূক্ষ্ম উপযোগবাদ বা সূক্ষ্ম পরসুখবাদের প্রচারক জন স্টুয়ার্ট মিল। বেঙ্হামের উপযোগবাদ বা পরসুখবাদের ত্রুটিবিচুতি দূরীকরণের প্রয়াস রয়েছে মিলের পরসুখবাদে। তাঁর মতে, সার্বিক শান্তিই জীবনের কাম্যবস্তু, ব্যক্তিগত শান্তি নয়। যে কাজ শান্তি উৎপাদন করে সেই কাজ যথোচিত; আর যে কাজ শান্তির বিপরীত তা অনুচিত। মানুষের সমস্ত কাজের লক্ষ্য শান্তি বা সুখ। তিনি সুখ ও শান্তি এই দুটি একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। মিলের সূক্ষ্ম উপযোগবাদ বা সূক্ষ্ম পরসুখবাদ মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন যে, আমরা সর্বদা সুখ কামনা করি। কাজেই সুখ কামনার যোগ্য (desirable)।

মিল বলেন যে, আমাদের সার্বিক সুখ কামনার মূলে দ্বিবিধ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে - বহিনিয়ন্ত্রণ (external sanctions) এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ (internal sanctions)। বেঙ্হাম চার প্রকারের বহিনিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেছেন। যথা- প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ। মিলও এই চারটি বহিনিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেছেন। যেহেতু এই নিয়ন্ত্রণসমূহ বাইরে থেকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাই এদের প্রভাবে আমরা যে কাজ করতে বাধ্য হই তার কোনো নৈতিক মূল্য থাকে না। এই কারণে মিল বহিনিয়ন্ত্রণের সাথে একটি অন্তরের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। অন্তরের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মিল বলেন যে, কর্তব্য পালন না করার জন্য আমাদের মনে যে দুঃখের অনুভূতি জাগে তা অন্তরের নিয়ন্ত্রণ।

মিলের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, মিল সুখের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন। এটা তাঁর মতবাদের একটি অভিনবত্ব। বেঙ্হাম শুধু সুখের পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু মিল সুখের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকার পার্থক্যই স্বীকার করেছেন। মিলের বহু পূর্বে অ্যাপিকিউরিয়াস দৈহিক ও মানসিক সুখের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং দৈহিক সুখের তুলনায় মানসিক সুখে প্রাধান্য দেন। কিন্তু তিনি সুখের গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নি। বেঙ্হামের মতে, সকল সুখ একই জাতীয়।

সুখের এই গুণগত পার্থক্য নিরূপণের মাপকাঠি কি? এই ব্যাপারে মিল উপযুক্ত বিচারকদের রায়ের ওপর নির্ভর করতে বলেছেন। উপযুক্ত বিচারক (competent judges) সব সময়ে দৈহিক সুখের পরিবর্তে মানসিক সুখকেই মনোনয়ন দান করেন। বিচারকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হলে অধিকাংশ বিচারকদের রায়ই গ্রহণযোগ্য। মিল বলেন, “একটি সুখী শূকর হওয়ার চেয়ে অসুখী মানুষ হওয়া ভালো, একটি সুখী মূর্খ হওয়ার চেয়ে অসুখী সক্রেটিস হওয়া অনেক ভালো।”

"It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied better to be a socrates dissatisfied than a food satisfied." - Mill: Utilitarianism

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মিল আত্মসুখের পরিবর্তে সর্বসাধারণের সুখ, সুখের পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য এবং বহিনিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অন্তরের নিয়ন্ত্রণকে নৈতিকতার মাপকাঠি হিসাবে স্বীকার করে সুখবাদের সংস্কার সাধন করেছেন। সুখবাদের ক্ষেত্রে সুখের গুণগত পার্থক্যের স্বীকৃতি ও বহিনিয়ন্ত্রণের তুলনায় অন্তরের নিয়ন্ত্রণকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ বলে গ্রহণ করা মিলের মতবাদকে তাঁর পূর্ববর্তী সুখবাদীদের মতামত থেকে পৃথক করেছে। এটা বলা বাহুল্য যে, মিলের সুখবাদ অন্যান্য সুখবাদের চেয়ে অনেক উন্নত।

বিবর্তনমূলক সুখবাদ(Evolutionary Hedonism)

অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন যে, বিশ্বজগতের মতো নৈতিকতা বা নীতিবোধও বিবর্তনের ফল। বিশ্বজগত যেমন ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে, নীতিবোধও তেমনি ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্পেন্সার ও তাঁর অনুসারীরাই প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে বিবর্তনের ধারণা প্রয়োগ করেন। সৌরজগতের উৎপত্তি, প্রাণ ও প্রাণীর উদ্ভব, মন, সামাজিক, নৈতিক সংগঠন প্রভৃতির উৎপত্তির ব্যাখ্যাকল্পে তাঁরা বিবর্তনবাদের সহায়তা নিয়েছেন।

হার্বার্ট স্পেন্সার, লেসলি, স্টিফেন ও আলেকজান্ডার প্রমুখ প্রচারিত সুখবাদ বিবর্তনমূলক সুখবাদ (evolutionary hedonism) নামে পরিবিদিত।

৩. হার্বার্ট স্পেন্সার বিবর্তনমূলক সুখবাদ(Herbert's Evolutionary Hedonisms)

হার্বার্ট স্পেন্সারই প্রথম নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করেন। স্পেন্সার মনুষ্যতর ইতর প্রাণীর আচরণকে নীতিবোধের উৎস বলে মনে করেন। উদ্দেশ্যের সাথে কাজের বিধানকে তিনি আচরণ বলে অভিহিত করেন। আচরণের মাধ্যমেই জীব তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। “জীবন হলো বাইরের সম্বন্ধের সাথে ভিতরের সম্বন্ধের নিরন্তর সঙ্গতি।” জীবনের আচরণ হয় এই অসঙ্গতিকে উন্নত করে, না হয় তাতে বাধা দান করে। মানুষের যে কাজ তাকে পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে সেই কাজ ভালো, আর যে কাজ পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের পরিপন্থী হয় সেই কাজ মন্দ। ভালো কাজ সুখ উৎপাদন করে, কেননা তা ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে থাকে। মন্দ কাজ দুঃখ আনয়ন করে; কেননা তা পরিবেশের সাথে ব্যক্তির সঙ্গতি বিধান করতে পারে না। মানুষের অধিকাংশ কাজ আংশিক ভালো এবং আংশিক মন্দ।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে সুখ জীবনশক্তিকে বৃদ্ধি করে এবং দুঃখ জীবনীশক্তিকে হ্রাস করে। যে সমুদয় কাজ সুখ উৎপাদন করে সেই সমস্ত কাজ জীবনকে বলিয়ান করে ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। আর যে সমুদয় কাজ দুঃখ উৎপাদন করে সেই সমস্ত কাজ জীবনকে ক্ষীয়মাণ করে ও জীবনীশক্তি ক্ষয় করে। কাজেই যে কাজ জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে সেই কাজ আমাদের করা উচিত এবং যে কাজ জীবনীশক্তি হ্রাস করে সেই কাজ আমাদের পরিহার করা উচিত। তাই তাঁর মতে সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য; কিন্তু জীবনের আসন্ন লক্ষ্য হলো জীবনের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার।”

পূর্ণতাবাদ(Perfectionism)

মনুষ্য স্বভাবে পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনের মধ্যেই পরমকল্যাণ নিহিত রয়েছে। স্বভাবকে অস্বীকার করে কল্যাণ পাওয়া যায় না। বরং স্বভাবের পূর্ণ বিকাশ সাধনেই রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং পূর্ণতাবাদ বা আত্মোপলব্ধি পরম নৈতিক আদর্শ, যা মানুষের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক। প্রাচীন যুগে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং বর্তমান যুগে হেগেল, গ্রিন, কেয়ার্ড (Caird), ডিউই (Dewey), ম্যাকেনজি, ম্যুরহেড, ডি'আর্কী (D'Arcy), পলসন (Paulsen) এবং আরো অনেকেই এই মতবাদের সমর্থক। এরই মতবাদ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন (পূর্ণতাবাদ (perfectionism), কল্যাণবাদ (eudaemonism) এবং শক্তিবাদ (energism)। ”

হেগেল ও নব্য হেগেলীয়দের (যেমন- গ্রিন, ম্যাকেনজি, ম্যুরহেড, ডি আর্কী) প্রচারিত নৈতিক মতবাদকে পূর্ণতাবাদ বলা হয়। এই মতবাদানুসারে আত্মোপলব্ধি নৈতিক আদর্শ। অ্যারিস্টটল কল্যাণবাদের (Eudaemonism) সমর্থক, তিনি এই

কল্যাণকে নৈতিক আদর্শ বলে অভিহিত করেন। অবশ্য কেউ সুখ ও কল্যাণকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ড. পলসন প্রচারিত নৈতিক মতবাদ শক্তিবাদ (Energism) নামে পরিচিত। এই মতবাদ পূর্ণতাবাদ বা কল্যাণবাদ মূলত একই।

আত্মোপলব্ধি হলো পরমকল্যাণ (Self-realisation is the highest good)

পূর্ণতাবাদ অনুসারে আত্মার পূর্ণতা লাভ বা আত্মোপলব্ধি হলো মানব জীবনের পরমকল্যাণ। পূর্ণতা বলতে বুঝায় মানুষের স্বভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ। মানুষ নিজের চেষ্টায়, নিজের বুদ্ধির সাহায্যে কামনা, বাসনা, আবেগ প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে পূর্ণ মনুষ্যত্বে বিকশিত হতে পারে। সমস্ত বাধা বা প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে পূর্ণ মনুষ্যত্বে উদ্ভাসিত হওয়াই মানব জীবনের চরম স্বার্থকতা, মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। পূর্ণতাবাদকে কল্যাণবাদও (eudaimonism) বলা হয়ে থাকে। eudaimonia গ্রিক শব্দ eudaimonism থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো সুখ বা সমৃদ্ধি। অ্যারিস্টটল এ শব্দটিকে নৈতিক কল্যাণ (moral welfare) অর্থে ব্যবহার করেছেন। অ্যারিস্টটল বলেন যে, চরম উৎকর্ষের পথে আত্মার ক্রিয়াশীলতার মধ্যে নিহিত আছে মানুষের পরমকল্যাণ। পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমেই চিরস্থায়ী শান্তি পাওয়া যায়। এই মতবাদকে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতাবাদ বা আত্মোপলব্ধিও বলা হয়ে থাকে। আত্মোপলব্ধি হলো মানুষের ব্যক্তিত্ববোধের পূর্ণ বিকাশ। আদর্শ বুদ্ধিময় সামাজিক আত্মার সম্যক বিকাশ সাধনই আত্মোপলব্ধি।

পূর্ণতাবাদ (সুখবাদ ও বিচারবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সুখবাদ অনুসারে মানুষ ভোগসর্বস্ব; ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি তার জীবনের লক্ষ্য এবং সুখই পরমকল্যাণ। অপরপক্ষে বিচারবাদ অনুসারে মানুষ বুদ্ধিময় সত্তা এবং বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রিত করাই নৈতিক আদর্শ অর্থাৎ সুখবাদ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি এবং বিচারবাদ আত্মত্যাগের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু পূর্ণতাবাদ ইন্দ্রিয় ও আত্মত্যাগ উভয়ের মহিমা ঘোষণা করে। পূর্ণতাবাদ অনুসারে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েই মানুষের আত্মার পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। মানুষের জীবন থেকে বিচারবুদ্ধি নির্বাসন দিলে যেমন, মানুষ পশুর পর্যায়ে উপনীত হয়, তেমনি মানবজীবন থেকে কামনা, বাসনা, অনুভূতি বাদ দিয়ে মানুষ ফেরেশতার শামিল হয় অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের নৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভোগবাদ যেমন চরমস্থি মতবাদ, বিচারবাদও তেমনি চরমস্থি মতবাদ। পূর্ণতাবাদী নীতিবিদরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে উভয় মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

পূর্ণতাবাদ আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের মধ্যেও সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পায়। আত্মসুখবাদ অনুসারে নিজের ব্যক্তিগত সুখই মানুষের কাম্য; অন্যের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার কর্তব্য নয়। পরসুখবাদ অনুযায়ী মানুষের উচিত অপরের সুখ কামনা করা; “সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।” অর্থাৎ অপরের সুখ আমাদের কাম্য, নিজের সুখ নয়। সুতরাং এই দুই মতবাদ অনুসারে মানুষের নিজের কল্যাণ ও অপরের কল্যাণ পরস্পরবিরোধী। কিন্তু পূর্ণতাবাদ অনুসারে ব্যক্তির নিজের কল্যাণ ও সমাজকল্যাণ পারস্পরিক। এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা-মানুষকে সর্বসাধারণের কল্যাণের মধ্য দিয়েই নিজের কল্যাণ লাভ করতে হয়।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ণতাবাদ চরম মতবাদদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মানব চরিত্রের বা মানব স্বভাবের পরিপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করে।

পূর্ণতাবাদের অন্যতম বিখ্যাত সমর্থক হেগেল আত্মোপলব্ধির দুটি নিয়ম নির্দেশ করেছেন। যথা-

(১) নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত কর (Be a person)

(২) মরে বাঁচো বা পূর্ণ সত্তাকে অর্জন করার জন্য ব্যক্তি সত্তাকে বিসর্জন দাও (Die to live)

বিভিন্ন পূর্ণতাবাদী চিন্তাবিদ(Different Perfectionist thinkers)

(ক) প্লেটো (Plato) : দার্শনিক প্লেটো বুদ্ধিবাদী ও পূর্ণতাবাদী। তাঁর মতে মানবাত্মার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বুদ্ধি। বুদ্ধিময় জীবন আত্মার পক্ষে শ্রেষ্ঠ জীবন। এই জীবন প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা ও অনুভূতি বর্জিত নয়। কারণ যা সত্য ও কল্যাণকর তা সুন্দর। পরমকল্যাণ হলো পরম সুন্দর (good is beauty)। বিশুদ্ধ ও উন্নত পার্থিব ভালোবাসা খোদার ভালোবাসায় পরিণত হয়। এটা হলো প্লেটোর মতবাদের বুদ্ধিমূলক উপাদান।

প্লেটোর মতে, আত্মার ত্রিবিধ উপাদান আছে। যথা- প্রজ্ঞা(wisdom) বা বুদ্ধি, কামনা(desire) ও চেতনা (spirit) বা মন। প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি আত্মার সার্বভৌম উপাদান; কামনা সংখ্যায় অনেক, এইগুলি বুদ্ধির আদেশে নিয়ন্ত্রিত। চেতনা বা মন কামনাসমূহের ক্ষেত্রে বুদ্ধির আদেশ কার্যকর করে। এই ত্রিবিধ উপাদান যখন পরস্পর পূর্ণ সঙ্গতির সাথে ক্রিয়া করে তখন আত্মা সম্পূর্ণ সুস্থ, আর যখন এই উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করে তখন আত্মা অকল্যাণ। তাই প্লেটো মনে করেন যে, ন্যায় আত্মার কল্যাণ; আর অন্যায় আত্মার অকল্যাণ। ন্যায় হলো আত্মার বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক ঐক্য আর অন্যায় হলো আত্মার বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে অনৈক্য।

(খ) অ্যারিস্টটল (Aristotle) : অ্যারিস্টটলও একজন বুদ্ধিবাদী ও কল্যাণবাদী। তাঁর মতে, আত্মোপলব্ধি হলো মানব জীবনের পরমকল্যাণ, চরম লক্ষ্য। অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষের প্রত্যেক কাজের পিছনে উদ্দেশ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্য আবার কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্যের উপায় হতে পারে এবং এভাবে উপরে উঠতে উঠতে আমরা পরম আদর্শ বা পরমকল্যাণে উপনীত হব, যার জন্য আমরা বিভিন্ন কল্যাণ লাভে প্রয়াসী। স্বভাবের পূর্ণ বিকাশ সাধনই নৈতিক আদর্শ অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি হলো পরমকল্যাণ।

অ্যারিস্টটলের মতে আত্মার দ্বিবিধ উপাদান বা অঙ্গ রয়েছে; বুদ্ধিময় ও বুদ্ধিবর্জিত। প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি হলো আত্মার বুদ্ধিময় অংশ; আর বুদ্ধিবর্জিত অংশ হলো কামনা, বাসনা, অনুভূতি ইত্যাদি। মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশের অন্য আত্মার বুদ্ধিময় অংশের সাথে আত্মার বুদ্ধিবর্জিত অংশের সহযোগিতা ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন; যে ব্যক্তির আত্মার বিভিন্ন ক্রিয়াবলির মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক বর্তমান অর্থাৎ কামনা, “বাসনা ও বুদ্ধির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে, তাকে ন্যায়পরায়ণ বা ধার্মিক ব্যক্তি বলা যায়। অ্যারিস্টটল দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী অবস্থাকে সত্যতা বা সুবর্ণ মধ্যক(Golden mean) বলেছেন। মানুষ যখন সৎ জীবনযাপন করে, তখন সে কাজের সৎ ফলস্বরূপ আনন্দ লাভ করে। নৈতিক আদর্শ অর্জিত হলে শান্তি আসে, আত্মোপলব্ধির সাথে এই শান্তিট অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে।

(গ) হেগেল (Hegel) : হেগেল আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত কল্যাণবাদী। তাঁর মতে, পরম ধীশক্তি হলো পরমসত্তা। জড়-জগত, প্রকৃতি ও মানবাত্মা সবকিছুই এই পরমসত্তার প্রকাশ। এই বিশ্বের সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে প্রকাশ করছেন এবং আপনাকে উপলব্ধি করছেন। এক কথায়, বিরাট বিশ্ব তাঁর আত্মোপলব্ধির পরিণতি। মানুষের মধ্যেই পরম ধীশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। মানুষের বিচারশক্তি পরম সত্তার বিচারবুদ্ধিরই অভিব্যক্তি। মানবজাতির ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ আত্মসচেতনতার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের চিন্তা পদ্ধতি সদর্থক ধারণা (thesis) থেকে নঞর্থক ধারণা (antithesis) এবং উভয়ের সমন্বয়ের (synthesis) মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। এই অভিব্যক্তি বা বিবর্তন যান্ত্রিক নয়, পরিণতিমূলক।

হেগেলের অনুসারী পূর্ণতাবাদীগণ : গ্রিন (Green), ব্রাডলি (Bradley) ও বোনাসকোয়েট (Bonasquet) :

কান্টের বিচারবাদ (Kant's rationalism or rigorism) : ইমানুয়েল কান্টের বিচারবাদ সুখবাদের বিরোধী। সুখবাদ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির গুরুত্ব আরোপ করে; আর বিচারবাদ বিচারবুদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ব্রাডলি সুখবাদকে ‘সুখের জন্য সুখ’ মতবাদ এবং বিচারবাদকে ‘কর্তব্যের জন্য কর্তব্য’ মতবাদ বলে অভিহিত করেন। সুখবাদ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে নৈতিক আদর্শ বলে মনে করে। আর বিচারবাদ আত্মজয় ও আত্মত্যাগকে নৈতিক আদর্শ বলে বিবেচনা করে।

কান্টের মতে মানবজীবনের বিচারবুদ্ধির স্থান সর্বাপেক্ষা উর্ধ্ব, বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই আমরা জগতকে ব্যাখ্যা করি, নৈতিক নিয়ম উপলব্ধি করি। মানুষের মধ্যে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি (animality and rationality) উভয়ই বিদ্যমান- জীববৃত্তি মানুষ ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যে বর্তমান; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি শুধু মানুষের মধ্যে রয়েছে। এই বুদ্ধিবৃত্তিই শুধু মানুষকে অন্যান্য ইতর প্রাণী থেকে পৃথক করে। তাই কান্টের মতে মানুষের উচিত আবেগ এবং অনুভূতি প্রভৃতিকে অবদমিত করে বিশুদ্ধ চিন্তার জীবনযাপন করা।

কান্ট বিচারশক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- বিশুদ্ধ বিচারশক্তি (pure reason) এবং ব্যবহারিক বিচারশক্তি (practical reason)। তিনি বিবেককে ব্যবহারিক বিচারশক্তি বলে বিবেচনা করেছেন। বিবেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বোচ্চ

নৈতিক নিয়ম আমাদের নিকট ব্যক্ত করে। এই নৈতিক নিয়ম অভিজ্ঞতালব্ধ নয়- অভিজ্ঞতাপূর্বক এবং স্বতঃসিদ্ধ। এই সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়মের প্রেক্ষিতেই কোনো কাজের ভালো-মন্দ, ঠিকি-অনৌচিত্য বিচার করা হয়। যে কাজ এই নৈতিক নিয়মের বিরোধী সেই কাজ অনুচিত। কোনো কাজের ফলাফল দেখে কাজটির নৈতিক গুণাগুণ বিচার করা যায় না, কর্তার মনের অভিপ্রায়ই কাজের নৈতিক গুণের প্রকৃত নির্ধারক। কান্টের বিচারবাদ এক ধরনের দার্শনিক বা বুদ্ধিমূলক স্বজ্ঞাবাদ। এই মতবাদ অনুসারে নৈতিক নিয়ম (moral law) হলো নৈতিক আদর্শ, যার প্রেক্ষিতে কাজের ভালো-মন্দ, ঠিকি-অনৌচিত্য নির্ধারিত হয়।

নৈতিক নিয়ম ছাড়া আরো দুই প্রকার নিয়মের সাথে মানুষ পরিচিত। যথা— রাষ্ট্রীয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম। রাষ্ট্রীয় নিয়ম কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রকৃতির নিয়ম প্রাকৃতিক ঘটনার বিবৃতি।

কান্ট ত্রিবিধ আদেশের (imperatives or comands) উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) শর্তাধীন আদেশ (Hypothetical imperative), (২) উক্তিমূলক আদেশ (Assertorial imperative) এবং (৩) শর্তহীন আদেশ (Categorical imperative)।

শর্তাধীন আদেশ হলো কোনো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আদেশ। এই আদেশের মধ্যে শর্ত বিদ্যমান। যেমন, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য রক্ষা করতে চায় তাকে স্বাস্থ্যের নিয়মসমূহ পালন করতে হয়। শর্তবিহীন আদেশ বিনা শর্তে পালনীয়। শর্তবিহীন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোনো উদ্দেশ্য সাধন কিংবা সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের তাগিদ নেই।

শর্তহীন আদেশ(Categorical Imperative)

কান্টের মতে, বিবেক আমাদের ওপর যে আদেশ চাপিয়ে দেয় তা হলো শর্তহীন আদেশ। বিবেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক নিয়ম উপলব্ধি করে। এটা বিবেকের হুকুম। এই আদেশ আপনা-আপনি আমাদের ওপর চেপে বসে, কোনো উদ্দেশ্য বা ফল লাভের ইঙ্গিত না করেই আমাদেরকে আদেশ পালনে বাধ্য করে। শর্তাধীন ও উক্তিমূলক আদেশ উদ্দেশ্য সাপেক্ষ; কিন্তু শর্তহীন আদেশ উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ। এই আদেশ অভিজ্ঞতাপূর্ণ এবং সর্ব অবস্থায় অবশ্য পালনীয়। এই নিয়মের প্রকৃতি সম্পর্কে ম্যাকেনজির উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, “সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম তা যাই হোক না কেন, তার আদেশ নিরপেক্ষভাবেই আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয় এবং তা কোনো প্রশ্নকেই আমল দেয় না। যা আমাদের করা উচিত, তা আমাদের করা উচিত। এমন কোনো উচ্চতর নৈতিক নিয়ম নেই যা শর্তহীন আদেশকে নাকচ করে দিতে পারে।

নৈতিক নিয়ম শর্তহীন আদেশ। কারণ এই আদেশ পালন করার শক্তি আমাদের আছে। কান্ট বলেন, “তোমার করা উচিত মানে তুমি করতে পার” (Thou oughtest menas thou canst)। এই আদেশ সকল মানুষের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য।

কান্টের মতে, সৎ ইচ্ছাই (সদিচ্ছা) একমাত্র কল্যাণকর। তিনি বলেন, “এই জগতে কিংবা এই জগতের বাইরে এমন কিছু নেই যা সৎ ইচ্ছা এই গুণ বা বিশেষণ ব্যতিরেকে কল্যাণকর বলে অভিহিত হতে পারে।” এবং সৎ ইচ্ছা বিনা শর্তেই কল্যাণকর; বিনা শর্তেই সৎ ইচ্ছা নিজ গুণেই সৎ।

কান্টের এই নৈতিক নিয়মের আকার আছে; কিন্তু বস্তু নেই। এটা নির্দেশ করে আমাদের কি করা উচিত নয়; আমাদের কি করা উচিত তা নির্দেশ করতে পারে না। শর্তহীন আদেশ উপাদানবর্জিত আকার মাত্র (The categorical imperative is a pure form devoid of matter)।

কান্ট নৈতিক নিয়ম বা শর্তহীন আদেশকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য এই স্বতঃসিদ্ধগুলি প্রদান করেছেন-

(১) “এমন নিয়মানুসারে কাজ করো, যে নিয়মকে একটি সর্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে ইচ্ছা করতে পারো।”

"Act only on that maxim which thou canst at the same time will to become a univesal law."

Kant

(২) “এমনভাবে কাজ কর, যাতে তুমি নিজেকে বা অন্য কোনো মানুষকে কোনো এই সময় উপায় হিসাবে মনে না করে সর্বদা উদ্দেশ্য হিসাবেই গ্রহণ করবে”

মানুষ নিজেই উদ্দেশ্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। আত্মহত্যা অনুচিত কাজ, কেননা তা মানবতার আদর্শের পরিপন্থী। আত্মহত্যার বেলায় মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে অমর্যাদা করে। আবার ক্রীতদাস প্রথাও সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা মানুষ ক্রীতদাসকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে মনে করে।

"So act as to treat humanity whether in thine own person or in that of any other, always as an end never as a means. " - Kant

(৩) "আদর্শ সমাজের সভ্য হিসাবে কাজ সম্পাদন করা।"

" Act as a member of a kingdom of ends"

অধিকার ও কর্তব্য(Rights and Duties)

সমাজস্বীকৃত ব্যক্তির নৈতিক দাবিকে বলা হয় অধিকার। আর কর্তব্য হলো সমাজস্বীকৃত ব্যক্তির নৈতিক বাধ্যতাবোধ। অর্থাৎ নৈতিক বাধ্যতাবোধ হলো কর্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির জন্য কতকগুলি নৈতিক অধিকার আছে। এই অধিকারসমূহ যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় সে দেকে লক্ষ রাখাও তাদের কর্তব্য। অধিকারের সাথে নৈতিক বাধ্যতাবোধ বা কর্তব্যবোধ জড়িত। যেখানে অধিকার আছে, সেখানে কর্তব্যবোধও আছে। অধিকার আছে অথচ কর্তব্য নেই এমন হয় না। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সাপেক্ষ, একটিকে ছাড়া অন্যটিকে বুঝা যায় না। প্রত্যেক অধিকারের সাথে এক একটি কর্তব্য সম্পৃক্ত রয়েছে।

সমাজের বাইরে মানুষের কোনো অধিকার ও কর্তব্য নেই। আমরা সমাজে বাস করি বলে সমাজের সভ্য হিসাবে কতকগুলি অধিকার পাই। যেমন, বাঁচার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি। সমাজের বাইরে আমরা কোনো অধিকার দাবি করতে পারি না। এই অধিকার আমাদের ওপর কতকগুলি কর্তব্য চাপিয়ে দেয়। যেমন, আমার বাঁচার অধিকার আছে, তেমনি অন্য লোক বেঁচে থাকুক বা অন্যকে মরতে বাধ্য না করা আমার কর্তব্য। গ্রিন বলেন, “কোনো সমাজের সভ্য হওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তির কোনো অধিকার থাকতে পারে না। সমাজের সদস্যরা মিলিত হয়ে তাঁদের আদর্শ হিসাবে সার্বিক কল্যাণ মেনে নেয়, যা সকলের জন্যই প্রযোজ্য।” No one can have a right except (1) as a member of a society and (2) of a society in which some common good is recognised by the members of the society as their won ideal good, as that which should be for ich of them."- (Green: Prolegomena of Ethics)

অধিকার শর্ত সাপেক্ষ। সমাজ ব্যক্তিকে দুটি শর্তে অধিকার দান করে। একদিকে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিনা বাধায় তাঁর অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

মানুষের অধিকার(Rights of Man)

- (ক) বাঁচার অধিকার (right of live)
- (খ) কাজের অধিকার (right to work)
- (গ) স্বাধীনতার অধিকার(right to freedom)
- (ঘ) সম্পত্তির অধিকার (right to property)
- (ঙ) শিক্ষার অধিকার (right to education)
- (চ) চুক্তির অধিকার (right of contract)

কর্তব্য সম্পর্কে ব্রাডলির ধারণা Bradely's Conception of Duties

যখন কোনো ব্যক্তি তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তার কর্তব্য সম্পাদন করে, তখন সে তার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সার্বিক কল্যাণ উপলব্ধি করে। কাজেই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী কাজ করা। সমাজের অবস্থান অনুসারে মানুষের কর্তব্য নির্ধারিত হয়।

মানুষের তিন ধরনের কর্তব্য আছে। যথা- সাধারণ কর্তব্য, বিশেষ কর্তব্য এবং অবস্থান পরিবর্তনজনিত কর্তব্য। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি আমাদের সাধারণ কর্তব্য। আবার সমাজের বিশেষ স্থান অধিকার করার জন্য আমাদেরকে কতকগুলি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। যেমন, শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীর ভাবনা, কল্পনা ও মননশীলতার বিকাশ সাধন করা, তাকে মনুষ্যত্বে বিকশিত হতে সাহায্য করা। আবার কাজ বা অবস্থান পরিবর্তনের জন্য আমাদের ওপর নতুন কর্তব্য চেপে বসে। যখন জননেতা মন্ত্রী হন, তখন তাঁকে পরিবর্তিত অবস্থান অনুসারে নতুন কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়।

কর্তব্যের শ্রেণীবিন্যাস (classification of duties)

কর্তব্য প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- (ক) আত্মকেন্দ্রিক কর্তব্য, (খ) পরকেন্দ্রিক কর্তব্য এবং (গ) খোদায়ী কর্তব্য।

(ক) আত্মকেন্দ্রিক কর্তব্য (duties to self) :

মানুষের নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য। যেমন- (১) দৈহিক কর্তব্য, (২) অর্থনৈতিক কর্তব্য, (৩) জ্ঞানমূলক কর্তব্য (৪) সৌন্দর্যমূলক কর্তব্য এবং (৫) নৈতিক কর্তব্য।

(১) দৈহিক কর্তব্য (physical duty) : যেমন-আত্মসংরক্ষণ, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া, বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। মানুষের আত্মহত্যার অধিকার নেই। কারণ দেহ শুধু তার নিজের সম্পত্তি নয়, সমাজের সকলেই সম্পত্তি। দেহ আমাদের সর্বপ্রকার উন্নতির মূল। দেহ সুস্থ, প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের কর্তব্য।

(২) অর্থনৈতিক কর্তব্য (economic duty) : মানুষের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তার দৈহিক ও মানসিক উন্নতির দিকে সহায়ক। তাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে, কেননা অর্থের মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য মূল্যবোধ উপলব্ধির পথে সহায়তা লাভ করে।

(৩) জ্ঞানমূলক কর্তব্য (intellectual duty) : ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের জন্য বুদ্ধির অনুশীলন প্রয়োজন, জ্ঞান অপহরণ আবশ্যিক। বুদ্ধির বিকাশ সাধন করে, জ্ঞান আহরণ করে আমাদেরকে ব্যক্তিত্বে বিকাশ সাধন করতে হবে। এটা আমাদের জ্ঞানমূলক কর্তব্য।

(৪) সৌন্দর্যমূলক কর্তব্য (aesthetic duty) : মানুষের উচিত তার চেতনাকে শাণিত করে অনুভূতিকে তীব্রতর করা। সৌন্দর্য উপলব্ধি করার এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্য সৌন্দর্যানুভূতি অনুশীলন করতে হবে।

(৫) নৈতিক কর্তব্য (moral duty) : প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনাকে বিচারবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন করে বুদ্ধিময় সত্তাকে উপলব্ধি করা মানুষের নৈতিক কর্তব্য। আত্মসংযম ও আত্মসম্মান অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ নীতিবোধসম্পন্ন সত্তা হতে পারে। কাজেই বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।

(খ) পরকেন্দ্রিক কর্তব্য (duties of other) : মানুষের পরকেন্দ্রিক কর্তব্য বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা- (১) পরিবারের প্রতি কর্তব্য, (২) সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য, (৩) দেশের প্রতি কর্তব্য, (৪) বিশ্বমানবের প্রতি কর্তব্য এবং উদ্ভিদ ও পশুর প্রতি কর্তব্য।

সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য (duties to others in the society) : এই জাতীয় কর্তব্য তিন ধরনের (ক) সত্যনিষ্ঠা, (খ) ন্যায়পরায়ণতা এবং (গ) পরহিতৈষণা।

(গ) খোদায়ী কর্তব্য (duties to God) : নিজেদের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি আমাদের যেমন কতকগুলি কর্তব্য রয়েছে, বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব প্রতিপালক খোদার প্রতিও তেমনি আমাদের কতকগুলি কর্তব্য আছে। বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, সকল চেতনা ও সকল প্রেমের উৎস হিসাবে খোদাকে উপলব্ধি করা মানব জীবনের পরম কর্তব্য। সকলের মাঝে, সকলের সাথে যে পরম খোদার যোগসূত্র রয়েছে তা উপলব্ধি করা।

Moral Pathology:

১. প্রাকৃতিক অনিষ্ট ও নৈতিক অনিষ্ট (natural evil and moral evil) : যে সকল ক্রিয়া মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টাকে নস্যাত করে দেয় তাকে অনিষ্ট বা অকল্যাণ বলা হয়। অনিষ্ট দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা- প্রাকৃতিক অনিষ্ট এবং নৈতিক

অনিষ্ট। প্রাকৃতিক অনিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া, এটা প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর নির্ভরশীল। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যায়, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, কীটপতঙ্গের উপদ্রব প্রভৃতি প্রাকৃতিক অনিষ্ট।

পক্ষান্তরে, নৈতিক অনিষ্ট (moral evil) মানুষের ইচ্ছা নির্ভর। মানুষের ইচ্ছাকৃত নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন থেকে নৈতিক অনিষ্টের উত্তর হয়ে থাকে। নৈতিক অনিষ্ট মানুষের ইচ্ছানির্ভর এবং এটা নৈতিক বিচারের অধীন।

২. ভ্রান্তি (error) :

বুদ্ধিগত ভুলকে ভ্রান্তি বলা হয়। এটা নৈতিক অনিষ্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুদ্ধির সাথে ভ্রান্তির যোগসূত্র; বুদ্ধির বৈঠক প্রয়োগই ভ্রান্তির কারণ। ভ্রান্তি নৈতিক অনিষ্ট বা পাপ নয়। কারণ ভ্রান্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক কোনো নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না। কিন্তু যে ভ্রান্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তাঁ নৈতিক অনিষ্ট বলে গণ্য করা হয়। ভ্রান্তি নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভ্রান্তি ইচ্ছাকৃত নয়, বিচার- বিবেচনার অভাবজনিত

৩. অসদাচার (vice) :

vice কথাটি লাতিন vitium শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ হলো দোষ বা কলঙ্ক। অসদাচার বলতে মন্দ ইচ্ছা বা প্রবণতাকে বুঝায়। স্বেচ্ছায় নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করার অভ্যাস থেকে অসদাচার জন্মে থাকে। সততা যেমন চরিত্রের উৎকর্ষ, অসদাচার তেমনি চরিত্রের অপকর্ষ। সততা ও অসদাচার উভয়ই জীবনের ভিতরের দিক। কিন্তু পাপ ও অপরাধ তার বাইরের দিক।

৪. পাপ ও অপরাধ (sin and crime)

স্বেচ্ছাকৃতভাবে কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের নাম পাপ। অসদাচার অন্যায় কাজে পরিণত হলে তাকে বলা হয় পাপ। স্বেচ্ছায় ন্যায়সঙ্গত কাজ পরিহার করা যেমন পাপ, স্বেচ্ছায় অন্যায় কাজ করাও তেমনি পাপ। ভ্রান্তি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমার যোগ্য। কাজেই স্বেচ্ছায় নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাকে আমরা পাপী বলি; কিন্তু ভ্রান্তি প্রমাদের জন্য কোনো ব্যক্তিকে আমরা পাপী বলি না।

অপরাধ (crime) : অপরাধ কথাটি সাধারণত পাপ (Sin) কথা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপরাধ হলো সেই সমস্ত মন্দ কাজ যা সমাজের বিরুদ্ধে করা হয়, যে কাজসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ এবং যার জন্য অপরাধীকে শাস্তি পেতে হয়। সব ধরনের পাপকে অপরাধ বলা যায় না; শুধু যে পাপকাজসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ সেই কাজগুলি অপরাধ পদবাচ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অকৃতজ্ঞতা অপরাধ নয়- এটা পাপ। কোনো ব্যক্তির অকৃতজ্ঞতার জন্য কোনো রাষ্ট্রই তাঁকে সাজা দিতে পারে

৫. শাস্তি (punishment)

ম্যাকেনজি বলেন যে, পাপ সর্বদা অনিষ্টকর পরিণাম ডেকে আনে এবং এই অনিষ্টকর পরিণাম দূরীভূতকারীর ওপর ক্রিয়া করে। আমরা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করি যে, কাজ অনুসারে মানুষের ফল ভোগ করতে হবে। আমাদের বিচারবুদ্ধি বলে যে, পুণ্যবানের জন্য পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের জন্য পাপীর শাস্তি পাওয়া উচিত।

শাস্তি সম্পর্কীয় মতবাদসমূহ (theories of punishment)

অপরাধীকে কেন শাস্তি প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে তিনটি মতবাদ উপস্থিত করা হয়েছে। যথা- (ক) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ, (খ) সংশোধনাত্মক মতবাদ এবং (গ) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ।

(ক) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ (The preventive or the deterrent theory) : এই মতবাদ অনুযায়ী শাস্তিদানের উদ্দেশ্য হলো অপরাধজনক কাজ প্রতিরোধ করা। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় এই কারণে যে, মানুষ যেন অনুরূপ অপরাধজনক কাজ থেকে বিরত থাকে। কাজেই অপরাধ প্রতিরোধ করাই শাস্তিদানের মূল্য লক্ষ্য। উপযোগিতা নীতির (The principle of utility) উপর এই মতবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিচারকের সুপ্রসিদ্ধ অনুশাসন বাক্যের মধ্যে শাস্তিদানের মূল লক্ষ্য ব্যক্ত

হয়েছে; “ভেড়া চুরি করার জন্য নয়, বরং যাতে আর ভেড়া চুরি না হয় সেই জন্যই তোমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।” "You are punished not for stealing sheep but in order that sheep may not be stolen."

এই মতবাদ মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে। এই মতবাদ অনুসারে কোনো অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এই জন্য যে, অন্য কোনো লোক যেন অনুরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধ না করে। শাস্তির মাধ্যমে মানুষের মনে ভীতি উৎপাদন করে অপরাধ থেকে তাকে বিরত রাখাই প্রতিরোধাত্মক মতবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সমালোচনা : এই মতবাদ অপরাধীকে উদ্দেশ্য হিসাবে মনে না করে উপায় হিসাবে মনে করে। অপরাধী মানুষ, মানুষ বস্তু নয়- ব্যক্তি। মানুষ আত্মসচেতন, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম সত্তা অর্থাৎ মানুষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কাজেই কোনো মানুষকে অপরের মঙ্গলের জন্য উপায়রূপে গণ্য করা উচিত নয়। কোনো মানুষকে জড় বস্তু হিসাবে, অপরের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। ম্যাকেনজি বলেন, “এটা (এই মতবাদ) মানুষকে বস্তুরূপে, শুধু উপায় হিসাবে গণ্য করে- উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করে না। এই মতবাদের সপক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, অপরাধীকে যে শাস্তি দেওয়া হয় তাতে অনেক সময় সে অনুরূপ অপরাধজনক কাজ করা থেকে বিরত থাকে, কাজেই এটা তার নিজের ও সমাজের কল্যাণ হিসাবে কাজ করে।

(খ) সংশোধনাত্মক মতবাদ (The reformatory or the educative theory) : এই মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তার চরিত্র সংশোধন করা এবং ভবিষ্যতে তাকে অনুরূপ অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখা। এখানে অপরাধীকে অন্যের কল্যাণের উপায় হিসাবে গণ্য করা হয় না। এই মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির লক্ষ্য অপরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা নয় কিংবা অন্যায়কারীকে অন্যায় কাজের জন্য সাজা দেওয়া নয়; বরং অপরাধীকে সংশোধন করাই শাস্তির লক্ষ্য। ম্যাকেনজি বলেন যে, বর্তমান যুগে এই মতবাদ বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়। কারণ এই যুগের মানবোচিত মনোভাবের সাথে এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমানকালে সংশোধনাত্মক মতবাদ খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রত্যেক অপরাধজনক কাজের মূলে রয়েছে মানসিক অস্বাভাবিকতা, মনোবৈকল্য বা দৈহিক ত্রুটি। কাজেই অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়, তার অপরাধ প্রবণতার পশ্চাতে যে দৈহিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলা বর্তমান তারই প্রতিকার করা উচিত। উন্মাদগার বা মানসিক হাসপাতালে অপরাধীদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত। অপরাধ বিজ্ঞান অনুসারে অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন থেকে উদ্ভূত নয়, অপরাধীর সর্বদৈহিক ও মানসিক প্রবণতাই অপরাধের উৎস। কাজেই অপরাধীকে শুধু তার অপরাধের জন্য দায়ী করা চলে না, বরং অপরাধীকে সং জীবন- যাপনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

ফ্রয়েড ও তাঁর অনুসারীবৃন্দের মতে অপরাধমূলক কাজ নিবারণের উপায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নয়, মনোসমীক্ষণের সাহায্যে অপরাধের মূল কারণ আবিষ্কার করে তার যথাযথ প্রতিকার করাই অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণের উপায়। তাঁরা বলেন যে, অবাধ মেলামেশা (free mixing), সম্মোহন (hypnosis) প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে অপরাধের কারণ জানতে হবে এবং তা তার চেতনা মনে আনয়ন করে তাকে মানসিক বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে সুস্থ সামাজিক জীবন-যাপনের উপদেশ দিতে হবে। অপরাধী যখন সুস্থ সামাজিক জীবনের আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে পুনর্গঠিত করতে পারবে তখন তার অপরাধপ্রবণতা চিরতরে দূরীভূত হবে।

ম্যাকেনজি পাঁচ প্রকার অপরাধের উল্লেখ করেছেন, যথা- (১) কতকগুলি অপরাধ উন্মত্ততাজনিত; (২) কতকগুলি অপরাধ শারীরবৃত্তীয় ত্রুটিজনিত; (৩) কতকগুলি অপরাধ সাময়িক অবদমনজনিত; (৪) কতকগুলি অপরাধ ভ্রান্তিজনিত ভ্রমাত্মক নৈতিক বিচার থেকে উদ্ভূত এবং (৫) কতকগুলি অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নৈতিক নিয়মভঙ্গজনিত। প্রথমোক্ত চার প্রকার অপরাধ মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার সাহায্যে দূরীভূত করা যায়। কিন্তু শেষোক্ত অপরাধ চিকিৎসার বহির্ভূত। এই শেষোক্ত অপরাধ শাস্তির মাধ্যমেই দূরীভূত করা যেতে পারে।

শাস্তির সংশোধনাত্মক মতবাদ মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে তার সংশোধনের কোনোই সুযোগ থাকে না। অপরাধীকে তাঁর অন্যায় উপলব্ধি করতে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেওয়াই শাস্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(গ) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (The retributive theory) : এই মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির অর্থ হলো দুষ্কৃতকারীকে তার অন্যায় কাজের ফল ভোগ করানো। অপরাধী যে অন্যায় কাজ করে সে অন্যায় শাস্তির মাধ্যমে তারই নিকটে ফিরে যায়। এই মতবাদ ন্যায়বোধের (justice) ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যায় কাজের জন্য প্রতিরোধ গ্রহণই শাস্তির উদ্দেশ্য। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ হলো তার দুষ্কর্মের জন্য তাকে দুঃখ দিয়ে নৈতিক নিয়মের সার্বভৌম মহিমাকে রক্ষা করা। যখন কোনো অপরাধী নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করে, তখন নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে তার অন্যায় কাজের সমুচিত শাস্তি পেতে হয়। অপরাধীর যদি শাস্তি না হয়, তবে নৈতিক নিয়মের কোনো মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও মহিমা থাকে না; নৈতিক নিয়ম ব্যক্তিগত খেলালখুশির ব্যাপারে পর্যবসিত হয়। শাস্তি হলো অপরাধীর লজ্জিত নৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, এটা অপরাধের দোষ-ত্রুটি ধুয়েমুছে ফেলে। অপরাধীর কিংবা সমাজের কল্যাণ সাধন শাস্তির উদ্দেশ্য নয়, নৈতিক নিয়মের সংরক্ষণই শাস্তির উদ্দেশ্য। শাস্তির ধারণা মানুষের ন্যায়বোধ থেকে উৎসারিত। প্রতিশোধাত্মক মতবাদ বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে। অপরাধী যদি অন্যের বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে, তবে রাষ্ট্রও তার বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকারী।

অ্যারিস্টটল শাস্তিকে নেতিবাচক পুরস্কার বলে মনে করেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করেছে সমাজ তাকে পুরস্কার না দিয়ে পারে না। শাস্তিই এই পুরস্কার। কান্টও প্রতিশোধাত্মক মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁর মতে, নিজের কল্যাণ কিংবা সমাজের কল্যাণের জন্য নয়, নৈতিক নিয়ম ভঙ্গের জন্যই অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত। কান্ট বলেন, ফৌজদারী আইন শর্তহীন আদেশ” (The penal law is a categorical imperative), হেগেলও অনুরূপ মতবাদ পোষণ করেন। তাঁর মতে, অপরাধী শাস্তি কামনা করে, এটা তার প্রাপ্য যা সে নিজের কাজের দ্বারা অর্জন করেছে। এটা নেতিবাচক পুরস্কার। নব্য হেগেলীয় ব্রাডলিও মনে করেন যে, শাস্তির জন্যই শাস্তি দেওয়া হয়। অর্থাৎ অন্যায় কাজের পুরস্কার হিসাবেই শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদের দুটি রূপ আছে, যথা- (১) কঠোর (rigoristic) এবং (২) লঘু (mollified)

(১) কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (The rigoristic form of the retributive theory) : এই মতানুসারে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত। অপরাধ যদি গুরুতর হয়, তবে শাস্তিও গুরুতর হওয়া উচিত। আর অপরাধ যদি লঘু হয়, তবে শাস্তিও লঘু হওয়া উচিত। শাস্তি নির্ধারণের ব্যাপারে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনা করার মূল্য নেই। 'চোখের বদলা চোখ' 'দাঁতের বদলা দাঁত'-এই মতবাদের আদর্শ। অপরাধীর মানসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্বিমেখে কেবল অপরাধের বিবেচনার শাস্তি নির্ধারিত হওয়া উচিত। যে অপরাধী কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।

(২) লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (The mollified form of the retributive theory) এই মতবাদ অনুসারে অপরাধীদের শাস্তি নির্ধারণের ব্যাপারে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতেই অপরাধের বিচার করা দরকার। অপরাধী যে অবস্থায় পাপ করেছে, তার বয়স, মানসিক প্রবণতা, অভিপ্রায় প্রভৃতি অবস্থা বিবেচনা করেই তাকে শাস্তি প্রদান করা উচিত। প্রতিশোধাত্মক মতবাদের লঘু রূপটি সন্তোষজনক। কেননা এই মতবাদের ভিত্তি মানুষের ন্যায়বোধ। শাস্তির পশ্চাতে নৈতিক সমর্থন না থাকলে মানুষের পক্ষে শাস্তির ব্যাপারটি মনেপ্রাণে গ্রহণ করা অসম্ভব। শাস্তির তাৎপর্য নৈতিক নিয়মের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। তবে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য যে অংশত প্রতিরোধাত্মক এবং অংশত সংশোধনাত্মক তা অস্বীকার করা চলে না। এই মতবাদের মধ্যে প্রতিশোধের সঙ্গে সংশোধনাত্মক ও প্রতিরোধাত্মক ভাবও রয়েছে। এতে সংশোধনাত্মক ভাব রয়েছে; কেননা শাস্তির মাধ্যমে অপরাধী মনে করে, কৃত অন্যায়ের জন্যই তাকে ফলভোগ করতে হচ্ছে। কাজেই অপরাধীর মধ্যে অনুশোচনা জাগে, তার সংশোধনের সুযোগ আছে। সেথ বলেন, “প্রকৃত সংশোধন তখনই হয়, যখন কাজের অবশ্যস্বাবী

ফল মনে করে শান্তিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা যায়।” এই মতবাদের মধ্যে প্রতিরোধাত্মক ভাবও বর্তমান। কেননা শান্তি যে নিজের কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই স্বীকৃতি অপরাধীর মনে অপরাধের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং পরোক্ষভাবে অপরাধ নিবারণ করে। এই মতবাদের মধ্যে উপযোগিতা, করুণা এবং ন্যায়বোধ- এই তিনটি নীতিরই সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সুতরাং প্রতিশোধাত্মক মতবাদ সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য।

Topic 10:-

Individual and Society: Egoism, Universalism and Altruism, Justice and Beneficence.

Muslim Philosophy:

Four great medieval Muslim philosophers:

Al-Farabi, IbnSina, Al-Ghazali and Ibn Rushd.

Modern Muslim Philosophers: Shah Waliullah Dehlawi and Muhammad Iqbal.

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে :

- আত্মবাদ, সর্বস্বার্থবাদ ও পরার্থবাদের মূল বক্তব্য, ন্যায়পরতা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মত(বিশেষত The Republic এর সংজ্ঞা গুলো)
- আল ফারাবী, ইবনে সিনা, আল গাজালী ও আল্লামা ইকবাল – এই ৪ জনের দর্শন গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে
- ইবনে রুশদ ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর সাধারণ পরিচিতি ও দর্শনে চোখ বুলিয়ে নিবেন
- মুসলিম দার্শনিকগণের জন্মস্থান,সাল ও লেখা গ্রন্থগুলোর নাম দেখে নিবেন

সোর্স সমূহ:

- সংশ্লিষ্ট বিষয়ের Live mcq lecture pdf
- মুসলিম দর্শন – ড. আমিনুল ইসলাম
- মুসলিম দর্শন পরিচিতি – আব্দুল হাই ঢালী

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ

ব্যক্তি ও সমাজ(Society and the Individual)

নীতিশাস্ত্র মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু এই আচরণ সমাজ বহির্ভূত মানুষের আচরণ নয়, সমাজে অবস্থানকারী মানুষের আচরণ। কেননা সমাজ বহির্ভূত জীব স্বাভাবিক জীব নয়। এ সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেন, “মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব এবং যে মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, সে হয় দেবতী, নয় পশু।” "Man is by nature a social and political animal and a man who is not a member of a state is either a God or a Beast. " - Aristotle

ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (different theories of the relation of the individual to society):

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে কেন্দ্র করে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা- (ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, (খ) সমষ্টিগত বা সমাজতন্ত্রবাদ এবং (গ) ভাববাদ।

(ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) : এই মতবাদ অনুসারে সমাজ হলো স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের যান্ত্রিক সমষ্টি। স্বতন্ত্র ব্যক্তির নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজ গড়ে তুলল। এই হলো বিভিন্ন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির সমষ্টি, এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক বাহ্য- অভ্যন্তরীণ নয়। মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই সমাজ গড়েছিল তাই মানুষ সমাজের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন সত্তা। এই মতবাদ ‘সামাজিক চুক্তিবাদ’ (the social theory) নামে পরিচিত। হবস (Hobbes) লক (Locke), রুশো (Rousseau) প্রমুখ চিন্তাবিদ এই মতবাদের সমর্থক।

হবসের মতে, মানুষ যখন প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত তখন সে ছিল স্বার্থপর, কলহপ্রিয় এবং ক্ষমতালিপ্সু। মানুষ ছিল সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক, নিজের স্বার্থচিন্তায় বিভোর। নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক মানুষ অন্য মানুষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। হবসের মতে সে যুগে মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, কদর্য, পশুতুল্য ও সঙ্কীর্ণ (solitary, poor, nasty, brutish and short)। এই নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতময় অসহনীয় জীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মানুষ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বশে সমাজ গঠন করল।

(খ) সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ (collectivism or socialism) : এই মতবাদ অনুসারে সমাজ হলো একটি জীবদেহ (organism)। প্রাণীর দেহ যেমন পরস্পর নির্ভরশীল কোষের সমবায় গঠিত, তেমনি সমাজও পরস্পর নির্ভরশীল ব্যক্তির জৈবিক সমষ্টি। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ যেমন বিভিন্ন কাজ করে, তেমনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ যেমন পরস্পরের ওপর এবং সমগ্র জীবদেহের ওপর নির্ভরশীল; সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি তেমনি পরস্পরের ওপর এবং সমাজদেহের ওপর নির্ভরশীল। জীবদেহের বিভিন্ন অংশের যেমন কোনো পৃথক সত্তা নেই, সমাজ ব্যতিরেকে ব্যক্তিরও তেমনি কোনো পৃথক সত্তা নেই। জীবদেহের যেমন-জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে, সমাজেরও তেমনি জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজ ছাড়া ব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই, সমাজ ছাড়া ব্যক্তি বাঁচতে পারে না, সমাজের জন্য ব্যক্তি, ব্যক্তির এই জন্য সমাজ নয়। এই মতবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী এই অর্থে যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তি মুখ্য এবং সমাজ গৌণ; আর সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদে সমাজ মুখ্য এবং ব্যক্তি গৌণ।

(গ) ভাববাদ (idealism) : ভাববাদীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদ, উভয় মতবাদই বর্জন করেন। তাঁদের মতে, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক যান্ত্রিক ও নয়, আঙ্গিক ও নয়। সমাজ হলো আত্মসচেতন সত্তার স্বাধীন সংগঠন। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের বৃহত্তম সত্তা হলো আত্মময়, বুদ্ধিময় সত্তা। এই বুদ্ধিময় সত্তা হলো সামাজিক সত্তা। একমাত্র সমাজের মধ্যেই মানুষের বৃহত্তম সত্তার পূর্ণতা সাধিত হতে পারে। সমাজের বাইরে থেকে মানুষ পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। তাই সমাজ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। জন কেয়ার্ড ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে সুন্দর উক্তি করেছেন। তিনি বলেন, “সমাজবহির্ভূত ব্যক্তি প্রকৃত মানুষ নয়, সে মানবতার একটি খণ্ড মাত্র, তার মাঝে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপাদান নেই যা মানব জীবনের সারসত্তা স্বরূপ।”

"The abstract individual (apart from society) is not true man but only a fragment of humanity, a being devoid of moral and spiritual elements which are of the essence of man's life." - John Caird, Introduction to Philosophy of Religion.

এ সম্পর্কে ম্যাকেনজি বলেন, “আধ্যাত্মিক ঐক্যই বোধ হয় এর (সামাজিক ঐক্যের) সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়, এটা হলো এমন একটা ঐক্য যা শুধু আধ্যাত্মিক জীব মানুষই লাভ করতে সমর্থ, ”

"It is perhaps best characterised as spiritual unity. It is a kind of unity of which only spiritual beings i. e. persons could seem to be capable," -Mackenzie, Social philosophy, P-58.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ আধ্যাত্মিক সংগঠন এবং মানুষ এই সংগঠনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে এবং যে বৃহত্তম কল্যাণ সমাজের সমানে রয়েছে সেই কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে কাজ করে।

রুন্টশলী (Bluntschli), গ্রিন (Green), হেগেল (Hegel), ব্রাডলি (Bradley) প্রমুখ দার্শনিক এই মতবাদের সমর্থক। নৈতিক আদর্শ বা দৃষ্টিকোণ থেকে এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির সম্পর্ক, অর্থাৎ সমাজের এক ব্যক্তির সঙ্গে অপরাপর ব্যক্তির নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আত্মবাদ, পরার্থবাদ ও সর্ববাদ নামে যে তিনটি মতবাদ রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো :

আত্মবাদ (Egoism) :

আত্মবাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে নিজের স্বার্থ বা মঙ্গল অনুসন্ধান করা, সমাজের অপর মানুষের স্বার্থ বা মঙ্গল অনুসন্ধান করা নয়। এ মতবাদ মনে করে যে, ব্যক্তির নিজের স্বার্থের চিন্তা ব্যক্তিকেই করতে হবে।

মনস্তাত্ত্বিক আত্মবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে স্বভাবত স্বার্থপর বলে মনে করা হয়ে থাকে। মানুষ সব সময় নিজের স্বার্থকে রক্ষা করে। মনস্তাত্ত্বিক আত্মবাদের সব থেকে সাধারণ রূপ হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ। আত্মবাদের আরেকটি রূপ হচ্ছে নৈতিক আত্মবাদ এ মতবাদ মনে করে যে, প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নিজের স্বার্থ বা মঙ্গল অনুসন্ধান করা উচিত, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত অপর ব্যক্তির মঙ্গল ব্যক্তির নিজের মঙ্গলের পন্থা বা মাধ্যম হিসেবে দেখা না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরের সেই মঙ্গল তার দেখা উচিত নয়।

ক্রটিসমূহঃ প্রথমত, আত্মবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩) বলেন যে, আত্মবাদ আমাদের আত্ম-স্বার্থের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। যে ব্যক্তি অপরের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, সে ব্যক্তি অপরের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেতে পারে না, প্রতিটি ব্যক্তিরই তার নিজের মঙ্গল অর্জনের জন্য অপরের সাহায্যের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, হবস্ (১৫৮৮-১৬৭৯) যদিও মনে করেন যে, মানুষ নিজের মঙ্গল ছাড়া অপর কারও মঙ্গলের অনুসন্ধান করে না, তথাপি তিনি বলেন যে, যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিত্ব অপরের মঙ্গলের দিকে ক্রক্ষেপ না করে কেবল নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করে, সে সময়ে প্রতিটি ব্যক্তির জীবনই হীন, বর্বর ও সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। এদিক থেকে দেখা যায়, আত্মবাদ একটা সন্তোষজনক মতবাদ নয়।

পরার্থবাদ (Altruism) : ব্যক্তির নিজের স্বার্থ বা মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না রেখে সমাজের অপর ব্যক্তির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়াই ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য বলে পরার্থবাদ মনে করে। এ মতবাদ অনুসারে কোন ব্যক্তি যদি সমাজের অপর ব্যক্তির সেবা করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই নিজের স্বার্থের চেয়ে অপর মানুষের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। আত্মবাদ যেখানে আত্ম-স্বার্থের কথা বলে, পরার্থবাদ সেখানে আত্মোৎসর্গের কথাই বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে।

ক্রটিসমূহ : আত্মোৎসর্গের পন্থা সব সময় সঠিক পন্থা নয় বলে এই মতবাদেও বিভিন্ন ধরনের ক্রটি রয়েছে। স্পেন্সার মনে করেন যে, বিশুদ্ধ আত্মবাদের মতো বিশুদ্ধ পরার্থবাদও সাধারণ মঙ্গল খর্ব করে। ব্যক্তি যদি মঙ্গল অনুসন্ধানের সময় তার নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে কেবল অপরের পরিচর্যা বা মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখে, তাহলে তার স্বাস্থ্যহানির ফলে সে নিজেই এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং অপরের সাহায্য করতে অক্ষম হবে।

আসলে আত্মবাদ যেমন একটা চরম মতবাদ, তেমনি পরার্থবাদও একটা চরম মতবাদ। তাই পরার্থবাদ যদিও অপরের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে নৈতিকতার আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে, তথাপি এই মতবাদও সন্তোষজনক মতবাদ নয়।

সর্ববাদ (Universalism) : সমাজের বা দলের সাধারণ স্বার্থ বা মঙ্গল রক্ষা করাকেই ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য বলে সর্ববাদ মনে করে। এ মতবাদ বলে যে, সমাজের অপরাপর ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে তার নিজের স্বার্থ সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে। এদিক থেকে এ মতবাদকে সমন্বয় সাধনের মতবাদও বলা যায়। এ মতবাদ আত্মবাদ ও পরার্থবাদের সত্যিকারের উপাদানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করে, কেননা এ মতবাদ সমাজের মঙ্গলে ব্যক্তির নিজের ও অপরের মঙ্গলকে অন্তর্ভুক্ত করে

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আত্মবাদ, পরার্থবাদ ও সর্ববাদ নামক যে তিনটি মতবাদ এখানে আলোচনা করা হলো, সেই মতবাদগুলো যদিও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়, তথাপি এ তিনটি মতবাদের মধ্যে **সর্ববাদই(Universalism)** মোটামুটিভাবে একটা সন্তোষজনক মতবাদ, কেননা এ মতবাদে আত্মবাদ ও পরার্থবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ মতবাদ একদিকে ব্যক্তিমানুষের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে সমাজের অপরাপর ব্যক্তির দিকেও লক্ষ্য রেখেছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করে।

ন্যায়পরতা(Justice) :

ন্যায়পরতা শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। ন্যায়পরতা বলতে সাধারণত নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করা, সংজীবন যাপন করা, নিজের সঙ্গে সঙ্গে অপরের অধিকার সংরক্ষণ করা, যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দেয়া, কারও অনিষ্ট না করা, দয়া- দাক্ষিণ্য প্রদর্শন ইত্যাদি সদগুণাবলীকে বুঝায়।

প্লেটোর মত : প্লেটো সফ্রেটিসের একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি সফ্রেটিসের জীবনদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। সফ্রেটিস সেই সময়কার এথেন্সের একজন বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি হিসাবে খুবই সুপরিচিত। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার এমন এক ক্রান্তিকালে প্লেটোর “দি রিপাবলিক” (The Republic) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, যার মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল ন্যায়পরতা বলতে আমরা কি বুঝি এবং এই ন্যায়পরতাকে কিভাবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রজীবনে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সিফালাস,থ্র্যাসিমেকাস, পলিমার্কাস প্রমুখ আর সফ্রেটিসের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এবং এরপরে এ ব্যাপারে আলোচনা অগ্রসর হতে থাকে। সিফালাসের মতে, “ন্যায়পরতা হচ্ছে কথা ও কাজে সত্যতা”

Cephalus: "Justice is telling the truth and paying one's debts"

পলিমার্কাসের মতে, “ন্যায়পরতা হচ্ছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব, শত্রুর প্রতি শত্রুতা”

According to Polemarchus, justice can be defined as "doing good to friends and harm to enemies"

"Justice is to give to each what is owed to him"

থ্রেসিমেকাসের(Thrasymachus) মতে, “ন্যায়পরতা হচ্ছে শক্তিমানের স্বার্থ রক্ষা” (Justice is nothing other than the advantage of the stronger)

সফ্রেটিস তাঁদের দেয়া ন্যায়পরতার এসব সংজ্ঞাকে একে একে খণ্ডন করেন এবং ন্যায়পরতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি ন্যায়পরতার সংজ্ঞা দেয়ার আগে রাষ্ট্রের নাগরিকদের শাসক, সৈনিক ও উৎপাদক, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে প্রজ্ঞাকে(reason/wisdom) শাসকের প্রধান সদগুণ, সাহসকে(courage) সৈনিকদের প্রধান সদগুণ এবং সংযম বা মিতাচারকে(temperance) উৎপাদক শ্রেণীর প্রধান সদগুণ বলে অভিহিত করেন। এরপরে তিনি বলেন যে, ন্যায়পরতা এমন এক নীতি (principle), যার স্বরূপ রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতিটি শ্রেণী অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ কর্তব্য কাজ সম্পাদন করার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করাই ন্যায়পরতা। অর্থাৎ তাঁর মতে, রাষ্ট্রের এই তিন শ্রেণীর নাগরিকদের সঙ্গতির মধ্যেই ন্যায়পরতা নিহিত। মূলত সফ্রেটিসে সংলাপের মাধ্যমে প্লেটো তার নিজের বক্তব্যই তুলে ধরেছেন।

অনুরূপভাবে তিনি ব্যক্তিমানুষের আত্মাকে প্রজ্ঞাংশ, শৌর্য্যাংশ/বীর্যংশ ও কামনাংশ,(part of reason,courage and appetite/desire) এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে ন্যায়পরতার অধিষ্ঠান দেখান। তাঁর মতে, আত্মার প্রজ্ঞাংশের প্রধান সদগুণ প্রজ্ঞা, শৌর্য্যাংশের প্রধান সদগুণ সাহস এবং কামনাংশের প্রধান সদগুণ সংযম। ব্যক্তিমানুষের আত্মার মূল উপাদানগুলো, অর্থাৎ সংযম, সাহস ও প্রজ্ঞা, এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্কের একত্ব ও সঙ্গতির মধ্যেই ন্যায়পরতা নিহিত। এভাবেই প্লেটো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রজীবনে ন্যায়পরতাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। আর এভাবেই প্রজ্ঞা, সাহস, সংযম ও ন্যায়পরতা, এ চারটি মৌলিক সদগুণ প্লেটোর যুক্তিতে প্রধানত একটি সদগুণে পরিণত হয়, যা প্রজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন।

অন্যান্য নীতিদার্শনিকের মত : অ্যারিস্টটল ন্যায়পরতাকে একটি সদগুণ বলে ধরে নিয়েছেন। আবার একে সদগুণের সমন্বয় বলেও মনে করেছেন। মিল তাঁর Utilitarianism গ্রন্থে ন্যায়পরতা সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় তিনি ন্যায়পরতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন যে, ন্যায়পরতা হচ্ছে কতকগুলো নৈতিক আবশ্যিকতার একটি নাম। সমকালীন নীতিদার্শনিক রলস্ (Rawls) তাঁর Theory of Justice গ্রন্থে ন্যায়পরতাকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সদগুণ বলে উপস্থাপন করেন।

ন্যায়পরতার বিভিন্ন রূপ রয়েছে এবং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপ হলো সামাজিক (social) ন্যায়পরতা, ব্যষ্টিক (distributive) ন্যায়পরতা ও সংশোধনমূলক (corrective) ন্যায়পরতা।

Four great medieval Muslim Philosophers

আল ফারাবী

আবু নহর মুহম্মদ অল- ফারাবী, ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের ফারাব শহরে তাঁর জন্ম হয়। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে সম্ভবত তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও একজন মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আবার পরবর্তী মুসলিম দার্শনিকদের শিক্ষক হিসেবেও আখ্যায়িত। বলা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় ৭০টি ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন। ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৮০ বছর বয়সে দামেস্কে আল-ফারাবী মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : আল মাদিনাহ, তাহসীল- আল সায়াদাহ ইত্যাদি

তার দর্শন:

আল-ফারাবী এ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তা-ধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ্যারিস্টটলের দর্শন ও তাঁর রচনাবলীর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ দখল ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং এ কারণেই, তাঁকে বলা হতো **দ্বিতীয় এ্যারিস্টটল**

তিনি প্লেটোর দর্শনকে এ্যারিস্টটলের দর্শনের সঙ্গে সমন্বিত করার চেষ্টা করেন। ফারাবীর মতে, দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা অর্জন। তাঁর মতে, আত্মার বিশুদ্ধিকরণ ব্যতিরেকে দর্শনচর্চা সম্ভব নয়। চরম সত্যানুসন্ধানের খাতিরেই সংকীর্ণতা বর্জিত উদার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন

আল-ফারাবী দর্শন পাঠের ওপর কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি শিক্ষার্থীকে দর্শন অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। দর্শন চর্চার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে গণিতের মত যুক্তিবিদ্যার জ্ঞানও অপরিহার্য।

ফারাবী মুতাযিলা ও ফালাসিফা- উভয় সম্প্রদায়ের মতবাদের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, মুতাযিলারা একধরনের নির্বিচারবাদী। তাঁরা কোন রকমের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই তাদের মতবাদের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। অপরদিকে, ফালাসিফা' সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ শুধু অবভাসিক জগতের স্বরূপ সন্ধানে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেছেন; কখনও অতীন্দ্রিয় জগতের সত্তা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন নি।

ফারাবীর দার্শনিক চিন্তা তাই নিম্নোক্ত ক্রম অনুযায়ী বিবর্তিত হয় : (i) যুক্তিবিদ্যা, (ii) অধিবিদ্যা, (iii) নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

যুক্তিবিদ্যা

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল-ফারাবী ছিলেন প্রথম যুক্তিবিদ এবং নিঃসন্দেহে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিদদের অন্যতম। তাঁর মতে, যুক্তিবিদ্যা শুধু বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিশ্লেষণই নয়। ব্যাকরণগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাও যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। তবে ব্যাকরণ ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাকরণ মানবগোষ্ঠীর ভাষার সঠিকতা নিরূপণ করে। অথচ, যুক্তিবিদ্যা গোটা মানবজাতির ভাষাগত প্রকাশকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

ফারাবীর মতে, যুক্তিবিদ্যা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে ধারণা (ideas) ও সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আলোচনার বিষয় হল অবধারণ (judgements), অনুমান ও প্রমাণ। ধারণা ও বস্তুর মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। ধারণা শুধু মনেই অবস্থান করে। ধারণা আবার দু'রকমের। এদের প্রথম শ্রেণীর ধারণা বস্তুর সরলতম উপাদান। বস্তুর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞান থেকে এর উৎপত্তি এবং আমাদের মনেই এর প্রতিফলন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা মনের সহজাত (innate) ধারণা ; জন্ম থেকেই আমাদের মনে মুদ্রিত হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ-লব্ধ ধারণার সাথে এদের কোন মিল নেই। এগুলো আমাদের চেতনায় স্বজ্ঞাতাবস্থায় (intuitively) প্রতীয়মান হয়।

যুক্তিবিদ্যার কাজ হচ্ছে - প্রতিষ্ঠিত ধারণাবলীর ভিত্তিতে কোন নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, যা পূর্বে জ্ঞাত ছিল না। অর্থাৎ জানা থেকে অজানা বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে যুক্তিবিদ্যার কাজ। কাজেই, উচ্চতর স্তরে যুক্তিবিদ্যা সার্বিক বা মূর্ত সত্যের আলোচনায় পর্যবসিত হয় এবং এ পর্যায়ে, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

এখানে ফারাবীর চিন্তাধারা ভাববাদী ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুক্তিবিদ্যা দর্শন থেকে ভিন্নতর কিছু নয়, বরং দর্শনের পরিপূরক। দর্শন মূলত উচ্চতর যুক্তিবিদ্যা।

আল-ফারাবী তাঁর যুক্তিবিদ্যায় অনিবার্য সত্য (necessary truth), সম্ভাব্য সত্য (possible truth), সার্বিক (universals) ও বিশেষ (particulars) প্রভৃতি প্রত্যয়-সমূহের বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, অনিবার্য অস্তিত্বের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সম্ভাব্য অস্তিত্বের জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না। তারপর, বিশেষ ও সার্বিকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বিশেষ বস্তুসমূহ (particulars) শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মধ্যে বিরাজ করে না, চিন্তনেও অস্তিত্বশীল। মানুষের মন বিশেষ থেকে সার্বিক ধারণায় উপনীত হতে পারে; তবে এর অর্থ এই নয় যে এই সত্যে উপনীত হবার আগে সার্বিকের ধারণার অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সার্বিকসমূহ শুধু নিছক মানসজাত প্রতীতি (conception) নয় বরং বিশেষ বস্তুর মধ্যে এদের বাস্তব সত্তাও রয়েছে। তবে, সার্বিকের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফারাবী বলেন যে, সার্বিকসমূহ হচ্ছে মূলত অস্তিত্ববিহীন সত্তার অধিকারী। তাঁর মতে, “অস্তিত্ব ছাড়াও একটি বস্তু বাস্তব হতে পারে। আসলে অস্তিত্ব মাত্রই বস্তুর এক ধরনের সম্বন্ধ।” প্রসঙ্গত, ফারাবীর এই মতের সাথে কান্টের দেশ-কাল বিষয়ক মতের সাদৃশ্য রয়েছে।

অধিবিদ্যা

যুক্তিবিদ্যার ন্যায়, অধিবিদ্যায়ও আল-ফারাবী মৌলিক চিন্তা ধারার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর মতে, সত্তা দু'রকমের—সম্ভাব্য ও অনিবার্য। প্রত্যেক সম্ভাব্য সত্তার একটি কারণ রয়েছে—যে কারণ থেকে ঐ সত্তার উদ্ভব। এই কারণটি আবার পূর্ববর্তী একটি কারণ থেকে উদ্ভূত। এভাবে প্রত্যেকটি সম্ভাব্য সত্তা এবং এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত এমন একটি আদি কারণে উপনীত হই, যার পেছনে আর কোন কারণ থাকে না। আমরা এখানে এমন এক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হই, যা স্ব-কারণিত (self-caused)। এটি একটি একক, স্বয়ং-সংঘটিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা এবং অপরিবর্তনীয় ও সর্বোচ্চ পূর্ণতার অধিকারী। ফারাবী এই আদি কারণকে অনিবার্য সত্তা (necessary Being) বলে অখ্যায়িত করেছেন। এই সত্তা, তাঁর মতে, এক ও অদ্বিতীয়। এটি একাধারে বাহ্য ও আন্তর (external and internal), অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী (immanent and transcendent)। এ পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নয়; কারণ তা নিজেই তার অস্তিত্বের ভিত্তি ও বড় প্রমাণ।

এই আদি কারণ বা পরমসত্তাকেই আমরা আল্লাহ বলি। তাঁর মধ্যে জগতের সকল বস্তু একীভূত হয়ে থাকে। আদি সত্তার বা আল্লাহর কোন সংজ্ঞা দেয়া যায় না। ফারাবীর মতে মানুষ সীমিত বুদ্ধির অধিকারী, এই সীমিত বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ অসম্ভব। তবে, তাঁকে যে একেবারে জানা অসম্ভব, তাও নয়। তিনি অজ্ঞেয় হলেও অনিবার্য এবং জগতের সবকিছুর মধ্যে বিরাজমান। কাজেই, জাগতিক বস্তু বা ঘটনাবলীর জ্ঞান থেকেই আল্লাহকে জানা সম্ভব। এককথায়, 'সরাসরি জানা না গেলেও, জীব ও জগতের জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে জানা যায়। এভাবে, ফারাবী আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারে সর্বশ্রববাদী ধারণায় উপনীত হন।

ফারাবী উচ্চতম থেকে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে, আল্লাহই আদি সত্তা। তিনি অনাদি এবং অনন্তকাল থেকে অস্তিত্বশীল। এর পরের সত্তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতিকৃতি (image)। এটি আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি এবং প্রথম সৃষ্ট চিদাত্মা (spirit)। অনন্তকাল থেকেই এটি আল্লাহ থেকে উৎসারিত। তারপর, প্রথম চিদাত্মা থেকেই পরপর সৃষ্ট হয়েছে নভোমণ্ডলের (heavenly bodies) আটটি চিদাত্মা। এ আটটি চিদাত্মা থেকেই আবার সৃষ্ট হয়েছে সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক মণ্ডল। ফারাবীর প্রথম চিদাত্মা সমেত সর্বমোট এ ন'টি চিদাত্মাকে স্বর্গীয় দূত বা ফেরেশতা বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, সত্তার দ্বিতীয় স্তর এ সকল চিদাত্মার সমবায় গঠিত। সত্তার তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে যথাক্রমে প্রজ্ঞা ও আত্মা, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তরে রয়েছে যথাক্রমে আকার ও জড়ের অবস্থান। শেষ স্তরে অর্থাৎ ষষ্ঠ স্তরে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের অনুক্রম (order) সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, এ ছ'টি স্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সত্তাসমূহ (যথা—আল্লাহ, সৌরমণ্ডলসমূহ এবং প্রজ্ঞা) বিশুদ্ধ চিদাত্মা হিসেবে পরিগণিত; কিন্তু শেষের তিনটি স্তর (যথা—আত্মা, আকার ও জড়) অশরীরী হলেও শেষ পর্যন্ত দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

চিদাত্মার মত, দেহকেও তিনি ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেন। এ ছয়টি স্তর হচ্ছে - স্বর্গীয় দেহ, মানবীয় দেহ, ইতর প্রাণীর দেহ, উদ্ভিদের দেহ, খনিজ পদার্থের দেহ এবং অপরাপর বস্তুর দেহ।

ফারাবীর মতে, জগতের সৃষ্টি একটি চিরন্তন ও বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া। প্রথমত, আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে সৃষ্টি করলেন আদি বুদ্ধি (First Intellect), যা স্রষ্টা ও নিজ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম। আদিবুদ্ধি থেকে তারপর বিকীর্ণ (emanated) হল দ্বিতীয় বুদ্ধি - যা থেকে সৃষ্টি হল দূরবর্তী নভোমণ্ডল। এরপর দ্বিতীয় বুদ্ধি থেকে বিকিরণ হল তৃতীয় বুদ্ধি এবং সৃষ্টি হল নক্ষত্রমণ্ডল। এভাবে ধাপে ধাপে উদ্ভব হল চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা থেকে যথাক্রমে সৃষ্টি হল - শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহসমূহ।

সর্বনিম্নে অবস্থিত আদি জড় এবং এর ওপরে রয়েছে চারটি আদি উপকরণ। এ চারটি উপকরণ হচ্ছে ক্রমানুযায়ী খনিজদ্রব্য, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ। উল্লেখ্য, মানুষের মধ্যে প্রথম যে বৃত্তিটিকে বিকশিত হয়, তা হচ্ছে উদ্ভিদ বৃত্তি এবং পরই তার মধ্যে ক্রমানুযায়ী বিকাশ লাভ করে সংবেদন, কামনা, বীর্য ও প্রজ্ঞাজাত বৃত্তিসমূহের।

আল-কিন্দীর মত, ফারাবীও প্রজ্ঞাজাত বৃত্তিকে সুপ্ত বুদ্ধি, সক্রিয় বুদ্ধি, চালক বুদ্ধি ও অর্জিত বুদ্ধি - এ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রতিটি উচ্চতর বৃত্তি তার নিম্নতর বৃত্তির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম বৃত্তিটিই হচ্ছে সুপ্তবুদ্ধি যার সাহায্যে মানুষ বস্তু হতে বস্তুর গুণ পৃথক করে থাকে। দ্বিতীয় বৃত্তির নাম সক্রিয় বুদ্ধি (active intellect) যা প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিকে সক্রিয় করে তোলে। তৃতীয় বৃত্তির নাম চালক বুদ্ধি (agent intellect)। এটি এমন এক আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি, যা মানুষের সুপ্ত বা সম্ভাব্য শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে সক্রিয় করে। চতুর্থ ও শেষ বৃত্তিটিকে বলা হয় অর্জিত বুদ্ধি - যা তৃতীয় বৃত্তি অর্থাৎ চালক বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ অর্জন করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, চালক বুদ্ধি আল্লাহ থেকে সরাসরি মানবদেহে প্রবিষ্ট হয়। এটি মৃত্যুর পর আবার তার আদিনিবাসে প্রত্যাবর্তন করে এবং পুনরায় মিশে যায় তার উৎসের সাথে। বলা বাহুল্য, ফারাবীর এ মতানুযায়ী, আত্মার অমরত্ব স্বীকার করা হয়েছে বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত অমরত্ব বলতে যা বোঝায় - এ মত গৃহীত হলে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন

ফারাবী ছিলেন একজন বুদ্ধিবাদী মুসলিম দার্শনিক। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তাঁর নৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে তাই ইসলামের মূল শিক্ষাসহ প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তার প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

(i) **নীতি দর্শন** : নৈতিকতার ক্ষেত্রে ফারাবী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রজ্ঞাই নৈতিক মানদণ্ড। অর্থাৎ প্রজ্ঞার সাহায্যেই আমরা কাজের ভাল-মন্দ, ন্যায্য-অন্যায্য নিরূপণ করে থাকি। তাঁর মতে নৈতিক জ্ঞানই হচ্ছে সর্বোচ্চ জ্ঞান। ফারাবীর মতে, নৈতিক জীবনের মূল বিষয় হচ্ছে শান্তি অর্জন। ফারাবীর নীতিবিদ্যায় শান্তি কথাটি ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক শান্তির অর্থে ব্যবহৃত। শুভ পরিণতিই হচ্ছে শান্তি। ফারাবীর মতে, শান্তি হল জীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য। শান্তি হচ্ছে সর্বোত্তম শুভ এবং সর্বোত্তম পরিপূর্ণতা। শান্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিনা বিচারেই শুভ। ইহা জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। তাঁর মতে, মানুষ সদগুণ (virtue) অর্জনের মাধ্যমে শান্তি লাভ করতে পারে। প্লেটোকে অনুসরণ করে তিনি বলেন যে, সদগুণের অধিকারী দার্শনিকেরাই কেবল শাসক হওয়া উচিত। তাঁর মতে, সদগুণের অধিকারী ব্যক্তিবর্গই শুধু পরকালের শান্তি ভোগ করবেন।

রাষ্ট্র দর্শন

আল-ফারাবীর মতে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। রাষ্ট্রকে তিনি মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করেন। সুষ্ঠু মানবদেহের জন্য একটি হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য অনুষঙ্গী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে যেমন সক্রিয় থাকতে হয়, তেমনি আল-ফারাবী মনে করেন যে, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও প্রয়োজন একজন শাসক ও তাঁর সহযোগী বহু কর্মকর্তা-কর্মচারী। শাসককে অবশ্যই বিজ্ঞ, প্রখর ধী- শক্তিসম্পন্ন, সং, সাহসী ও ন্যায্যপরায়ণ হতে হবে। অর্থাৎ, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে বর্ণিত দার্শনিক রাজার মত তাঁকে অনেক সদগুণের অধিকারী হতে হবে। ফারাবীর মতে, শাসকের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের স্থায়ী কল্যাণ। শাসক অনুপযুক্ত হলে, রাষ্ট্রের কল্যাণ বা উন্নতি সম্ভব নয়।

ফারাবী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির ভিত্তিতে তিনি এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্র থেকে পৃথক করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আদর্শ রাষ্ট্রকে দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র থেকে পৃথক করেন। তিনি চার প্রকারের দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের বিবরণ দেন। তাঁর মতে, এগুলো হচ্ছে -(এক) অজ্ঞতার নগরী; (দুই) একগুয়ে নগরী; (তিন) স্বধর্ম ত্যাগী নগরী এবং (চার) ভ্রান্তিকর নগরী। অজ্ঞতার নগরীকে ফারাবী বর্ণনা করেছেন এমন এক নগরী হিসেবে - যেখানে নাগরিকগণ কখনও যথার্থ সুখ দেখেনও নি, বা অনুসন্ধানও করেননি। একগুয়ে নগরীর অধিবাসীদের আল্লাহ ও মরণোত্তর জীবনসহ যথার্থ সুখের ধারণা থাকলেও, তারা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। আর, স্বধর্মত্যাগী নগরীর অধিবাসীগণ প্রথমে আদর্শবান থাকলেও, পরবর্তীকালে আদর্শচ্যুত হয়েছে। পরিশেষে, ভ্রান্তিকর নগরী বলতে তিনি এমন নগরীকে বুঝেছেন - যে নগরীর অধিবাসীরা কখনও আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্তজ্ঞান ছাড়া সঠিক জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়নি। তারা বারবার ভণ্ড নবীদের প্রতারণা ও হঠকারিতার শিকার হয়েছে।

ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রিঃ)

তাঁর পুরো নাম আবু আল-হুসাইন ইরনে সিনা। এই মনীষী পণ্ডিত প্রাচ্যে ইবনে সিনা (Ibn Sina) এবং পাশ্চাত্যে আভিসেনা (Avicenna) নামে পরিচিত। পূর্বসূরী ফারাবীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি গ্রীক দর্শন, বিশেষ করে, এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের চর্চা ও অনুশীলন শুরু করেন। ইবনে সিনা বুখারার নিকটবর্তী উত্তর পারস্যের আফসানা নামক স্থানে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে পিতা আবদুল্লাহ বালক ইবনে সিনা সহ পরিবারবর্গকে নিয়ে বুখারায় চলে আসেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং আঠারো বছর বয়সে যুক্তিবিদ্যা, পাদার্থবিদ্যা ও গণিতে তিনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন। এরপর বাকি ছিল অধিবিদ্যা। এ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যা সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য তিনি আল-ফারাবীর রচনাবলীর কাছে ঋণী। এ কারণেই ফারাবীকে ইবনে সিনার প্রকৃত শিক্ষক বা পথ-প্রদর্শক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইবনে সিনা বহু রাজ দরবারে সরকারি চিকিৎসক কিংবা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। ৫৭ বছর বয়সে ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে হামদানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইবনে সিনা ছিলেন প্রায় শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কিতাব আল-শিফা', 'কিতাব আল-নাজাত', 'কানুন ফিতিব্ব', 'দানেশ নামা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর রচিত 'কানুন ফিতিব্ব' গ্রন্থটি ইবনে সিনার অমর কীর্তি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বা বাইবেল হিসেবে খ্যাত। বস্তুত, গ্রন্থটি ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে শতাব্দী সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইবনে সিনার দার্শনিক মতামত

মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ইবনে সিনা ছিলেন এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর প্রচেষ্টায়ই মুসলিম দর্শনে এ্যারিস্টটলীয় চিন্তাধারার চরম বিকাশ লাভ করে। আলফারাবীর ন্যায়, তিনি এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের ভাষ্যকার ছিলেন না। তিনি বরং এ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে প্রাচ্যের বিদ্যার সাথে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

ইবনে সিনার মতে, দর্শন ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রজ্ঞার সাথে বিশ্বাসের সমন্বয় সাধন করা দর্শনের কাজ নয়। দর্শনের কাজ হচ্ছে - জীবন ও জগতের মৌল সমস্যাবলী প্রজ্ঞার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা। দর্শন সার্বজনীন জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্র বিশেষ। এমনকি, বিজ্ঞান দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানানুশীলন দর্শনেই সম্ভব। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা দর্শনের মত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নয়। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জন্য দর্শন চর্চা অত্যাবশ্যিকীয়।

ইবনে সিনার দার্শনিক মতবাদের বিভিন্ন দিকের নিম্নরূপ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা যায়। যথা- (ক) যুক্তিবিদ্যা এবং (খ) মনোবিদ্যা ও অধিবিদ্যা

যুক্তিবিদ্যা

'আল-নাজাত' ও 'আল-ইশরাত' গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে ইবনে সিনা তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, যুক্তিবিদ্যা দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তাঁর মতে, যুক্তিবিদ্যা মানসিক, পদার্থ বিদ্যা জাগতিক এবং অধিবিদ্যা আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব

নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ মানসিক ধারণাসমূহ যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। অন্য ভাষায়, মনের বাইরে এদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই: তবে এরা বাস্তব সত্তার সাথে সম্পর্কিত। প্রসঙ্গত, গণিত ও যুক্তিবিদ্যার ন্যায় মানসিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। তবে, এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গাণিতিক ধারণাবলীকে ইন্দ্রিয়-সংবেদনের সাহায্যে উপস্থাপন করা যায়; কিন্তু যুক্তিবিদ্যার ধারণাবলীকে কখনও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার উপাত্ত হিসেবে প্রদর্শন করা যায় না।

ইবনে সিনার মতে, যৌক্তিক সংগঠনের মূলে রয়েছে পদ (term)। এগুলো হচ্ছে অভিজ্ঞতার আদি উপাত্ত। ইবনে সিনা এই পদের সংজ্ঞায়ন (definition) এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন; কেননা, সংজ্ঞা সঠিক ও নির্ভুল চিন্তার ভিত্তিস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে তিনি সংজ্ঞা ও বর্ণনা (description)- এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। বর্ণনা কোন কিছু সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করে। এ্যারিস্টটলের মত, ইবনে সিনা মনে করেন যে প্রত্যেক বচনের দু'টি পদ রয়েছে, প্রথমটি উদ্দেশ্যপদ এবং দ্বিতীয়টি বিধেয়পদ এবং এই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পাঁচ প্রকারের সম্বন্ধের উল্লেখ করেন (যেমন- জাতি (genus), প্রজাতি (species) বিভেদক লক্ষণ (differentia), উপলক্ষণ (property) ও অবান্তর লক্ষণ (accident)।

-এ্যারিস্টটলের মতে, ইবনে সিনা যুক্তিবিদ্যার সহানুমানের গুরুত্বকে স্বীকার করে নেন। সহানুমান হচ্ছে একটি পদ্ধতি যেখানে দু'টি সত্যের বিচারের ভিত্তিতে তৃতীয় কোন সত্যকে অনুমান করা হয়। বস্তুত, যৌক্তিক কাঠামোর মূলভিত্তি হচ্ছে সহানুমান (syllogism)। এ্যারিস্টটলের অনুকরণে ইবনে সিনা আরও মনে করতেন যে কোন ঘটনার পেছনে চারটি কারণ (cause) রয়েছে। এ কারণগুলো হচ্ছে উপাদান কারণ, রূপগত কারণ, নিমিত্ত কারণ এবং পরিণতি কারণ। ইবনে সিনার মতে, বস্তু বা ঘটনা সংজ্ঞায়নের মধ্যে উপরোক্ত চার রকমের কারণ একই সঙ্গে বিরাজ করতে পারে। যেমন- “একটি ছুরিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় একটি নির্দিষ্ট আকৃতির এমন একটি লোহার জিনিস বলে যা প্রস্তুত হয়েছিল কোনো কামার দ্বারা জিনিসপত্র কাটার জন্য”

নির্ভুল ও যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য যৌক্তিক পদ্ধতির অনুশীলন তাই সবার জন্য অপরিহার্য। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে ইবনে সিনা ঐশী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের উল্লেখ করেন। তাঁরাই শুধু ঐশীসত্তার জ্ঞান সরাসরি ও স্বতঃস্ফূর্ত উপায়ে লাভ করতে সক্ষম।

মনোবিদ্যা ও অধিবিদ্যা

(i) মনোবিদ্যা ঃ মন ও মানসিক বৃত্তি সম্পর্কিত আলোচনা ইবনে সিনার দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। তিনি ছিলেন মূলত দেহ ও মনের দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, দেহের সঙ্গে আত্মার কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। আত্মা দেহের সঙ্গে আকস্মিকভাবে সংযুক্ত হয়েছে। বিশ্ব-আত্মা (world-soul) থেকে নিঃসৃত হয়ে আত্মাকে প্রাথমিকভাবে দেহে অবস্থান করতে হয়। প্রসঙ্গত, তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেহ এবং দর্শনের ক্ষেত্রে মানুষের মন বা আত্মার আলোচনার ওপর প্রধান্য দেন।

অতঃপর ইবনে সিনা মন ও মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশের এক ধারাবাহিক অনুক্রম (order) তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, আত্মা নিম্নোক্ত তিনটি স্তরের মাধ্যমে বিকশিত হয়। এ গুলো হচ্ছে : (ক) উদ্ভিদ আত্মা (vegetable soul), (খ) জীবাত্মা (animal soul), (গ) মানবাত্মা (human soul)। আত্মার প্রাথমিক ও সরল অবস্থা হচ্ছে উদ্ভিদাত্মা। এ পর্যায়ে মন পুষ্টি, বিকাশ ও প্রজনন -এই তিনটি শক্তির অধিকারী। পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে জীবাত্মা। এ স্তরে রয়েছে প্রেষণা (motive) ও জ্ঞানমূলক বৃত্তি (conative faculty) নামক দুটি অতিরিক্ত উচ্চতর শক্তি। প্রেষণা বৃত্তির মধ্যে রয়েছে কামনা, বাসনা প্রভৃতি আবেগমূলক শক্তিসমূহ। আর কোন কিছুকে গ্রহণ বা ধারণ করার ক্ষমতা হচ্ছে জ্ঞানমূলক বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

মানবাত্মার পর্যায়ে গুণাবলী আবার দু' ভাগে বিভক্ত যেমন- বাহ্যবৃত্তি (external faculty) ও অন্তরবৃত্তি (internal faculty)। বাহ্যবৃত্তির মধ্যে রয়েছে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ -এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। বাহ্য জগতের জ্ঞান এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত। অন্তর জ্ঞানের উৎপত্তি সাধারণ জ্ঞানে (common sense)। উচ্চতর বৃত্তি দ্বারা বিকশিত না হওয়া

পর্যন্ত সবরকম প্রত্যক্ষণ (perception) এই কেন্দ্রে অবস্থান করে। মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগেই সাধারণ জ্ঞানের অবস্থান। মানবাত্মার বাড়তি গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে অনুধ্যানী (reflective) ও বিচার বিশ্লেষণী ক্ষমতা। এ সব গুণাবলীকে পরিমাপমূলক বৃত্তি বলা হয়।

ইবনে সিনার মতে, ঐশী পরিকল্পনার জগতের মধ্যেই ভাল-মন্দ, ন্যায়- অন্যায় উভয়েরই স্থান রয়েছে। মন্দ বা অশুভ-এর অস্তিত্ব আল্লাহর সর্বশক্তিমতাকে অস্বীকার করেন না; বরং সসীম জগতের জন্য-এর অস্তিত্ব অপরিহার্য। আল্লাহ সত্তার প্রেক্ষিতে মন্দ বা অশুভ-এর অস্তিত্বের কল্পনা করা যায় না; কিন্তু জগতের প্রেক্ষিতে-এর অস্তিত্ব অপরিহার্য ও আবশ্যিক। এ অশুভ-এর অস্তিত্ব জগতে না থাকলে ভাল-মন্দের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ শুধু সার্বিকসমূহ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন, বিশেষ সম্পর্কে নয়। খুঁটিনাটি বা ছোট-খাট বিষয়ে খোজ-খবর, নেয়ার দায়িত্ব অন্যান্য চিদাত্মার (spirits)।

ইবনে সিনা ছিলেন এ্যারিস্টটলের রচনাবলীর একজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ও সমীক্ষক। এ্যারিস্টটলীয় চিন্তাধারার সাথে তিনি একদিকে নব্য-প্লেটোবাদ এবং অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষাকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা জালালউদ্দীন রুমী, ইকবালসহ অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক; যেমন, দেকার্তে, স্পিনোজা, ডারউইন, কান্ট প্রমুখকে প্রভাবিত করেছিল।

আল-গাজালী (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ)

ইসলামী চিন্তার জগতে আল-গাজালী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মৌলিক চিন্তাবিদ। তাঁর পুরো নাম আবু হামিদ মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল-গাজালী। তিনি সাধারণত একজন আশারীয় সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক বলে পরিচিত।

আল-গাজালী ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্য দেশীয় খোরাসানের অন্তর্গত তুস নগরীর নিকটবর্তী গাজালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান গাজালা থেকেই তিনি গাজালী নামে পরিচিত হন।

আল-গাজালী তাঁর দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক জীবন শুরু করেন একজন আশারীয় চিন্তাবিদ হিসেবে এবং একজন সুফী সাধক হিসেবে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর মতে, ধর্মীয় অনুভূতির ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ বহুলাংশে নিষ্ফল ও অর্থহীন। 'ইয়াহিয়া উলম-আল-দীন' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দানে প্রয়াসী হন। তাঁর মতে, দর্শনের পদ্ধতি কখনো ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রত্যাদেশই ধর্মীয় তথ্য যথার্থ জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এভাবে তিনি আশারীয় মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত একজন শ্রেষ্ঠ সুফী সাধক বা চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি ছোটবড় সত্তারখানা গ্রন্থের রচয়িতা। 'ইয়াহিয়া উলম আল-দীন' আল-গাজালীর শ্রেষ্ঠ রচনা। আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থটি চারখণ্ডে বিভক্ত। অনেক পণ্ডিতের মতে, 'যদি সকল মুসলিম চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয় এবং শুধু ইয়াহিয়া' সংরক্ষিত থাকে, তবে ইসলামের পক্ষে সে ক্ষতি সামান্য মাত্র।' সুফীরা এ গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় কোরআনের মর্যাদা দান করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে : (১) আল-মানকিজ মিনাজ জালাল (ভ্রান্তি থেকে মুক্তি); (২) তাহাফাতুল ফালাসিফা (দার্শনিকদের খণ্ডন); (৩) মাকসিদুল ফালাসিফা (দর্শনের লক্ষ্য); (৪) মীজানুল আলম, (৫) মিশকাতুল আনোয়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আল-গাজালীর দার্শনিক পদ্ধতি

সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আল-গাজালী তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা শুরু করেন। প্রসঙ্গত, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) আল-গাজালীর কয়েকশত বছর পরে দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি হিসেবে ঐ একই পদ্ধতির অনুসরণ করেন। নিশ্চিত জ্ঞানানুশীলন ও সঠিক সত্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে আল-গাজালী শুরুতেই সব প্রচলিত চিন্তা পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি মনে ধারণাসমূহ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেননা তাঁর মতে, এগুলো তাঁকে প্রতারণা করতে পারে। এমনকি, তিনি ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানকেও প্রতারণামূলক বলে অভিহিত

তাঁর সময়ে প্রচলিত চিন্তা পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একমাত্র মরমী অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই মানুষের আত্মা সরাসরি সত্যের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। অন্যকথায়, সুফী সাধকগণই গভীর ধ্যানমগ্ন

বা তন্ময় অবস্থায় (ecstatic state) পরম সত্যের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। তাঁর মতে, পরম জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রত্যাদেশ বা ওহী (revelation), প্রজ্ঞা নয়।

এই সত্যে উপনীত হবার লক্ষ্যে আল-গাজালী তৎকালীন দার্শনিক মতাবলম্বীদেরকে নিম্নোক্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন :

(ক) মধ্যযুগীয় ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় : (আশারীয়া সম্প্রদায়); (খ) তালেমী সম্প্রদায়; (গ) দার্শনিক সম্প্রদায় (ফালাসিফা) ও (ঘ) সুফী

সম্প্রদায়।

(ক) মধ্যযুগীয় ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় (Scholastic Theologian) : মধ্যযুগীয় ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় বলতে আল-গাজালী আশারীয়া সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। আশারীয়া মতবাদের পর্যালোচনা করে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তারা ধর্মীয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতাকেই সমর্থন করেছেন। তারা মুতাযিলাদের যুক্তি পাল্টায়ুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেছেন বটে; কিন্তু তাদের দেওয়া যুক্তির মধ্যে কোনো মৌলিকত্ব নেই। এ কারণে, আল-গাজালী মনে করেন যে মধ্যযুগীয় ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ সঠিক ও সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না এবং তাই, তিনি ঐ সকল মতবাদকে জ্ঞানের উপকরণ হিসেবে স্বীকার করে নিতে নারাজ।

(খ) তালেমী সম্প্রদায় (Talimities) : তালেমী সম্প্রদায় বলতে আল-গাজালী ইসমাইলী সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদ বা মতাবলম্বীদেরকে বুঝিয়েছেন। ইসমাইলী সম্প্রদায় একজন ইমামকে তাদের ধর্মীয় নেতা বলে স্বীকার করেন। তাদের মতে, ইমামই হচ্ছেন নির্ভুল ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আল-গাজালী মনে করেন যে, হযরত মুহম্মদ (সা)- এর পর কোনো মহাপুরুষের জন্ম হবে না— যিনি অকাট্য ও অভ্রান্ত ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। তাই তিনি তালেমী সম্প্রদায়ের মতবাদকেও ইসলামের শরীয়ত বিরুদ্ধ বলে নাকচ করে দেন।

(গ) দার্শনিক সম্প্রদায় : দার্শনিকবৃন্দ জগত ও জীবনের যাবতীয় সমস্যা শুধু বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (reason) সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। আল-গাজালী তাদের মতবাদকে এ বলে খণ্ডন করেন যে, প্রজ্ঞার সাহায্যে যথার্থ সত্তার স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। এমনকি, মুতাযিলা দার্শনিকবৃন্দের মতবাদেরও তিনি ঘোর বিরোধিতা করেন। আল-গাজালী মনে করেন যে চরমপন্থী মুতাযিলাসহ দার্শনিকবৃন্দ অ্যারিস্টটলের মতের সাথে কোরআনের শিক্ষার সামঞ্জস্যতা বিধানে প্রয়াসী হন। আল-গাজালী এই প্রচেষ্টাকে * ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ বলে মনে করেন।

উল্লেখ্য, তিন ‘তাহাফাতুল ফালাসিফা (দার্শনিকদের খণ্ডন) শীর্ষক গ্রন্থে দার্শনিকদের মতবাদের সমালোচনায় অবতীর্ণ হন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি দার্শনিকদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যেমন— (i) জড়বাদী (materialists); (ii) অতিবর্তী খোদাবাদী (deists) ও (iii) খোদাবাদী (theists) সম্প্রদায়।

(i) জড়বাদী : জড়বাদী দার্শনিকদের মতে, জগত জড় পদার্থ থেকে সৃষ্ট। জগতের সৃষ্টির মূলে আল্লাহ নয়। তাদের মতে, জড় চিরন্তন এবং আপন নিয়মানুসারে বিবর্তিত হয়। মোটকথা, জড়বাদীরা সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আল-গাজালী জড়বাদীদের নাস্তিকতাবাদী বলে এই মতের সাথে কোনোভাবেই একমত হতে পারেন নি।

(ii) অতিবর্তী খোদাবাদী : অতিবর্তী খোদাবাদীরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তবে, তারা মনে করেন যে, জগত সৃষ্টির পর স্রষ্টা আর জগত পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। জগত আপনা নিয়মেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আল-গাজালী এ মত প্রত্যাখ্যান করেন; কেননা, এ মত গৃহীত হলে সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমান হিসেবে আল্লাহর ক্ষমতাকে সীমিত বা খর্ব করা হয়।

(iii) খোদাবাদী সম্প্রদায় : আল-গাজালী খোদাবাদী দার্শনিকদের মতবাদও বিচার-বিশ্লেষণের পর খণ্ডন করেন। খোদাবাদী দার্শনিকদের মতবাদ অ্যারিস্টটলের চিন্তা-ধারা দ্বারা প্রভাবিত এবং এক ধরনের যৌক্তিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল-গাজালী তাঁর দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি ও সুস্বল্প বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের অসারতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। খোদাবাদী দার্শনিকদের মতবাদসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত মতবাদসমূহ প্রধান : যেমন— (অ) জগত নিত্য; (আ) খোদা শুধু সার্বিক (universals) সম্পর্কে অবহিত, বিশেষ সম্পর্কে নয়; (ই) মৃত্যুর পর দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

দার্শনিকদের উপরোক্ত মতবাদসমূহকে তিনি ধর্ম-বিরুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন। তবে, জাগতিক ঘটনাসমূহ যে কার্য-কারণ সম্পর্ক দ্বারা গ্রথিত দার্শনিকদের এ মতের সাথে আল-গাজালী একমত। কিন্তু জগত স্বয়ংচালিত (self-caused) দার্শনিকদের এ মতের বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে, আল্লাহ স্বয়ং যাবতীয় বস্তুর আদি কারণ এবং তিনি যাবতীয় জাগতিক বস্তুর গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করে থাকেন।

(ঘ) সুফীদের অতীন্দ্রিয়বাদ : আগেই বলা হয়েছে যে, আল-গাজালী একজন আশারীয় হিসেবে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা শুরু করেন এবং একজন সুফী হিসেবে তাঁর জীবনে পরিসমাপ্তি টানেন। তিনি আশারীয় মতবাদের সংস্কার সাধন করেন এবং তাদের মতবাদকে মরমীবাদ বা সুফীবাদে রূপান্তরিত করেন। সুফীদের অতীন্দ্রিয়বাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এই সত্যে উপনীত হন যে প্রজ্ঞা নয়, মরমী অনুভূতিই (Mystic experience) সত্যকে জানার একমাত্র উপায়। সুতরাং আল-গাজালীর মতে, কেবল স্বজ্ঞার মাধ্যমেই মানুষ পরম সত্যের জ্ঞান বা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম। ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় মানব আত্মা আল্লাহর নূর দর্শন করেন। এ অবস্থায় মানবাত্মা দেশ ও কাল অতিক্রম করে পরমসত্তার দ্বার প্রাপ্তে উপনীত হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই যোগাযোগই হচ্ছে ‘এলহাম’। এলহামের সাথে ওহীর তফাত এই যে, সুফী-পীর-দরবেশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ কর্তৃক এলহাম প্রাপ্ত হন, অথচ আল্লাহর প্রেরিত নবী-পয়গম্বরের নিকট ওহী নাজিল হয়।

এভাবে ইসলামের সমস্ত শরিয়ত-বিরুদ্ধ অভিনবত্ব খণ্ডন করে আল-গাজালী আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলের হাদীসের শিক্ষার ওপর ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এই অবিস্মরণীয় অবদান ও ইসলামের প্রতি অকুণ্ঠ সেবার জন্য তাঁকে ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ বা ইসলামের রক্ষক বলা হয়।

দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা

‘তাহাফাতুল ফালাসিফা’ (দার্শনিকদের খণ্ডন) শীর্ষক গ্রন্থে আল-গাজালী দার্শনিকদের মতবাদের সমালোচনা করেন। যে যে বিষয়গুলোর ওপর আল-গাজালী দার্শনিকদের মতবাদের সমালোচনা করেছেন, তা নিম্নে আলোচিত হল।

(i) **জগতের নিত্যতা** : ‘তাহাফাতুল’ গ্রন্থে গাজালী শুরুতেই দার্শনিকদের জগতের নিত্যতা সম্পর্কীয় ধারণার সমালোচনায় অবতীর্ণ হন। ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের স্বার্থে আল-ফারাবী ও ইবনে সিনা বিশ্বাস করতেন যে, জগত আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু এ্যারিস্টটলের মতের সাথে সংহতি প্রকাশ করে তাঁরা আবার এরূপ মতও প্রকাশ করেন যে, জগত কালের দিক থেকে চিরন্তন (eternal)। অর্থাৎ জগতের কোনো কালিক (temporal) শুরু ছিল না। তাদের মতে, অনাদিকাল যাবৎ আল্লাহ থেকে জগত নির্গমন হচ্ছে, যেন আল্লাহ ও জগত দু’টি চিরন্তন সত্তা। আল-গাজালীর মতে, জগত সম্পর্কে দার্শনিকদের এ মত স্ব-বিরোধী। জগত একই সাথে সসীম ও অসীম হতে পারে না। বিস্তৃতির দিক থেকে জগত সসীম এবং স্থিতির দিক থেকে এটা অসীম — এ ধারণা স্ব-বিরোধ পূর্ণ। কেননা, দেশ-কাল একই প্রকৃতির— ভিন্ন প্রকৃতির নয়। দেশ ও কাল, আল-গাজালীর মতে, অনন্ত ও অসীম। এদের ক্ষেত্রে আমরা আদি বা শেষ কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারি না। দেশ ও কাল বস্তু নয়, বরং বস্তুর সম্বন্ধ স্বরূপ। কান্টের অনেক আগেই তিনি স্বীকার করেছেন যে দেশ-কাল যথাক্রমে বাহ্য ও আন্তর অভিজ্ঞতার আকার। কিন্তু আল-গাজালী এরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন যে, অন্যান্য বস্তুর মতে দেশ-কাল আল্লাহর সৃষ্টি।

অতএব, আল-গাজালীর মূলকথা হল যে, আল্লাহ স্বয়ং জগতকে বিশেষ এক সময়ে সৃষ্টি করেছেন। দেশ সৃষ্ট এবং কাল চিরন্তন- তা হতে পারে না। তাঁর মতে, জগতের আদি কারণ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। আল-গাজালী এভাবে কোরআনের বাণী সমর্থন করে বলেন যে ঐশী ইচ্ছা থেকেই জগত সৃষ্ট হয়েছে এবং ঐশী ইচ্ছায়ই জগত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। জগত কোনোক্রমেই চিরন্তন নয়।

(ii) আল্লাহ শুধু সার্বিক সম্পর্কে অবহিত, বিশেষ সম্পর্কে অবহিত নন : দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ শুধু সার্বিক (universals) সম্পর্কে জানেন, বিশেষ (particulars) সম্পর্কে নয়। দার্শনিকদের এ মতের বিরোধিতা করে আল-গাজালী বলেন যে, আল্লাহ স্বেচ্ছায় জগতকে সৃষ্ট করেছেন, তিনি সৃষ্টির সমুদয় বস্তু সম্পর্কে অবহিত। তাঁর মতে, আল্লাহর ইচ্ছাই

সবকিছুর কারণ এবং তাঁর অনন্ত জ্ঞানের মধ্যে প্রতিটি ছোট-খাট বস্তুর জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ সার্বিক বিশেষ সম্পর্কে একইভাবে জ্ঞাত।

(iii) মৃত্যুর পর দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব নয় : দার্শনিকদের মতানুসারে, শুধু আত্মাই অমর। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশ বা ধ্বংস হয়। অতএব, মৃত্যুর পর আত্মার সাথে দেহের পুনর্মিলন বা পুনরুত্থান সম্ভব নয়। আল-গাজালী এ মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, জন্মের সময় আত্মার সাথে দেহের মিলন ঘটিয়ে যদি আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে একই যুক্তিতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সময় আত্মার সাথে দেহের পুনর্মিলন সম্ভব। অতএব, দার্শনিকদের অভিমতকে খণ্ডন করে আল-গাজালী বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার সাথে দেহের পুনরুত্থান ও পুনর্মিলন সম্ভব।

জগত সম্পর্কীয় আল-গাজালীর ধারণাও তৎকালীন দার্শনিকদের অভিমত থেকে ভিন্ন। দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ চিন্তন থেকেই গোটা জগতের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু চিন্তা নয়- দার্শনিকদের এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে আল-গাজালী বলেন যে, বরং আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন বলেই জগত সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মতে, ঐশী ইচ্ছাই জগত সৃষ্টির মূল কারণ। কোরআনে বর্ণনা রয়েছে : 'কুন ফাইয়া কুন' (অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলেন এবং তাই জগত সৃষ্টি হল)। অতএব, আল-গাজালী কোরআনের মতবাদ সমর্থন করে বলেন যে, জগত আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

আল-গাজালীর কার্য-কারণ তত্ত্ব (Theory of Causation) :

কার্যকারণ তত্ত্বের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আল-গাজালী ছিলেন তাঁর সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম (১৭১১-৭৬)-এর প্রায় সাত শত বছর পূর্বে আল-গাজালী কার্য-কারণতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। হিউমের অনেক আগেই, গাজালী বলেন যে, কার্য ও কারণের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। কার্য-কারণ সম্পর্ক মূলত এক ধরনের ঘটনাবলীর নিয়মানুবর্তিতা। অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্পর্ক হচ্ছে ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্ক। পূর্ববর্তী ঘটনাকে আমরা কারণ বলি, পরবর্তী ঘটনাকে আমরা কার্য বলে থাকি। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা জানি যে, একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনাকে অনুসরণ করে। কিন্তু ঘটনার মধ্যে এমন কোন শক্তি নিহিত নেই যার জন্য আমরা মনে করতে পারি যে, পূর্ববর্তী ঘটনাটি পরবর্তী ঘটনাটির জন্য দায়ী বা পরবর্তী ঘটনাটি পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মেঘ ও বৃষ্টি। আমরা সাধারণত মেঘকে বৃষ্টির কারণ হিসেবে মনে করি। অর্থাৎ মেঘ কারণ এবং বৃষ্টি কার্যফল (effect)। কিন্তু আল-গাজালীর মতে, মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। মেঘের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই— যা বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে। এদের মধ্যকার পূর্বাপর সম্পর্ক যৌক্তিক সম্পর্ক নয়, শুধু আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

“কার্য ও কারণের সম্বন্ধের মধ্যে যে অনিবার্যতা তা একটি মনস্তাত্ত্বিক অনিবার্যতা, যৌক্তিক অনিবার্যতা নয়।”

গাজালী এভাবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা অন্য একটি প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার কারণ হতে পারে না। কেননা তাঁর মতে, নিষ্প্রাণ বস্তু বা ঘটনা সৃষ্টি হতে পারে না। আল-গাজালীর দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, আল্লাহই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডসহ যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও আদি কারণ। আল্লাহর ইচ্ছায় জগত ও নভোমণ্ডলের সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, তিনিই একমাত্র সবকিছুর কারণ।

উল্লেখ্য যে, আল-গাজালীর সাত শত বছর পরে ডেভিড হিউম কার্য-কারণ সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করেন। সাধারণত, যার দ্বারা কোন ঘটনা ঘটে, তাকে কারণ এবং যে ঘটনাটি ঘটে তাকে কার্য বলা হয়। আল-গাজালীর মত হিউমও মনে করেন যে, কারণ কার্যের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভাবী সম্পর্ক নেই। এদের মধ্যে শুধু রয়েছে পূর্বাপর সম্পর্ক। হিউম ছিলেন একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, একটি ঘটনা আর একটি ঘটনাকে বারবার অনুসরণ করে। এ থেকে আমরা এরূপ ধারণায় উপনীত হই যে পূর্ববর্তী ঘটনাটি কারণ এবং পরবর্তী ঘটনাটি কার্য। অতএব, গাজালীর মতে, হিউমও কার্য-কারণের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন।

তবে, কার্য কারণ তত্ত্ব বিষয়ে হিউমের সাথে গাজালীর পার্থক্য রয়েছে। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসেবে হিউম মনে করেন যে, কার্য-কারণ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আল-গাজালী যে কোন কার্যের কারণ হিসেবে একটি আদি কারণে বিশ্বাস করতেন। প্রসঙ্গত, এই আদি কারণই হচ্ছে আল্লাহ স্বয়ং।

আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ

আল-গাজালীর মতে, মানবাত্মা আধ্যাত্মিক দ্রব্য। মানবদেহে আত্মার উপস্থিতির জন্যই মানুষ জগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলেই এর কোন বিস্তৃতি নেই। আত্মা দেহধারী হলেও আসলে দেহাতীত। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আত্মাও আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু এর কোন জড়ীয় আকৃতি নেই। মানুষের আত্মা ঐশী শক্তির অধিকারী।

আল-গাজালীর মতে, মানবাত্মার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। আল্লাহ নিছক চিন্তা দ্বারা জগতকে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা শক্তি দ্বারা জগতকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, ইচ্ছাশক্তিই আল্লাহর প্রধান গুণ। এ থেকে যা সহজেই অনুমেয় তা হচ্ছে : মানবাত্মা খোদার সত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল-গাজালীর মতে, এই সাদৃশ্যের জন্যই মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব সহজে উপলব্ধি করতে পারে। এভাবে আল-গাজালীর আত্মা সম্পর্কীয় ধারণায় সুফীবাদে উপনীত হন।

আল-গাজালী মানুষের আত্মিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর বা ধাপের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, মানবাত্মার বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জ্ঞান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর জগতের মধ্যেই সীমিত। তারা কোরআন হাদীসের বাহ্য অর্থ নিয়েই পরিতৃপ্ত। দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান অতিক্রম করে উচ্চতর জ্ঞানানুশীলনে সক্ষম। শেষ স্তরের মানুষের আত্মা সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঐশী সত্তার জ্ঞানালোকে পৌঁছে। প্রেরিত পুরুষ ও সুফীরাই এই স্তরের আত্মার অধিকারী।

অতঃপর মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থান নিরূপণের জন্য আল-গাজালী তিনটি জগতের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। এই তিনটি জগত হচ্ছে ঃ (ক) আলম আল-মুলক, (খ) আলম-আল-মালাকুত (গ) আলম-আল-জাবারুত।

(ক) আলম-আল-মুলক : এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পরিদৃশ্যমান ও পরিবর্তনশীল জগত। এই স্তরে আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে অবস্থান করে না।

(খ) আলম আল মালাকুত : এটি শাস্বত ও অপরিবর্তনশীল জগত। গাজালীর মতে, এটাই হলো আসল জগত। আলম-আল-মুলক মূলত এই জগতেরই প্রতিচ্ছবি। গাজালীর মতে, স্বর্গীয় জীবন এই জগতেই শুধু সম্ভব।

(গ) আলম-আল-জাবারুত : এই জগত হচ্ছে উপরোক্ত দুই জগতের মধ্যবর্তী জগত। এই স্তরে মানবাত্মা উপরোক্ত দুই জগতেই অবস্থান করে। দৃশ্যত এই স্তরে আলম-আল-মুলকে অবস্থান করলেও কার্যত আত্মা এই স্তরে আলম-আল-মালাকুতের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত স্বপ্নে বা ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মা এই স্তরে আমাদের দেহ ত্যাগ করে এবং মালাকুত জগতে বিচরণ করে। তাঁর মতে, নিদ্রা ও গভীর ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় মানবাত্মা বাস্তব বা আধ্যাত্মিক জগতের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। নিদ্রাবস্থায় আত্মা দেহ ত্যাগ করে আসল জগতে বিচরণ বা প্রত্যাগমন করে বলে আল-গাজালী নিদ্রাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন।

ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রিঃ)

স্পেনের কর্ডোভার এক আইনশাস্ত্রবিদ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি নিজেও ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক। স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী ইবনে রুশদ ছিলেন এ্যারিস্টটলের একজন অনুগত ও একনিষ্ঠ ভাব-শিষ্য। তিনি ছিলেন আবার এ্যারিস্টটলের রচনাবলীর একজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। উল্লেখ্য যে, ইসলামের রক্ষণশীল সমাজ ইসলামের সঙ্গে এ্যারিস্টটলের মতবাদের সমন্বয় সাধনের প্রয়াসকে ভাল চোখে দেখেননি। ফলে ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন এবং এ কারণে শেষ বয়সে তাঁকে বেশ দুর্ভোগ ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। ইবনে রুশদ তদানীন্তন খলিফার আমলে তিনি রাজপদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে রুশদ ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। এ্যারিস্টটলের ওপর তিনি বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে

'তাহাফাতুল তাহাফুত' (খণ্ডনে খণ্ডন), 'কিতাবুল ফালাসিফা' উল্লেখযোগ্য। 'তাহাফাতুল তাহাফুত' গ্রন্থটি গাজালীর 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থের প্রত্যুত্তর।

দর্শনের স্বরূপ

এ্যারিস্টটলের দর্শনের প্রতি ইবনে রুশদের আনুগত্য ও আস্থা ছিল অপরিসীম। তাঁর মতে, এ্যারিস্টটল ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। ইবনে রুশদের দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধন। তাঁর মতে, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই; বরং একে অপরের সম্পূরক। প্রজ্ঞার কাজ হচ্ছে আদি সত্তা অর্থাৎ আল্লাহকে জানা। ধর্মেরও কাজ হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহকে জানা বা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা। অতএব, প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ একই সত্তাকে জানার কাজে নিয়োজিত। কাজেই দার্শনিক প্রজ্ঞা কোনক্রমেই ধর্মবিশ্বাসকে ব্যাহত করে না।

ইবনে রুশদ এ প্রসঙ্গে আল-গাজালী ও তাঁর অনুসারীদের সমালোচনা করেন এবং এ্যারিস্টটলের দর্শনকে হেয় করার জন্য তিনি তাদেরকে দায়ী করেন। 'তাহাফাত-উল-তাহাফা' (খণ্ডনের খণ্ডন) শীর্ষক গ্রন্থে তিনি গাজালীর মত খণ্ডন করেন। ইবনে রুশদ বলেন, দার্শনিক চিন্তা ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়, বরং সহায়ক বা পরিপূরক। কোরআনে আল্লাহ দার্শনিক অনুশীলন বা বিচারশীল চিন্তাকে অনুমোদন করেছেন। সুতরাং স্বাধীন চিন্তা বা দার্শনিক প্রজ্ঞার সাথে ইসলাম ধর্মের কোন বিরোধ নেই বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন।

জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার ক্ষেত্রে ইবনে রুশদ তিন ধরনের পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। যথা : (১) আলঙ্কারিক (rhetorical), (২) দ্বন্দ্বিক (dialectical) ও (৩) প্রমাণমূলক (demonstrative)। তাঁর মতে, আলঙ্কারিক পদ্ধতি সাধারণ মানুষের, দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি ধর্মতাত্ত্বিকদের এবং প্রমাণমূলক পদ্ধতি দার্শনিকদের পদ্ধতি বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত। একইভাবে, তিনি কোরআনের তিন ধরনের ব্যাখ্যার নির্দেশ করেছেন। সাধারণ লোক কোরআনের আলঙ্কারিক অর্থ, ধর্মতত্ত্ববিদ কোরআনের দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যা এবং দার্শনিকগণ কোরআনের প্রমাণমূলক ব্যাখ্যা গ্রহণ করে থাকে।

ইবনে রুশদ ইবনে তোফায়েলের মরমী অভিজ্ঞতাকেও পুরোপুরি অনুমান করেননি। তাঁর মতে, পরম সত্তার সাথে মরমী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যোগাযোগের ঘটনাটি খুবই বিরল। একমাত্র যুক্তিবিদ্যার সাহায্যেই উচ্চতর সত্য তথা বিশুদ্ধ যৌক্তিক সত্যের জ্ঞানার্জন সম্ভব।

বিশ্বতত্ত্ব

ইবনে রুশদের বিশ্বতাত্ত্বিক মতবাদ তাঁর পূর্বসূরীদের মত থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র। তাঁর মতে, জগৎ চিরন্তন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ফল। জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্বই একটি আবশ্যিক ঐক্য (necessary unity)-এর কথা স্মরণ করে দেয়। জাগতিক বস্তুসমূহ কার্য-কারণ সম্পর্কে বাঁধা। জড় ও আকার (Matter and form)-কে শুধু চিন্তার জগতেই পৃথকীকরণ করা সম্ভব, কিন্তু বাস্তব জগতে এদের সম্পর্ক সহ-অবস্থানের সম্পর্ক, অর্থাৎ একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং সৃষ্টি বা ধ্বংস বলতে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ, জগতে সবকিছুই কার্য-কারণ নিয়মে গ্রথিত, দৈব বা আকস্মিক বলতে কিছুই নাই।

ইবনে রুশদ মনে করেন যে জগতের এই চিরন্তন সৃষ্টি প্রক্রিয়া এক অন্তহীন গতি এবং এই অন্তহীন গতি এক আদি চালকের নির্দেশ দান করে। জগতের বিচিত্র ঘটনা ও বস্তুর মধ্যে নিহিত ঐক্য বা সংযোগ শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে এমন এক পরম সত্তার ধারণায় পৌঁছায়, যা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে এবং যা জগতের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য দায়ী। এই সত্তাই স্রষ্টা বা আল্লাহ। এই আদি চালকের সার ধর্ম হলো চিন্তা। তাঁর মধ্যে চিন্তা ও সত্য এক বা অভিন্ন। জগৎ পরম সত্তার বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য যে, ইবনে রুশদের এই মত হেগেলীয় ভাবধারার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে।

ইবনে রুশদের মতে দু'ধরনের সত্তা আছে- এদের একটি যা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অপরটি যা নিয়ন্ত্রিত হয়। সত্তা হিসেবে প্রথমটি সক্রিয় এবং দ্বিতীয়টি নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় সত্তা আধ্যাত্মিক। কিন্তু নিষ্ক্রিয় সত্তা জড়ীয় এবং এ জন্যই, তা দেহধারী বা বস্তুগত। দেহধারী ও আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে এক সমান্তরালবাদের (parallelism) সম্পর্ক বিদ্যমান। এভাবে ইবনে রুশদ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়—এই দ্বিবিধ সত্তার ধারণায় উপনীত হয়েছেন।

অতএব, এ স্পষ্ট যে মানুষের মধ্যে একটি সক্রিয় ও একটি নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি রয়েছে। সক্রিয় বুদ্ধি চালক বুদ্ধি থেকে আগত। নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি ও চালক বুদ্ধির সহায়তায় মানুষের মধ্যে কর্মতৎপরতা গড়ে ওঠে এবং সেই সূত্রেই তা পরিণতি লাভ করে অর্জিত বুদ্ধিতে। চালক বুদ্ধি এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু অর্জিত বুদ্ধি সব কর্মক্ষমতা ও কর্ম-তৎপরতা চালকবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত। অর্জিত বুদ্ধি ব্যক্তির মধ্যেই অবস্থিত এবং ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত হয়ে থাকে।

৪. নৈতিক ও সামাজিক মতবাদ

ইবনে রুশদের মতে, সংসার বৈরাগ্যের নিষ্ক্রিয় জীবনের চেয়ে সক্রিয় সামাজিক জীবন শ্রেয়। সুতরাং সকলের উচিত সমাজে বসবাস করে সমাজের সার্বিক উন্নতি করা। তিনি মনে করেন যে, সমাজের অনেক দুঃখ-দুর্দশার মূলে রয়েছে নারীদের প্রতি অবজ্ঞা বা অবহেলা। তাঁর মতে, পুরুষের মত সমান সুযোগ সুবিধা পেলে তারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের মত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে, ইবনে রুশদ ছিলেন সর্বপ্রকার মানবীয় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার কণ্ঠ। তাঁর মতে, প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই তার পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছিল। মুয়াবিয়া কর্তৃক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লামা ইকবাল(১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রিঃ)

উপ-মহাদেশীয় মুসলিম চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল ছিলেন একজন আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে একজন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক। তাঁর চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মকে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা। নিষ্ক্রিয়তা ও জীবনবিমুখ বৈরাগ্য পরিহার করে মুসলমানদেরকে তিনি দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবমুখী ও সক্রিয় ইবার উপদেশ দেন। অবিভক্ত ভারতের (বর্তমান পাকিস্তান) পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ইকবালের জন্ম হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারি। ইকবাল ১৯০৫ সালে ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং প্রথমে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. এবং পরে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি- এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

ইকবাল অনেক কাব্যগ্রন্থ ও দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী “আসরারে খুদী” (১৯২৫) এবং রুমুজ-ই-বিখুদী (১৯২৭) শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে মানুষের ব্যক্তিত্ব (খুদী), স্বাভাব্য ও স্বাধীনতার জয়গানে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও ‘পয়াম-ই-মাশরিক’ (১৯২৩), ‘জবর-ই-আযম’ (১৯২৭), ‘জাবিদনামা’ প্রভৃতি ফার্সী গ্রন্থগুলো তাঁর কাব্য রচনার মধ্যে বিখ্যাত। ইকবালের পরবর্তী উর্দু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে “বাল-ই-জিব্রাইল” ও ‘জাবর-ই-তালিম’ বিশেষভাবে সুখ্যাত। ১৯২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে প্রদত্ত তাঁর ছ’টি ভাষণের ওপর ভিত্তি করে “The Reconstruction of Religious Thought in Islam” গ্রন্থখানি পরে প্রকাশিত হয়।

২. ইকবালের দার্শনিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য

ইকবালের দার্শনিক চিন্তাধারা দু’টি মূল প্রেরণা থেকে উৎসারিত। এক, কোরআন, হাদীস ও রুমীর দর্শন; দুই, উইলিয়াম জেমস, নীটশে, বার্গসোঁ ও ম্যাকটেগার্ট। তিনি মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের এবং জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেবার উপদেশ দেন। কিন্তু, তিনি পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাকে অন্ধ অনুকরণের পরামর্শ দেননি। ইসলামের মূল মর্মবাণীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্ব জাতীয়তাবাদ ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধের তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় আবার মরমী চেতনা বিরাজমান। স্বজ্ঞাই হল তাঁর মতে জ্ঞানের একমাত্র উৎস।

তাঁর দর্শনের মূল ধারণাগুলো হচ্ছে- স্বজ্ঞা, অহং বা খুদী, জগত ও আল্লাহ। আমরা এখন উল্লিখিত মৌল ধারণাগুলোর উপর বিশদ আলোচনায় অবতীর্ণ হব।

(ক) স্বজ্ঞা (Intuition) :

ইকবালের মতে, মানবীয় জ্ঞানের আকার বা স্বরূপ দেশ ও কাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং মানসিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর অর্থও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, মনোবিকাশের উচ্চতম পর্যায়ে তিনি এমন এক ধরনের বিশ্বাস করতেন যা দেশ-কাল-নির্ভর স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার স্তরের উর্ধ্বে। ইকবাল অস্তিত্বের এই স্তরকেই স্বজ্ঞা বলে অভিহিত করেছেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমরা এই স্তরের জ্ঞান লাভ করি। এটি এমন এক ধরনের অনন্য বা অনুপম অভিজ্ঞতা যেখানে আমরা প্রত্যক্ষণ ও চিন্তনের সীমা অতিক্রম করতে পারি। উল্লেখ্য যে, ইকবাল ফরাসি দার্শনিক বার্গসোঁর চিন্তাধারা (১৮৫৯-১৯৪১) দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হলেও, স্বজ্ঞা সম্পর্কিত তাঁর ধারণা বার্গসোঁর ধারণার চেয়ে ভিন্নতর। স্বজ্ঞা বলতে বার্গসোঁ বুঝেছিলেন এক ধরনের বৌদ্ধিক অনুভূতিকে। তাঁর মতে, স্মৃতি বিষয়ক উপকরণাদি স্বজ্ঞাত অনুভূতি থেকে বাদ দেয়া উচিত। কিন্তু ইকবালের মতে, এ ধরনের বিয়োজন অহমকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের নামান্তর। কেননা, তাঁর মতে, স্মৃতির সমন্বয়ে অহমের ধারণা গঠিত হয়ে থাকে।

(খ) খুদী (Self বা Ego) :

ইকবালের দর্শনের মূল সুর হচ্ছে খুদী বা অহম বা আত্মসত্তা। বস্তুত, খুদীর ধারণার উপরই ইকবাল দর্শনের মূল কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে, খুদী বাস্তব সত্তা। এটি সকল প্রকার ক্রিয়াপরতার উৎস এবং তা আপন সত্তায় বিরাজমান। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমরা এই সত্তার সাক্ষাত পেয়ে থাকি। স্বজ্ঞার মাধ্যমে শুধু আমরা খুদীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হই। স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত খুদীর ধারণা বস্তুত স্বাধীন ও অমর।

সর্বেশ্বরবাদী (pantheists) দার্শনিকগণ খুদীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে, খুদী অবাস্তব বা বাস্তবতা বিবর্জিত। এটি পরম আত্মার অংশবিশেষ এবং পরিণামে পরমাত্মার (absolute self) সাথে বিলীন হয়ে যাওয়াই খুদীর- পরম লক্ষ্য। ভাববাদীরাও মনে করেন যে, ব্যক্তিসত্তাকে পরমসত্তার সঙ্গে বিলীন করে দেওয়াই হচ্ছে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত, ইকবাল সর্বেশ্বরবাদী ও ভাববাদী দার্শনিকদের এ মত খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে অহং বা খুদী এক বাস্তব সত্তা তাঁর মতে, আত্মসত্তা বা খুদীর অস্বীকৃতি, কিংবা পরম সত্তার মধ্যে এর বিলুপ্তি ঘোষণা মানবজীবনের নৈতিক বা ধর্মীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। ইকবালের মতে, ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ নয়, বরং ব্যক্তিত্বকে সঠিক পথে বিকশিত ও পরিচালিত করাই খুদীর মূল লক্ষ্য।

অহং বা খুদী অমর ও অবিনশ্বর। তবে খুদীর এই অমরত্ব অর্জন করা মানুষের জন্মগত অধিকার নয়। একে ক্রমাগত ব্যক্তি প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। অলস ও কর্মবিমুখ মানুষের মধ্যে খুদীর চৈতন্য নাই বললেই চলে বা থাকলেও তা নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ। এ কারণেই, অলস বা কর্মবিমুখ ব্যক্তিগণ খুদীর স্থায়ী অস্তিত্বের অনুভূতি কখনো অনুভব বা অর্জন করতে পারে না। খুদীর বিকাশের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা অপরিহার্য। তার মতে খুদী বা অহমের পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে সমাজে অতি মানবের (superman) আবির্ভাব সম্ভব।

(গ) জড় জগত : ইকবালের মতে, জগত সর্বদা অভিব্যক্তির পথে একটি অগ্রসরমান প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য জগতে নিয়ত প্রয়াস চলছে। জগতে নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটছে। জগত তাই তাঁর মতে বাস্তব ও অস্তিত্বশীল।

বার্গসোঁর ন্যায় ইকবালও যুক্তি দিয়ে দেখান যে জড়ের প্রকৃত স্বরূপকে জানার জন্য চিন্তন বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ কোনটাই যথার্থ নয়। জড়ের প্রকৃত স্বরূপ শুধু স্বজ্ঞার সাহায্যেই উপলব্ধি করা যায়।

আমিত্ব বা অহংবোধ অর্জনের লক্ষ্যেই জীবনের সব কার্যকলাপ পরিচালিত হয়ে থাকে। অতএব, জগতে বসবাসকালে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্ব অর্জন। এ কারণেই ইকবাল মনে করেন যে, যা ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় করে তাই ভাল এবং যা একে দুর্বল করে, তা-ই মন্দ। "গোটা জগতটা যেন এক বিরাট 'আমি'-র অভিব্যক্তি।

ইকবাল উদ্দেশ্যবাদ (teleology)-এর একজন ঘোর সমর্থক। তবে, উদ্দেশ্য বলতে বাইরের কোন নিয়ন্ত্রণকে তিনি বুঝেননি। তাঁর মতে, "জীবন যতই বিকশিত ও বিস্তৃত হচ্ছে, ততই নতুন নতুন লক্ষ্য, নতুন নতুন উদ্দেশ্য ও নতুন নতুন মূল্যমান বিকশিত হচ্ছে"। জগত স্থির নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল ও ক্রমশ বর্ধনশীল। প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে

এ জগতে। এই নতুন নতুন গুণের আবির্ভাবের পেছনে প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা উভয়ই কাজ করছে এবং একই লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

(ঘ) আল্লাহ ۞ ইকবালের মতে, আল্লাহ পরম সত্তা এবং মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক খুদী। তিনি এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ স্বয়ং নিজেই পরমসত্তা ও পরিপূর্ণ অহম। তিনিই কেবল পরিপূর্ণ অহম চেতনা ও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। এই ব্যক্তিত্ব অর্জনই সব সসীম অহমের লক্ষ্য। আল্লাহ সম্পর্কিত ইকবালের এ ধারণা কোরআনে বর্ণিত ধারণার সাথে সঙ্গতি রয়েছে। কোরআনের উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ অতিবর্তী (transcendent) ও অন্তবর্তী (immanent) এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ইকবালের মতে, কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর ধারণা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এমন এক আধ্যাত্মিক সত্তা— যিনি দেশ-কাল দ্বারা সীমায়িত নন। তিনি এক সীমাহীন সত্তা এবং এই জগত তাঁর আংশিক অভিব্যক্তি। পরম অহম বা খুদী হিসেবে আল্লাহ অসীম ও অনন্ত।

পরম খুদীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

এক, পরম খুদী বা অহম সর্বজ্ঞাতা;

দুই, পরম খুদী বা অহম সর্বশক্তিমান।

তিন, পরম খুদী চিরন্তন।

চার, পরম খুদী বা আল্লাহর সঙ্গে সসীম খুদীর সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব।

৩. ইকবালের শিক্ষা-দর্শন বা সমাজ নীতি দর্শন

সমাজ দর্শন সম্পর্কে ইকবালের চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উন্মেষ সাধন করে। ইকবাল দর্শনের মূল বাণী হচ্ছে খুদী বা অহম। জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন ও উপলব্ধি করা। প্রত্যেক মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে সে অসীম সম্ভাবনার অধিকারী। তাঁর মতে, খুদীর বিলুপ্তি ইসলামের পরিপন্থী। পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিয়ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খুদীর বিকাশ সম্ভব। ইকবাল জীবন-বিমুখ, সংসার-বিরাগী ও নিষ্ক্রিয় জীবন ধারার ঘোর বিরোধী। তাঁর মতে, কর্ম-বিমুখতা তাঁর জীবন দর্শনের পরিপন্থী।

তিনি মানুষকে কর্মতৎপর হবার পরামর্শ দেন এবং ক্রিয়াপরতাকে একটি সদগুণ বা পুণ্য (virtue) এবং নিষ্ক্রিয়তাকে অসৎগুণ বা পাপ (vice) বলে নিন্দা করেন। তাঁর মতে, একজন সক্রিয় নাস্তিক একজন নিষ্ক্রিয় আস্তিক বা ধার্মিক অপেক্ষা উত্তম। ইকবাল বলেন, যাঁরা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না, তাঁরা নাস্তিক বটে; কিন্তু যাঁরা নিজেদের সত্তা বা অহমের উপলব্ধি করতে সক্ষম নন; তাঁরা নাস্তিকের চেয়েও অধম। ইকবালের মতে, কর্মই ধর্ম বা পুণ্যতা।

ইকবাল চরম পুজিবাদের (extreme capitalism) বা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। তার মতেই এটি জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশার মূল কারণ। তিনি একধরনের সমাজতন্ত্রের সমর্থন করেন। তার মতে ইসলাম ও সমাজতন্ত্র বিরোধী নয় বরং পরিপূরক। তিনি বলেন,

"একজন সমাজতন্ত্রী অজ্ঞাতে হলেও বহুলাংশে আল্লাহর কাজ করে থাকেন" তিনি আরোও বলেন,

"আমাকে যদি একটি মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক করা হতো, তাহলে প্রথমে সেই রাষ্ট্রকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতাম"

আল্লামা ইকবালের দার্শনিক সত্তার পরিচয় মেলে তার নিম্নোক্ত দুটি গ্রন্থে:

1. The Reconstruction of Religious Thought in Islam

2. The Development of Metaphysics in Persia

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী(১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয় : শাহ ওয়ালী উল্লাহ ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আবুল ফায়াদ আহমাদ কুতুবুদ্দীন।

গ্রন্থ রচনা : শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ইয়ারাতুল খাফা, ফাতহুর রাহমান ফী তরজমানুল কুরআন, আল-ফাওযুল কবীর, ফাতহুল খবীর, খায়র কাছীর, আল-কাওলুল জামীল, বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের শাসনকালে দিল্লীতেই অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তানায়ক শাহ ওয়ালী উল্লাহ পরলোক গমন করেন।

Topic 11 :-

Indian Philosophy: Buddhism, Sakhya, Naya and Vedanta Schools

যেসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- বৌদ্ধ দর্শন (আৰ্য সত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ, অষ্টমার্গসমূহ, হীনযান ও মহাযান)
- সাংখ্য দর্শন (প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্ব)
- ন্যায় দর্শন (১৬ প্রকারের পদার্থ, ন্যায় জ্ঞানতত্ত্ব, পঞ্চ অবয়বী ন্যায়, পাশ্চাত্য ন্যায়ের সাথে তুলনা)
- বেদান্ত দর্শন (উপনিষদের ব্যাখ্যা, শঙ্কর ও রামানুজের অদ্বৈতবাদ – ব্রহ্ম ও জগৎ সম্পর্কে তাদের মত)

বৌদ্ধ দর্শন (The Buddha Philosophy)

গৌতমবুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করিয়া জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে- মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে সেই মতবাদই 'বৌদ্ধ দর্শন' বা 'বৌদ্ধ ধর্ম'। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্ত্র নগরে (লুম্বিনী গ্রামে) এক রাজ-পরিবারে গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়। তাঁহার আদি নাম ছিল গৌতম বা সিদ্ধার্থ। তিনি জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের সমসাময়িক।

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী প্রথমে মুখে মুখে প্রচারিত হইলেও পরে তাঁহার তিনজন বুদ্ধদেবের তিনজন প্রিয় প্রিয় শিষ্য তাঁহার উপদেশাবলীকে তিনটি গ্রন্থে পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এই তিনটি গ্রন্থ 'ত্রিপিটক' (তিনটি পেটিকা) নামে খ্যাত। এই পিটকগুলির নাম—বিনয় পিটক, সুত্ত-পিটক এবং অভিধম্ম-পিটক। প্রথম পিটকে আছে বৌদ্ধ সঙ্ঘের নিয়মাবলী, অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত তৎসম্পর্কীয় নিয়মাবলী; দ্বিতীয় পিটকে আছে বুদ্ধদেব-কথিত উপদেশমূলক ছোট ছোট গল্প এবং তৃতীয় পিটকে আছে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা। বুদ্ধদেবের অনুগামীদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাঁহারা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। ধর্মের দিক হইতে ধর্মের দিক হইতে বৌদ্ধেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন, যথা—বৌদ্ধেরা দুই সম্প্রদায়ে হীনযান ও মহাযান। হীনযান সম্প্রদায় প্রসার লাভ করিয়াছিল সিংহল, বিভক্ত, যথা—হীনযান ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে; আর মহাযান সম্প্রদায় প্রসার লাভ করিয়াছিল ও মহাযান তিব্বত, চীন ও জাপানে। হীনযানীদের ধর্ম-সাহিত্য রচিত হয় পালি ভাষায়; আর মহাযানীদের ধর্ম-সাহিত্য রচিত হয় সংস্কৃত ভাষায়।

বুদ্ধদেবের শিক্ষা বা বাণী (The Teachings of Buddha) :

(ক) : বুদ্ধদেবের তত্ত্বালোচনা বিরোধী মনোভাব (The Anti- Metaphysical Attitude of Buddha)

দার্শনিক অর্থে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, সেই অর্থে বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন নীতিতত্ত্বের সংস্কারক ও প্রচারক। দার্শনিক তত্ত্বালোচনা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তিনি ইহার বিরোধীই ছিলেন। তত্ত্ববিষয়ক কোন প্রশ্ন যদি তাঁহাকে কেহ করিতেন, তিনি সেই প্রশ্নের প্রশ্নের আলোচনা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই—তাত্ত্বিক প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নহে। তদুপরি এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে মতভেদের সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাঁহার মতে দার্শনিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা অনাবশ্যক ও নিষ্ফল এবং উহাতে অযথা সময় নষ্ট হয়।

বুদ্ধদেবের জীবনের চরম লক্ষ্য ও ব্রত ছিল দুঃখ-দুর্দশা হইতে মানুষের পরিত্রাণের পথ উদ্ঘাটন করা এবং জনগণকে ঐ পথের নির্দেশ দেওয়া। মানুষকে লইয়াই বুদ্ধদেবের দর্শন; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্যাই তাঁহার সমস্যা, অতীন্দ্রিয় জগতের

সমস্যাকে তিনি কোন গুরুত্ব দেন নাই। তাই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায়ও তিনি আগ্রহী ছিলেন না। দুঃখ হইতে চিরমুক্তি কেমন করিয়া লাভ করা যায়—এই জিজ্ঞাসাই ছিল বুদ্ধদেবের প্রধান জিজ্ঞাসা।

(খ) চারিটি আৰ্য-সত্য (The Four Noble Truths) :

গভীর চিন্তার এবং কঠোর সাধনার ফলে বুদ্ধদেব যে চারিটি সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন সেই সত্যগুলি হইল (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের নিবৃত্তি আছে, এবং (৪) দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গ বা পথও আছে। এই চারিটি সত্যকে আৰ্য-সত্য বলা হয়। এই সত্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হইল :

(১) প্রথম আৰ্য-সত্য—দুঃখ আছে (The First Noble Truth — There is a Suffering) :

সবই দুঃখময়

রোগ জরা এবং মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধদেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই সংসারে সবই দুঃখময় (সর্বং দুঃখম)। জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, শোক, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়- "বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ সবই দুঃখের বিষয়বস্তু। এমন কি, যাহাকে মানুষ আপাত সুখের বিষয় মনে করে, তাহার মধ্যেও দুঃখের বীজ বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। বুদ্ধদেব বলেন, জগৎ ও জীবন অনিত্য এবং যাহা অনিত্য তাহা দুঃখময় (যৎ অনিত্যম তৎ দুঃখম)। বুদ্ধদেবের মতে সুখ ক্ষণস্থায়ী। তাই সুখের অবসান সুনিশ্চিত এই সুখের অবসানও দুঃখের কারণ। এমন কি, সুখাবসানের আশঙ্কা মানুষকে ভীত, ও হতাশ করিয়া তুলে। এই সকল কথা চিন্তা করিলে আপাত সুখকে দুঃখ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

(২) দ্বিতীয় আৰ্য-সত্য—দুঃখের কারণ আছে (The Second Noble Truth—There is Cause of Suffering) :

বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় সত্যটি 'স্বাভাবিক কার্য-কারণ' নিয়ম হইতে নিঃসৃত। কার্য কারণ নিয়ম অনুসারে কোন কিছুই সত্যহীন নয়, সবই শর্তাধীন। কারণ ব্যতিরেকে কার্যের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং দুঃখেরও কারণ আছে। যে স্বাভাবিক কার্য-কারণ নিয়মে বুদ্ধদেব বিশ্বাসী, সেই নিয়মকে তিনি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বলিতেন। এই নিয়ম অনুসারে তিনি দুঃখের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কারণকে 'দুঃখ-সমুদায়' বলা হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের কার্য কারণ শৃঙ্খলে বারটি কারণ আছে। তাই ইহাকে দ্বাদশ নিদান বলা হয়। এই দ্বাদশ নিদানের আর একটি নাম 'ভবচক্র' এই দ্বাদশ নিদানকে 'ভবচক্র' বলিবার কারণ এই যে, ইহারাই মানুষকে জন্ম, দুঃখভোগ ও পুনর্জন্মের মধ্য দিয়া বারংবার সংসারে চাকার মত ঘুরাইতেছে।

কারণ হইতে কার্যের দিকে অগ্রসর হইলে দ্বাদশ নিদানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাঁড়াইবে নিম্নরূপ :

(১) অবিদ্যা দুঃখের মূল কারণ; অবিদ্যা হইতে (২) সংস্কার, সংস্কার হইতে (৩) বিজ্ঞান বা চেতনা বিজ্ঞান হইতে (৪) নামরূপ বা দেহ-মন দ্বাদশ নিদান বা অবচক্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সংগঠন, নামরূপ হইতে (৫) ঘড়ায়তন বা ষট ইন্দ্রিয়, ঘড়ায়তন হইতে (৬) স্পর্শ, স্পর্শ হইতে (৭) বেদনা বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, বেদনা হইতে (৮) তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা, তৃষ্ণা হইতে (৯) উপাদান বা জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি, উপাদান হইতে (১০) ভর বা জন্মলাভের বাসনা, ভব হইতে (১১) জাতি বা জন্ম, এবং জাতি হইতে (১২) জরা-মরণ উদ্ভূত হয়।

বৌদ্ধগণ উক্ত দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রকে ত্রিকালের হিসাবে ভাগ করেন:

(১) অবিদ্যা ও (২) সংস্কার - অতীত জীবন

(৩) বিজ্ঞান (৪) নামরূপ (৫) ঘড়ায়তন (৬) স্পর্শ

(৭) বেদনা (৮) তৃষ্ণা (৯) উপাদান (১০) ভব - বর্তমান জীবন

(১১) জাতি ও (১২) জরা-মরণ - ভবিষ্যৎ জীবন

(৩) তৃতীয় আৰ্য-সত্য—দুঃখের নিবৃত্তি আছে (The Third Noble Truth—There is the Cessation of Suffering)

বুদ্ধদেব বলেন, দুঃখ যেহেতু শর্তাধীন সেইহেতু শর্ত বা কারণকে অপসারিত করিতে পারিলেই দুঃখের নিবৃত্তি সুনিশ্চিত। তাই তিনি বলিয়াছেন, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। এই দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থাই হইল নির্বাণ। মানুষ সংযমসহকারে সত্যের অনুক্ষণ

ধ্যান করিয়া নিজের প্রচেষ্টায় ইহজীবনে এই অবস্থাকে লাভ করিতে পারে। ইহা জীবনমুক্তির অবস্থা। মুক্ত ব্যক্তিকে বৌদ্ধেরা অর্হৎ বা পূজনীয় ব্যক্তি নামে অভিহিত করেন।

বুদ্ধদেব দুই রকম কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম। রাগ-দ্বेष-মোহ-জাত কর্মই হইল সকাম কর্ম। মানুষের সকাম কর্মই তাহার মধ্যে বিষয়াসক্তি তথা বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া তাহার পুনর্জন্ম ঘটায়; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম (অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর যে-কর্ম করা হয়) বিষয়ানুরাগ সৃষ্টি করে না। সুতরাং নিষ্কাম কর্মের ফলে পুনর্জন্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না। উক্ত দুই রকম কর্মের সঙ্গে বুদ্ধদেব দুই রকমের বীজ বপনের তুলনা করিয়াছেন। তাহার মতে সকাম কর্ম হইল ফলদায়ী বীজ বপন, আর নিষ্কাম কর্ম হইল শুষ্ক ও বন্ধা বৌদ্ধ মতে বীজ বপন।

(৪) চতুর্থ আর্ষ-সত্য- দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গ বা পথও আছে (The Fourth Noble Truth-There is the Path to the Cessation of Suffering)

বুদ্ধদেবের চতুর্থ আর্ষ-সত্য হইল 'দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গ' বা পথও আছে। বুদ্ধদেবের মতে দুঃখের কারণ অপসারণ করিবার মার্গ বা পথই হইল দুঃখ-নিবৃত্তির পথ। এই পথের আটটি অঙ্গ বা স্তর আছে। তাই এই পথকে বৌদ্ধদর্শনে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' (Eight-fold path) বলা হয়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধ দর্শনের নীতিতত্ত্বকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই মার্গের আটটি স্তর হইল— (১) সম্যক দৃষ্টি (সম্মাদিখি), (২) সম্যক সংকল্প (সম্মাসংকল্প), (৩) সম্যক বাক্ বা বাক্ সংযম (সম্মাবাচা), (৪) সম্যক কর্মান্ত বা সংযত আচরণ (সম্মা-কম্মান্ত), (৫) সম্যক আজীব (সম্মা-আজীব), (৬) সম্যক ব্যায়াম (সম্মা-ব্যায়াম), (৭) সম্যক স্মৃতি (সম্মাসতি) এবং (৮) সম্যক সমাধি (সম্মা-সমাধি)।

(১) সম্যক দৃষ্টি (Right views)—চারিটি আর্ষ-সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হইল আর্ষ-সত্যগুলি সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টি।

(২) সম্যক সংকল্প (Right determination) — পার্থিব বস্তু সম্পর্কে আসক্তি, ভোগবিলাস, হিংসা, রাগ ও দ্বेष, বর্জন করিবার দৃঢ় ইচ্ছাই সম্যক সংকল্প।

(৩) সম্যক বাক্ বা বাক্ সংযম (Right speech)—মিথ্যাকথা, কটুকথা, অসার কথা, পরনিন্দা প্রভৃতি বর্জন করাই বাক্ সংযমের লক্ষণ। বুদ্ধদেব বলেন, কেবল সং- সংকল্প গ্রহণ করিলে মুক্তি আসিবে না, সংকল্প অনুসারে কাজও করিতে হইবে। এইজন্য প্রথমেই বাক্ সংযম প্রয়োজন। কারণ বাক্যের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তিকামীর আত্মনিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়।

(৪) সম্যক কর্মান্ত বা সংযত আচরণ (Right conduct)—অহিংসা, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য (অবৈধ ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ-বিরতি), সত্য ও মাদকদ্রব্য বর্জন এই পঞ্চাঙ্গীল (পঞ্চ আচরণ) সম্যক কর্মান্তেরই অন্তর্গত।

(৫) সম্যক আজীব (Right livelihood)—সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই হইল 'সম্যক আজীব'।

(৬) সম্যক ব্যায়াম (Right effort) মনে দৃঢ়মূল কুচিন্তার বিনাশ, নূতনভাবে কুচিন্তার উৎপত্তি নিবারণ, মনে সং চিন্তা আনয়ন ও তাহাকে সংরক্ষণ করিবার প্রচেষ্টাই সম্যক ব্যায়াম।

(৭) সম্যক স্মৃতি (Right mindfulness) জগৎ, শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সবই অনিত্য, জীবন ক্ষণস্থায়ী প্রভৃতি তত্ত্বকথা সকল সময় স্মরণে রাখাই 'সম্যক স্মৃতি'।

(৮) সম্যক সমাধি (Right concentration) মনঃসংযোগের নামই সমাধি, সম্যক সমাধিই অষ্টমার্গের শেষ স্তর। যে-ব্যক্তি পূর্বোক্ত সাতটি নীতির অধিকারী হইয়াছে তিনিই 'সম্যক সমাধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করিতে পারেন। সমাধি বা মনঃসংযোগের চারিটি স্তর আছে।

৩। বুদ্ধদেবের নৈতিক উপদেশাবলীর অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব (The Philosophical Implications of Buddha's Ethical Teaching)

বুদ্ধদেব দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধানের জন্য কোন সময় আগ্রহী ছিলেন না। নৈতিক উপদেশই ছিল তাহার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তাবুও তাহার নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিমত পাওয়া যায়। এই মতবাদ

প্রধানতঃ চারিটি; যথা, (ক) প্রতীত্য সমুৎপাদ বা শর্তাধীন সৃষ্টিবাদ, (খ) কর্মবাদ, (গ) সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যতাবাদ এবং (ঘ) অনাত্মবাদ।

(ক) প্রতীত্য সমুৎপাদ বা শর্তাধীন সৃষ্টিবাদ (The Theory of Dependent Origination of Conditional Existence of things)

বুদ্ধদেবের মতে এই জগতে কোন বস্তু বা ঘটনা আত্মনির্ভর নহে এবং বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে কিছু ঘটে না। প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার কারণ আছে। জাগতিক সকল বস্তুই এক সর্বব্যাপক ও অবশ্য-স্বীকার্য 'কার্য-কারণ' নিয়মের অধীন। বৌদ্ধমতে এই 'কার্য-কারণ' নিয়ম জগতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে। ঈশ্বর বা কোন অতীন্দ্রিয় চেতনা সত্তার দ্বারা এই নিয়ম পরিচালিত হয় না। এই কার্য-কারণ নিয়মকে বৌদ্ধ দর্শনে 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' (Theory of Dependent Origination) বলা হয়। 'প্রতীত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'ইহাকে পাইয়া', আর 'সমুৎপাদ' 'উৎপত্তি'। অর্থাৎ ইহাকে পাইয়া উৎপত্তি। 'প্রতীত্য সমুৎপাদে'র সহজ অর্থ হইল যে-কোন বস্তু বা ঘটনা পূর্ববর্তী বস্তু বা ঘটনা হইতে সমুৎপন্ন। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' অনুসারে, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রত্যেক বস্তুই শর্তসাপেক্ষ, অর্থাৎ অপর এক বস্তুর উপর নির্ভরশীল। তদুপরি, যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা বিলীন হওয়ার আগে কোন-না-কোন কার্য-উৎপাদন করিবেই। বুদ্ধদেব তাহার এই মতবাদকে নিত্যবাদ (Eternalism) এবং উচ্ছেদবাদের (Nihilism) মধ্যবর্তী বলিয়াছেন। এই মতবাদকে মধ্যবাদ (Middle view) বলা যায়।

(খ) কর্মবাদ (The Theory of Karma)—কর্মবাদ প্রতীত্য সমুৎপাদ বা শর্তাধীন সৃষ্টিবাদের একটি বিশেষ প্রকাশ মাত্র। কর্মবাদ অনুসারে মানুষকে তাহার কৃত-কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে এবং যে যেমন কর্ম করিবে সে তেমন ফল ভোগ করিবে। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষের বর্তমান অবস্থা তাহার প্রাক্তন কর্মেরই পরিণতি এবং বর্তমান কর্মের পরিণতি হইবে ভবিষ্যতের অবস্থা। এই নিয়মকে লঙ্ঘন করা যায় না।

সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ (The Doctrine of Universal Change and Impermanence)

'সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যতাবাদ' প্রতীত্য সমুৎপাদ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। প্রতীত্য সমুৎপাদ অনুযায়ী সকল বস্তু বা ঘটনার কারণ আছে। সুতরাং কারণটির পরিবর্তন হইলে কার্যের আবির্ভাব হয় এবং কারণটি ধ্বংস হইলে কার্যটিও ধ্বংস হয়। বুদ্ধদেব বার বার বলিয়াছেন, 'সব কিছুই পরিবর্তনশীল, সব কিছুই ধ্বংসশীল এবং সব কিছুই অনিত্য (সর্বং অনিত্যম)।' তিনি আরও বলেন, যাহার আদি আছে, তাহার অন্তও আছে, যাহার জন্ম আছে তাহার মৃত্যুও আছে, যেখানে মিলন আছে সেখানে বিচ্ছেদও আছে। অক্ষম, চিরস্থায়ী বা নিত্য বলিয়া কিছুই নাই। আপাতদৃষ্টিতে কোন বস্তুকে চিরস্থায়ী মনে হইলেও আসলে তাহা চিরস্থায়ী নয়; তাহার বিনাশ হইবেই। এই অনিত্যতাবাদ বুঝাইবার জন্য বুদ্ধদেব দুইটি উপমা দিয়াছেন, যথা, "অগ্নিশিখা" এবং 'নদীজলধারা'। অগ্নিশিখা যেমন নিয়ত চঞ্চল, নদীজলধারা যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল, তেমনি জগতের সকল কিছুই অগ্নিশিখার মত চঞ্চল এবং নদীজলধারার মত পরিবর্তনশীল।

বুদ্ধদেবের অনিত্যতাবাদকে বহু লেখক ও দার্শনিক

'জগতে সব কিছুই অনিত্য' বুদ্ধদেবের এই মতবাদকে সমর্থন করিয়া বুদ্ধদেবের বহুকাল পরে অনেক লেখক এবং দার্শনিক নানা ধরনের কথা বলিয়াছেন; যেমন, গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লাইটাস (Heraclitus) বলিয়াছেন, একই নদীতে কোন লোক দুইবার ডুব দিতে পারে না, কারণ দ্বিতীয়বার ডুব দিবার সময় পূর্বস্রোত পরিবর্তিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করে। অতি আধুনিক ফরাসী দার্শনিক বার্গস (Bergson) বলিয়াছেন, 'জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল; অনাদি ও অনন্ত প্রাণপ্রবাহ (Elan vital) প্রতিনিয়ত নূতন নূতন পরিবর্তনের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে ইত্যাদি।

অনাত্মবাদ (The Theory of Non-existence of the Soul)

বুদ্ধদেব মানুষের মধ্যে শাস্ত্র বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহার মতে জগতে সব কিছুই যখন অনিত্য তখন চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব বুদ্ধদেবের মতে কোন নিত্য বা চিরন্তন আত্মার থাকাও সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের মতে আত্মা বলিয়া কোন নিত্য বস্তু নাই। বুদ্ধদেবের মতে মানুষের আত্মা হইল তাহার চেতনার অবিরাম প্রবাহ (Stream of

Consciousness)। মানুষের মধ্যে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নানা রকমের অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছা অহরহ আসা-যাওয়া করিতেছে। এই সকল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা। কাজেই দেখা যাইতেছে, বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। নিত্য বা শাস্ত্র আত্মার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহ (The Religious Schools of Buddhism)

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও রীতিনীতি লইয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। এই মতভেদ দূরীকরণের জন্য বৈশালীতে বৌদ্ধগণের এক সম্মেলন হইয়াছিল। কিন্তু সেই সম্মেলন সফল না হওয়ায় বৌদ্ধেরা বিভক্ত হইয়া পড়েন। প্রাচীনপন্থী গোঁড়া বৌদ্ধগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় আচার-ব্যবহারের কঠোরতা শিথিল করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে-সকল ভিক্ষু এই মতের বিরোধিতা করিলেন তাঁহাদের সঙ্ঘ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বহিস্কৃত ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হইয়া ‘মহাসঙ্গিক’ নামে একটি সম্প্রদায় গঠন করিলেন। এই সম্প্রদায় কালক্রমে ‘মহাযান’ সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইল। আর গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদের যে সম্প্রদায় তাহা ‘হীনযান’ নামে পরিচিত হইল।

(ক) হীনযান সম্প্রদায় (Hinayana School)

হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণ অত্যন্ত গোঁড়া ও রক্ষণশীল। তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে হীনযান পন্থীরা ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন না; কিন্তু কর্ম-নিয়মে সম্পূর্ণ আস্থাবান। তাঁহারা বিশ্বাস অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন করেন, নিজের কর্মফল প্রত্যেকেই ভোগ করিতে হইবে এবং যে যেমন কর্ম করিবে সে তেমন ফল ভোগ করিবে। ইহজন্মে যদি নিজ কর্মের ফল ভোগ করা শেষ না হয়, তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

হীনযানপন্থীরা আর একটি কথা বলেন যে, নির্বাণ সব সময় ব্যক্তিগত, অর্থাৎ কেবল নিজের মুক্তিই কাম্য হওয়া উচিত। সমাজ-সেবা, পরোপকার প্রভৃতির কথা না ভাবিয়া নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। মুক্তির পথ সব সময় একজনের জন্য মনে করেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদের হীন (সংকীর্ণ) যান হীনযানপন্থীরা (পথ) বাদী বলা হয়। হীনযানপন্থীরা সর্বাতিবাদী, অর্থাৎ তাঁহারা মন এবং বাহ্যজগৎ উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী; তবে শাস্ত্র বা নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন। হীনযানপন্থীদের মতবাদ পালি ভাষায় লিখিত এবং ত্রিপিটকের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ প্রাচীনপন্থী স্থবিরদের মতবাদ হীনযানীদের মতবাদকে বলিয়া ইহাকে স্থবিরবাদ বা সেরাবাদও বলা হয়। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, স্থবিরবাদ বা সেরাবাদও শ্যামদেশ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশে এই ধর্মমত প্রচলিত ছিল বলিয়া হীনযান মতবাদকে দক্ষিণদেশীয় মতবাদ নামেও অভিহিত করা হয়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক দার্শনিক সম্প্রদায় হীনযান ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

(খ) মহাযান সম্প্রদায় (Mahajana School)

মহাযান ধর্ম-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় সম্রাট অশোক এবং কনিষ্কের মধ্যবর্তী সময়ে। কালক্রমে এই সম্প্রদায় খুবই প্রসার লাভ করে এবং এই প্রসারলাভের হীনযানীদের মত এত অন্যতম কারণ হইল মহাযানপন্থীদের মানবতা ও উদার মনোভাব। মহাযানপন্থীরা বলেন, কেবল নিজের মুক্তি কাহারও লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ কেবল নিজের মুক্তির চেষ্টা করা এক রকম স্বার্থপরতা। প্রকৃত বৌদ্ধের কর্তব্য হইবে সারা বিশ্বের কল্যাণ সাধন করা। বুদ্ধদেব সর্বজীবে দয়া করিবার উপদেশ দিতেন। বুদ্ধদেবের এই উপদেশকে

মহাযানপন্থীরা প্রধান্য দেন। বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বকল্যানই তাদের মূল লক্ষ্য। দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে বিচারে এই সম্প্রদায়কে ভাববাদের সমর্থক বলা যায়। মাধ্যমিক ও যোগাচার দার্শনিক সম্প্রদায় মহাযান ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি উত্তর দেশে মহাযান সম্প্রদায়ের বিস্তার হইয়াছিলো বলিয়া এই ধর্মমতকে "উত্তরদেশীয় বৌদ্ধমত" নামেও অভিহিত করা হয়। ইহাদের মতবাদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

সাংখ্য দর্শন(The Sankhya Philosophy)

সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা হইলেন মহর্ষি কপিল। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্য দর্শনই প্রাচীনতম। সাংখ্য দর্শনের আদি গ্রন্থ হইল কপিল প্রণীত 'তত্ত্ব সমাস'। এই গ্রন্থে সাংখ্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কপিল মুনি, আসুরি এবং পঞ্চশিখ, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তবে যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়, উহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ও প্রামাণিক ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' সর্বপ্রাচীন এবং প্রমাণিক।

তত্ত্বের সংখ্যা গণনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা এই দর্শনের উদ্দেশ্য বলিয়া ইহার নাম 'সাংখ্য'। পক্ষান্তরে, অপর কেহ কেহ বলেন যে, সংখ্যা শব্দের অর্থ সম্যক-জ্ঞান। এই দর্শন সম্যক-জ্ঞান প্রদান করে বলিয়া ইহাকে 'সাংখ্য' নাম দেওয়া হইয়াছে।

'সাংখ্য দর্শন' দ্বৈতবাদী দর্শন। ইহাতে পুরুষ এবং প্রকৃতি, এই দুই মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্যও বলা হয়, যেহেতু সাংখ্য সূত্রে মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মত সাংখ্য দর্শনও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ (চরম লক্ষ্য) বলিয়া মনে করে। সাংখ্য দর্শনের প্রথম সূত্রেই বলা হইয়াছে যে, ত্রিবিধ দুঃখের (যথা, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক) আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ (ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ)।

২। সাংখ্য তত্ত্ববিদ্যা (Sankhya Metaphysics) :

সাংখ্য দর্শন দুইটি মূল তত্ত্বে বিশ্বাসী, – যথা, পুরুষ এবং প্রকৃতি। সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি এবং প্রকৃতিতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়; এক এবং অদ্বিতীয় প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে জগতের উপাদান কারণ বহু। সুতরাং সাংখ্য দর্শন বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদের (Pure Monism) বিরোধী, অপর দিকে বহুত্ববাদেরও (Pluralism) বিরোধী। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি তত্ত্ব কার্যকারণবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রথমেই কার্যকারণবাদ বা সৎকার্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

(ক) কার্যকারণবাদ (Theory of Causation)

সাংখ্য দর্শনের কার্যকারণবাদকে সৎকার্যবাদ বলা হয়। এই সৎকার্যবাদই সাংখ্য দর্শনের প্রধান ভিত্তি। সাংখ্য মতে কারণ ব্যতীত কোন কার্য ঘটে না। সাংখ্য দর্শন মতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে উহা উপাদান কারণের মধ্যে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান (সৎ) থাকে; যেমন, তিল হইতে যখন তৈল উৎপন্ন হয়, তখন তৈলরূপ কার্যের উপাদান কারণ হয় তিল। সাংখ্য মতে তিলের মধ্যে তৈল অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তিন পিষ্ট হইলে তৈলের উৎপত্তি হয়। সুতরাং সাংখ্য দার্শনিকগণের মতে 'সৎ' হইতে 'সৎ'-এর উৎপত্তি, 'অসৎ' হইতে সৎ-এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সাংখ্য দর্শনের সৎকার্যবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে কার্যটি কারণের মধ্যে সুপ্ত থাকে না।

(খ) প্রকৃতি ও গুণসমূহ (Prakriti and the Gunas)

প্রকৃতি সাংখ্য দর্শনের একটি মূল তত্ত্ব। প্রকৃতি প্রধান ও অব্যক্ত নামেও পরিচিত। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে জড়জগতের আদি উপাদান কারণ হইল প্রকৃতি, তবে প্রকৃতি অব্যক্ত। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃতিকে জানা যায় না, যেহেতু প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্রকৃতিকে জানিতে হয় অনুমানের সাহায্যে। সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেন, পুরুষ এই জগতের কারণ হইতে পারে না যেহেতু পুরুষ নিত্য এবং কোন বস্তুর কারণ বা পরিণাম কিছুই পুরুষ নয়। তাঁহাদের মতে প্রকৃতিই হইল জগতের মূল উপাদান কারণ।

এখন প্রশ্ন, প্রকৃতি কি? – প্রকৃতি শব্দের উৎপত্তি 'কৃ' ধাতু হইতে (প্রকৃ+তি)। 'কৃ' ধাতুর অর্থ হইল করা। সুতরাং প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সেই প্রকৃতি, এই বিশ্ব প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি – যাহার কৃতি। প্রকৃতি এই জগতের মূল উপাদান কারণ। প্রকৃতি জগতের সব বস্তুরই মূল উপাদান কারণ। কিন্তু তাহার কোন উপাদান কারণ নাই। সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেন, কেহ যদি প্রকৃতির কারণ খুঁজিতে যায়, তবে 'অনবস্থা' দোষ ঘটিবে। প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাংখ্য দার্শনিকগণ আরও বলেন, প্রকৃতি এক, বহু নয়।

প্রকৃতির তিনটি গুণ ঃ যথা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের সমষ্টি এবং সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি (সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ)। সাংখ্য দর্শনে গুণ বলিতে উপাদানকে বুঝায়। সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি প্রকৃতির উপাদান। ইহাদের গুণ বলিবার কারণ এই যে, ইহারা পুরুষ বা আত্মার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে এবং পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে।

সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, লঘু ও প্রকাশক। প্রীতি, তৃপ্তি, আনন্দ প্রভৃতি সুখের যাবতীয় অবস্থা সত্ত্বগুণে কার্য।

রজোগুণ দুঃখাত্মক, চলনাত্মক (অর্থাৎ নিজে গতিমান) এবং উপষ্টম্ভক (অর্থাৎ অন্য দ্রব্যে গতি সম্ভারক)। জগতের যাবতীয় দুঃখের কারণ হইল প্রকৃতির রজোগুণ।

তমোগুণ হইল মোহাত্মক (মোহের সৃষ্টিকারী) গুরু ও আবরক (যাহা আবৃত করিয়া রাখে)। তমঃ হইতেই জড়তা, ঔদাসীনা, বিষাদ, নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি জন্মে। এই কারণেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে যথাক্রমে গুরুবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

(গ) পুরুষ বা আত্মা (Purusa or the Self)

'পুরুষ' সাংখ্য দর্শনের দ্বিতীয় মূল তত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনের আত্মাকে পুরুষ বলা হয়। সাংখ্য মতে পুরুষ বা আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষ ও প্রকৃতির ন্যায় স্বপ্রকাশ, যেহেতু তাহাকে কেহ প্রকাশ করে নাই; তাহার কোন কারণ নাই। পুরুষ প্রকৃতির ন্যায় নিত্য বা শাস্বত যেহেতু পুরুষের উৎপত্তি নাই, আর বিনাশও নাই। পুরুষ প্রকৃতির ন্যায় সর্বব্যাপী এবং স্বনির্ভর। প্রকৃতি যেমন অর্জ, পুরুষও অর্জ, যেহেতু পুরুষের জন্ম নাই। পুরুষ জড় নয়, তবে জড়ের প্রকাশক। প্রকৃতির বিকার আছে, যেহেতু প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, "কিন্তু পুরুষ নির্বিকার, যেহেতু তাহার কোন পরিবর্তন নাই। প্রকৃতি সৃষ্ট না হইলেও স্রষ্টা, কিন্তু পুরুষ সৃষ্টও নহে, স্রষ্টাও নহে।

প্রকৃতি জ্ঞেয়, আর পুরুষ জ্ঞাতা। প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতি অচেতন, কিন্তু পুরুষ সচেতন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত বলিয়া তাহার সুখ, দুঃখ ও মোহ, কিছুই নাই। পুরুষ কর্তা নহে। পুরুষ স্বভাবত মুক্ত। পুরুষের বন্ধন স্বাভাবিক নয়। অহঙ্কারবশত পুরুষ যখন নিজেকে কর্তা মনে করে, তখন দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার অভিন্নত্ব বোধ জন্মে এবং তখনই বন্ধন প্রাপ্ত হয়। আসলে পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত।

সাংখ্য-জ্ঞানতত্ত্ব (The Sankhya Theory of Knowledge)

সাংখ্য মতে প্রমাণ তিন প্রকার : প্রত্যক্ষ(Perception), অনুমান(Inference) ও শব্দ (Testimony)। উপমান (Comparison), অর্থাপত্তি (Postulation), অনুপলব্ধি (Non-cognition) প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণগুলি এই তিনটি প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সাংখ্য দার্শনিকগণ ইহাদের স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

যে-কোন যথার্থ জ্ঞানের তিনটি শর্ত আছে, যথা জ্ঞাতা বা প্রমাতা (Subject), জ্ঞেয় বা প্রমেয় (Object) এবং জ্ঞান লাভের উপায় বা প্রমাণ (Source of Knowledge)। সাংখ্য মতে পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা।

প্রত্যক্ষ (Perception)—সাংখ্য স্বীকৃত প্রমাণগুলির মধ্যে 'প্রত্যক্ষই' প্রথম প্রমাণ। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহাকে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান' বলা হয়।

প্রত্যক্ষকে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, লৌকিক এবং অলৌকিক। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ করা হয়,—তাহাকে লৌকিক বা বাহ্য প্রত্যক্ষ বলা হয়; আর যোগ-সাধনালব্ধ অলৌকিক শক্তির বলে যোগীরা যখন অতি এবং ভবিষ্যতে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন উহাকে বলা হয় অলৌকিক প্রত্যক্ষ। লৌকিক বা বাহ্য প্রত্যক্ষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, নির্বিকল্প (Indeterminate) এবং সবিবিকল্প (Determinate)। যে প্রত্যক্ষে বস্তুর কেবল অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান হয়, তাহাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলা হয়। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্যকে জানা হয় না। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞান বস্তু সম্পর্কে অপরিষ্কৃত জ্ঞান, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নির্বিকল্পের পরিণতি হইল সবিবিকল্পে। সাংখ্য দর্শনে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে 'আলোচনা' এবং সবিবিকল্প প্রত্যক্ষকে 'বিবেচনা'ও বলা হয়।

অনুমান (Inference) — কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে, সেই বিষয়ের সঙ্গে নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধযুক্ত অন্য আর একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকে অনুমান বলা হয়; যেমন, কোন একটি পর্বতে ধূম

প্রত্যক্ষ করিয়া, যদি ধারণা করা হয় যে, ঐ পর্বতে অগ্নি আছে, তবে এই জ্ঞানকে অনুমানলব্ধ জ্ঞান বলা হইবে। অনুমানের ভিত্তি হইল নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ।

সাংখ্য দর্শন মতে অনুমানকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, বীত এবং অবীত। সদর্শক সামান্য বাক্যকে অবলম্বন করিয়া যে অনুমান গড়িয়া উঠে তাহাকে বীত অনুমান বলা হয়; যেমন, সকল ধূমবান বস্তুই অগ্নিমান, পর্বতটি ধূমবান, সুতরাং পর্বতটি অগ্নিমান।

আর নঞর্থক সামান্য বাক্যকে অবলম্বন করিয়া যে অনুমান গড়িয়া উঠে তাহাকে অবীত অনুমান বলা হয়; বীত অনুমানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, পূর্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট। দুইটি বস্তু বা ঘটনাকে যদি সব সময় একত্রে উপস্থিত থাকিতে পূর্বে দেখা যায় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া যদি কোন অনুমান গড়িয়া উঠে, তবে সেই অনুমানই পূর্ববৎ অনুমান; যেমন, পূর্বে বহুবার ধূম ও অগ্নিকে সহগামী দেখিয়া বর্তমানে কোন পর্বতে ধূম দেখিয়া যদি কেহ অনুমান করে যে, পর্বতটিতে অগ্নি আছে তবে সেই অনুমানের নাম হইবে পূর্ববৎ অনুমান। আর যে অনুমান কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি না করিয়া কেবল সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে, সেই অনুমানই 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান; যেমন, আমরা দেখি, প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে; 'বুদ্ধি' একটি কার্য; সুতরাং তাহারও কারণ থাকিবে।

ন্যায় দার্শনিকদের মত সাংখ্য দার্শনিকগণও বলেন যে, প্রতিটি ন্যায় (Syllogism) অনুমানে পাঁচটি অবয়ব বা তর্কবাক্য থাকিবে; যথা (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন। যেমন,

(১) পর্বতটি অগ্নিমান (প্রতিজ্ঞা) (

২) কারণ ইহা ধূমবান (হেতু)

(৩) সকল ধূমবান বস্তুই অগ্নিমান (উদাহরণ)

(৪) পর্বতটি ধূমবান (উপনয়)

(৫) পর্বতটি অগ্নিমান (নিগমন)।

শব্দ বা আশ্রয়বাক্য (Testimony) – সাংখ্য মতে শব্দ বা আশ্রয়বাক্য তৃতীয় এবং সাংখ্য মতে শব্দ বা সর্বশেষ প্রমাণ। যে সকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে জানা যায় না তাহাদের শব্দ প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। সর্বশেষ প্রমাণ শব্দজ্ঞানের যথার্থ্য (Validity) প্রধানত যে শর্তের উপর নির্ভর করে, সে শর্তটি হইল শব্দ বা আশ্রয়বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করা। আশ্রয়বাক্যের সঠিকভাবে বুঝিতে না পারিলে যথার্থ জ্ঞান সম্ভব নহে।

শব্দ দুই প্রকারের লৌকিক এবং বৈদিক। লৌকিক শব্দ হইল বিশেষ ও বিশ্বাসযোগ্য সাধারণ লোকের বচন, যেমন, একজন কৃষক কর্তৃক তাহার কৃষি সম্পর্কে বর্ণনা। সাংখ্য দার্শনিকগণ লৌকিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন না। কারণ লৌকিক শব্দ-জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে লাভ করা যায়।

ন্যায় দর্শন (The Naya Philosophy)

'ন্যায়দর্শনের' প্রতিষ্ঠাতা হইলেন মহর্ষি গৌতম; তাঁহার আর এক নাম ছিল অক্ষপাদ। তাই ন্যায়দর্শনকে 'অক্ষপাদ-দর্শন'ও বলা হয়। কোন কোন নিয়ম অনুসরণ করিলে আমাদের চিন্তা বা তর্ক ফলপ্রসূ হয় এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে যথাযথ জ্ঞানলাভ করা যায়, এই সকল নির্দেশ দেয় বলিয়া 'ন্যায়দর্শনকে' তর্কশাস্ত্র ও ন্যায়বিদ্যা বলা হয়। প্রত্যক্ষের সাহায্যে যা জানা যায় তা পরবর্তীতে আলোচনা করার নাম অস্বীক্ষা। ন্যায়দর্শন এই অস্বীক্ষার সমাধা করে বলিয়া ন্যায়দর্শনকে আত্মস্বীক্ষীও বলা হয়। ন্যায়দর্শন মুখ্যতঃ 'প্রমাণ' (যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী) সম্পর্কে আলোচনা করে বলিয়া ইহাকে প্রমাণশাস্ত্রও বলা হয়। প্রদীপ যেমন সকল বস্তুকে আলোকিত করে, তেমনি ন্যায়দর্শনও সর্বশাস্ত্রকে নির্ভুলভাবে প্রতিভাত হইতে সাহায্য করে। তাই ন্যায়দর্শনকে অনেকেই 'সর্ববিদ্যার প্রদীপ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

'ন্যায়দর্শন' বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী; তাই ইহা বস্তুবাদী দর্শন; ইহা বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে বলিয়া ন্যায়দর্শনকে আস্তিক দর্শনও বলা হয়। তবে ন্যায়দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইলেও ইহার মতবাদ স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত ন্যায়দর্শন মোক্ষকে (Liberation) জীবনের

পরম পুরুষার্থ (Sumum Bonum) বলিয়া মনে করে, এবং কিভাবে এই চরম পুরুষার্থ বা মোক্ষকে লাভ করা যায়, সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে। সুতরাং ন্যায়দর্শন কেবল তর্কশাস্ত্র এবং প্রমাণশাস্ত্র নহে, ইহা মোক্ষশাস্ত্রও বটে। মহর্ষি গৌতমের 'ন্যায়-সূত্র' ন্যায়দর্শনের মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি 'পঞ্চ অধ্যায়ে' বিভক্ত এবং প্রতিটি অধ্যায় আবার দুই খন্ডে (Section) বিভক্ত।

ন্যায়দর্শনে ষোড়শ পদার্থের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থ :

পদের অর্থের নাম পদার্থ, অর্থাৎ কোন পদ দ্বারা যে অর্থ নির্দিষ্ট হয়, তাহাই পদার্থ। পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞান জীবের মুক্তিলাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন। 'ন্যায়'-মতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার; যথা—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প (১২) বিতন্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি এবং (১৬) নিগ্রহস্থান।

(১) প্রমাণ – যে প্রণালীর দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাই প্রমাণ। 'ন্যায়'-মতে প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

(২) প্রমেয়—প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ই হইল প্রমেয়। 'ন্যায়'-মতে প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার; যথা,—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়-বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি (Cognition), মন, প্রবৃত্তি (Activity), দোষ (Mental defects), প্রেত্ভাব (অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনঃপুনঃ মৃত্যু), ফল (অর্থাৎ দোষ ও প্রবৃত্তিজনিত সুখদুঃখের অনুভূতি), দুঃখ এবং অপবর্গ।

(৩) সংশয়- অনিশ্চিত জ্ঞানকে সংশয় বলা হয়।

(৪) প্রয়োজন—যে উদ্দেশ্যে মানুষ কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই বলা হয় প্রয়োজন।

(৫) দৃষ্টান্ত—যে বিষয় সম্পর্কে কাহারও মতভেদ থাকে না তাহাকে দৃষ্টান্ত বলে।

(৬) সিদ্ধান্ত-যুক্তি-তর্কের সাহায্যে যে বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহাই সিদ্ধান্ত; যেমন, 'আত্মা এক রকমের দ্রব্য' - ইহা ন্যায়দর্শনের একটি সিদ্ধান্ত।

(৭) অবয়ব-ন্যায়ের (Syllogism) অন্তর্গত তর্কবাক্যগুলিকে অবয়ব বলা হয়। ন্যায়দর্শনের মতে অবয়ব পাঁচ রকমের, যথা, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

(৮) তর্ক-কোন স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করিবার জন্য যে যুক্তি, তাহাকে তর্ক বলা হয়।

(৯) নির্ণয়-পরস্পর-বিরোধী মতবাদকে বিচার করিয়া একটিকে বর্জনপূর্বক অপরটিকে গ্রহণ করিবার নাম নির্ণয়।

(১০) বাদ—কেবলমাত্র সত্যতা নির্ধারণের জন্য যদি কোন বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন তাহাকে 'বাদ' বলে। ইহাতে বাদী-বিবাদী উভয়েই সত্যতা নির্ধারণের চেষ্টা করেন; যেমন, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য যে আলোচনা তাহাকে বাদ বলা যাইতে পারে।

(১১) জল্প— তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল নিজের জয়লাভের জন্য বাক্যদ্বয় করিবার নামই জল্প; যেমন, উকিলেরা মাঝে মাঝে বিচারালয়ে জল্প করেন।

(১২) বিতন্ডা-যুক্তিতর্কের দ্বারা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া অপরের মতকে খন্ডন করিবার জন্য বাজে তর্ক করাকেই বিতন্ডা বলে।

(১৩) হেত্বাভাস—যাহা আসলে হেতু নয়, অথচ হেতুর মত দেখায় তাহাকে 'হেত্বাভাস' বলে।

(১৪) ছল- বক্তা যে অর্থে বাক্য প্রয়োগ করেন, প্রতিপক্ষ যখন তাহার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া বক্তার বাক্যে দোষ প্রদর্শন করেন তখন তাহা হয় ছল।

(১৫) জাতি—ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি না করিয়া কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া যখন কোন অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তখন তাহাকে 'জাতি' বলে।

(১৬) নিগ্রহস্থান- বিচারে নিগ্রহের, অর্থাৎ পরাজয়ের স্থান বা কারণকে 'নিগ্রহস্থান' বলে। অজ্ঞানতা বা ভ্রমাত্মক জ্ঞানই পরাজয়ের কারণ। প্রতিপক্ষের মতকে খন্ডন করিতে না পারা, 'নিগ্রহস্থান'।

ন্যায়-জ্ঞানতত্ত্ব (The Naya Theory of Knowledge) :

'ন্যায়দর্শনে' বস্তুতত্ত্ব (Theory of reality) জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চারি প্রকার, যথা, (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান ও (৪) শব্দ।

জ্ঞানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ (Definition and Classification of Knowledge)

'ন্যায়'-মতে জ্ঞান হইল বিষয়ের প্রকাশ। জ্ঞান প্রধানতঃ দুই প্রকার-প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) এবং অপ্রমা (অযথার্থ জ্ঞান)। প্রমাকে আবার চারিভাগে ভাগ করা যায়। যথা, প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। অপ্রমাণও চারিপ্রকার। যথা, স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম বা বিপর্যয় ও তর্ক।

কোন বস্তু বা বিষয়ের অসন্দ্বিগ্ন ও যথার্থ অনুভবকে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে আসলে যে গুণ নাই, সেই গুণকে যদি আমি উহাতে বর্তমান বলিয়া জানি, তবে আমার জ্ঞানকে অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান বলা হইবে; যেমন, কোন একটি রজ্জুর মধ্যে যদি আমি সর্পের গুণ অনুভব করি, তবে আমার জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান।

নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত চারিটি প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

প্রত্যক্ষ (Perception) :

ন্যায়দর্শনে 'প্রত্যক্ষের' স্থান সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান। নৈয়ায়িকগণের মতে প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণই 'সিদ্ধ' নহে। অনুমান, উপমান এবং শব্দ সবই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল;

কোন কোন নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকের মতে প্রত্যক্ষ হইল সাক্ষাৎ জ্ঞান।। তাঁহাদের মতে 'প্রত্যক্ষ' হইল সাক্ষাৎ জ্ঞান, যাহা অন্য জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। সম্মুখস্থ টেবিলটিকে যখন প্রত্যক্ষ করি, তখন তাহাকে আমরা সাক্ষাৎভাবেই জানি। নব্য নৈয়ায়িকগণও প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞাটি স্বীকার করেন।

প্রত্যক্ষের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Perception)

ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা, লৌকিক (Ordinary) এবং অলৌকিক (Extraordinary)। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দুই প্রকারের—বাহ্য (External) ও আন্তর (Internal)। আর এক রকম বিভাগ অনুসারে লৌকিক প্রত্যক্ষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, নির্বিকল্প (Indeterminate), সবিকল্প (Determinate) এবং প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) অলৌকিক প্রত্যক্ষও আবার তিন প্রকারের সামান্যলক্ষণ (Perception of Class), জ্ঞানলক্ষণ (Complication) ও যোগজ (Intuitive Acquired Perception of Yogas)

অনুমান (Inference) :

অনুমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল জ্ঞানের পশ্চাৎগামী জ্ঞান; 'অন' শব্দের অর্থ 'পশ্চাৎ', আর 'মান' শব্দের অর্থ, 'জ্ঞান'। সাধারণ অর্থে অনুমান হইল সেই জ্ঞান যাহা অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে। কোন জ্ঞাত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া এবং তাহার দ্বারা সমর্থিত হইয়া যদি কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা হয়, তবে তাহাকে 'অনুমান' বলা হইবে।

অনুমানের অবয়ব (The Constituents of Inference) :

নৈয়ায়িকদের মতে যে-কোন অনুমানে তিনটি পদ (Perm) থাকিবে। যথা, সাধ্য (Major), পক্ষ (Minor) এবং হেতু বা লিঙ্গ বা সাধন(Middle)। যাহা অনুমিত হয় তাহা 'সাধ্য', যাহার মধ্যে সাধ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা হয় তাহা 'পক্ষ' এবং যে জিনিসের প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় তাহা 'হেতু' বা 'লিঙ্গ' বা "সাধন"। একটি উদাহরণের সাহায্যে পদগুলিকে বিবৃত করা হইল

ঐ পর্বতে ধূম আছে

যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে অগ্নি আছে,

ঐ পর্বতে অগ্নি আছে।

উপরি-উক্ত অনুমানে অগ্নি হইল সাধ্য (Major Term); কারণ, ঐ অনুমানে অগ্নি অনুমিত হইয়াছে; পর্বত হইল পক্ষ (Minor Term); কারণ পর্বতের মধ্যে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইয়াছে, আর ধূম হইল হেতু বা লিঙ্গ বা সাধন; কারণ, ধূমের ভিত্তিতে অগ্নিকে অনুমান করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীরাও প্রত্যেক ন্যায় অনুমানে (Syllogism) সাধ্য, পক্ষ এবং হেতু বা লিঙ্গ বা সাধন, এই তিনটি পদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রত্যেক অনুমানে অন্ততঃ তিনটি বচন থাকিবে।।

পঞ্চ-অবয়বী ন্যায় (Five-membered syllogism)

নৈয়ায়িকদের মতে অনুমান দুই প্রকারের। যথা, স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান অনুমানকারীর নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যদি কোন অনুমান করা হয়, সেই অনুমানের নাম নৈয়ায়িকদের মতে স্বার্থানুমান; আর অপরের কাছে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য যে অনুমান করা হয় তাহা পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না; কিন্তু পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানকে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন আছে। তাই নৈয়ায়িকগণ একটি অনুমানকে পাঁচটি অবয়বের (বচনের) সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। এইজন্য নৈয়ায়িকদের অনুমানকে পঞ্চ-অবয়বী ন্যায় (Five-membered syllogism) বলা হয়। এই অবয়বগুলির নাম হইল, (১) প্রতিজ্ঞা বা প্রমাণের বিষয়, (২) হেতু বা কারণ, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় বা উদাহরণের প্রয়োগ এবং (৫) নিগমন বা সিদ্ধান্ত। এখন একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়কে ব্যাখ্যা করা যাক।

(১) পর্বত অগ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)

(২) কারণ পর্বত ধূমবান (হেতু)

(৩) যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে অগ্নি আছে, যেমন, পাকশালা, (উদাহরণ)

(৪) পর্বত ধূমবান (উপনয়)

.. (৫) পর্বত অগ্নিমান (নিগমন বা সিদ্ধান্ত)

পাশ্চাত্য বা অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের তুলনা (Comparison between Western or Aristotelian Syllogism and Indian Syllogism)

ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে পাশ্চাত্য বা অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কোন কোন বিষয়ে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সাদৃশ্যগুলি:

(১) উভয় প্রকার ন্যায় তিনটি পদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়; যথা, সাধ্য (Major), পক্ষ (Minor) এবং হেতু (Middle)।

(২) উভয় ন্যায় হেতুর মাধ্যমে পক্ষের সহিত সাধ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) উভয় ন্যায় সার্বিক সম্পর্ক বা ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানের মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়।

(৪) পাশ্চাত্য ন্যায় তিন অবয়ববিশিষ্ট, কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় ন্যায় ও "তিন অবয়ববিশিষ্ট। তিন অবয়ববিশিষ্ট ন্যায়ের সমর্থনকারী ন্যায়াচার্যগণ ন্যায় প্রতিজ্ঞা ও হেতু, এই দুই বচনের দুইবার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করেন।

(৫) উভয় ন্যায় তর্কবাক্যের মধ্যে একটি সার্বিক বচন হইবে, এই কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

বৈসাদৃশ্যগুলি:

(১) পাশ্চাত্য ন্যায় সকল সময় তিনটি অবয়ববিশিষ্ট; কিন্তু ভারতীয় ন্যায় পঞ্চ-অবয়বে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(২) তিন অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের অবয়বের ক্রম পাশ্চাত্য ন্যায়ের অবয়বের বিপরীত। ভারতীয় তর্কবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তকে প্রথমেই ব্যক্ত করেন এবং হেতু ও সাধ্যের সার্বিক সম্পর্ককে সর্বশেষে ব্যক্ত করেন; আর পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীরা হেতু ও সাধ্যের সার্বিক সম্পর্ককে প্রথমে ব্যক্ত করেন এবং সিদ্ধান্তকে সর্বশেষে ব্যক্ত করেন।

(৩) পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীরা ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান (Figure) এবং বিভিন্ন মূর্তি (Mood) স্বীকার করেন; কিন্তু ভারতীয় তর্কবিজ্ঞানীরা ন্যায়ের সংস্থান বা মূর্তির কোনটাকেই স্বীকার করেন না।

(৪) পাশ্চাত্য ন্যায়ের লক্ষ্য অনুমানের কেবল আকারগত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু ভারতীয় ন্যায়ের লক্ষ্য অনুমানের আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

(৫) পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীরা অনুমানকে অবরোহ এবং আরোহ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; কিন্তু ভারতীয় তর্কবিজ্ঞানীগণ অবরোহ এবং আরোহ এই উভয় প্রকার অনুমানের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

অনুমানের ভিত্তি (The Grounds of Inference) :

অনুমান করিতে হইলে যে জিনিসের নিতান্তই প্রয়োজন, তাহাকে অনুমানের ভিত্তি বলা হয়। ন্যায়দর্শন মতে অনুমানের দুইটি ভিত্তি যথা, (১) পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষ এবং (২) সাধ্য ও হেতুর ব্যতিক্রমহীন (Invariable) নিয়ত (Universal) সম্পর্ক-জ্ঞান; সাধ্য ও হেতুর ব্যতিক্রমহীন নিয়ত সম্পর্ককে নৈয়ায়িক পারিভাষিক অর্থে ব্যাপ্তি বলা হয়। এই 'ব্যাপ্তি' ন্যায়দর্শনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ, এই ব্যাপ্তিই অনুমান-পদ্ধতির মূল ভিত্তি। এই ব্যাপ্তিকে অনুমান-পদ্ধতির মেরুদণ্ড বলা যায়।

ব্যাপ্তি কাহাকে বলে? (What is Vyapti?)—হেতু ও সাধ্যের যে ব্যতিক্রমহীন সহ-উপস্থিতির (Co-existence) সম্পর্ক তাহার নাম হইল ব্যাপ্তি; যেমন, যেখানেই ধূম, সেখানেই অগ্নি। এই বচনে ধূম ও অগ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাপ্তি দুই প্রকার; যথা, সমব্যাপ্তি এবং অসম বা বিষমব্যাপ্তি। যে ব্যাপ্তি সম্পর্কে ব্যাপক (সাধ্য) এবং ব্যাপ্যের (হেতুর) বিস্তৃতি সমান, সেই ব্যাপ্তিকে সমব্যাপ্তি বলে, ব্যাপ্তি দ্বিবিধ : যথা, যেমন, যাহা উৎপন্নশীল তাহা বিনাশশীল। মানুষ এবং বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের মধ্যে যে ব্যাপ্তি তাহাও সমব্যাপ্তি। আর যে ব্যাপ্তি সম্পর্কে ব্যাপক এবং ব্যাপ্যের বিস্তৃতি অসমান, সেই ব্যাপ্তিকে অসম বা বিষমব্যাপ্তি বলে; যেমন, যাহা ধূমবান তাহা অগ্নিমান। এখানে ধূম এবং অগ্নির বিস্তৃতি সমান নয়। তাই ধূম এবং অগ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক তাহা অসম বা বিষমব্যাপ্তি। মানুষ এবং মরণশীল জীবের মধ্যে যে ব্যাপ্তি তাহাও অসম বা বিষমব্যাপ্তি।

সুতরাং ব্যাপ্তি হইল দুইটি পদের ব্যতিক্রমহীন (Invariable), উপাধিহীন (Unconditional), ও নিয়ত (Universal) সহ-উপস্থিতির (Co-existence) সম্পর্ক।

অনুমানের শ্রেণীবিভাগ (The Classification of Inference) :-- নৈয়ায়িকগণ অনুমানকে বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে, বিভক্ত করিয়াছেন। অনুমান যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে তাহার ভিত্তিতে অনুমানকে তাঁহারা দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। অনুমানকারীর নিজের জ্ঞানলাভের জন্য যে অনুমান করা হয় তাহাই স্বার্থানুমান, আর অপরের কাছে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য যে অনুমান করা হয় তাহাই পরার্থানুমান।

অপর একটি নীতি অনুসারে অনুমান তিন প্রকার, যথা, পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। যে অনুমানে কারণকে প্রত্যক্ষ করিয়া অপ্রত্যক্ষ কার্যকে অনুমান করা হয় তাহাকে পূর্ববৎ অনুমান বলা হয়; যেমন, আকাশে ঘন কাল মেঘ প্রত্যক্ষ করিয়া অনুমান করা হয় যে, বৃষ্টি হইবে। আর যে অনুমানে কার্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া অপ্রত্যক্ষ কারণকে অনুমান করা হয় তাহাকে শেষবৎ অনুমান বলা হয়; যেমন, ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া উঠানে জল দেখিয়া অনুমান করা হয় যে, রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিল।

কার্য-কারণ নীতিকে অবলম্বন না করিয়া কেবল পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া যে অনুমান করা হয়, তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা হয়; যেমন, চাঁদনি রাতে বিভিন্ন সময়ে আকাশের দিকে তাকাইয়া চাঁদের বিভিন্ন অবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া অনুমান করা হয় যে, চাঁদের গতি আছে।

অপর আর একটি নীতি অনুসারে নৈয়ায়িকগণ অনুমানকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা, কেবলাস্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অস্বয়-ব্যতিরেকী। হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া এই শ্রেণীবিভাগটি করা হইয়াছে।

যে অনুমানে ব্যাপ্তি-সম্পর্ক কেবলমাত্র অস্বয়ী দৃষ্টান্তের উপর (অর্থাৎ যেখানেই হেতু সেখানেই সাধ্য) নির্ভরশীল তাহাকে কেবলমাত্র বলা হয়। যে অনুমানে ব্যাপ্তি-সম্পর্ক কেবলমাত্র ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তে উপর (অর্থাৎ যেখানেই হেতু নাই সেখানেই সাধ্য নাই) নির্ভরশীল তাহাকে কেবল-ব্যতিরেকী বলা হয়; যেমন, যাহা অগ্নিমান নয় তাহা ধূমবান নয়।

পর্বত ধূমবান

পর্বত অগ্নিমান।

যে অনুমানে ব্যাপ্তি সম্পর্ক অস্বয় ও ব্যতিরেকী এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের উপর (অর্থাৎ, যেখানেই হেতু সেখানেই সাধ্য এবং যেখানেই হেতু নাই সেখানেই সাধ্য নাই) নির্ভরশীল তাহাকে অনয়-ব্যতিরেকী বলা হয়।

হেত্বাভাস (Fallacies in Inference) :- ‘হেত্বাভাস’ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দুইটি শব্দ পাই, যথা, হেতু এবং আভাস (হেতু+আভাস)। যে অনুমানের হেতু প্রকৃতপক্ষে হেতু নয়, হেতুর আভাস মাত্র (অর্থাৎ আসলে হেতু নয় হেতুর মত দেখায় মাত্র), সেই অনুমান ভ্রান্তিজনক এবং এই ভ্রান্তির নাম হেত্বাভাস। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে যে সকল হেত্বাভাস বা অনুমান-সংক্রান্ত দোষ দেখা যায়, সবগুলিই বস্তুগত (Material), আকারগত (Formal) নয়। নৈয়ায়িকদের মতে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকারের, যথা, (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) সংপ্রতিপক্ষ, (৪) অসিদ্ধ ও (৫) বাধিত।

কার্যকারণ সংক্রান্ত মতবাদ

কার্য-কারণ সম্পর্কে ন্যায়-দর্শনের মতবাদ ‘অসৎকার্যবাদ’ নামে পরিচিত। ন্যায় দার্শনিকগণ সাংখ্যের সৎকার্যবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা বলেন, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে উহা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে না। তাঁহাদের মতে উপাদান কারণ হইল সৎ, আর কার্য হইল অসৎ। ন্যায়-দর্শন মতে ‘সৎ’ হইতে ‘অসৎ’ এর উৎপত্তি বা আরম্ভ। নৈয়ায়িকগণের মতবাদকে আরম্ভবাদও বলা হয়, যেহেতু তাঁহাদের মতে কার্য সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি বা আরম্ভ। নৈয়ায়িকদের মতে কারণ এবং কার্যের ভিন্ন সত্তা আছে; তাহা যদি না হইত তবে কারণ হইতে কার্যকে পৃথক করা যাইত না।

উপমান (Comparison) :-

নৈয়ায়িকগণের মতে উপমানও যথার্থ জ্ঞানলাভের একটি উপায় বা প্রমাণ। পরিচিত কোন বস্তুর সঙ্গে অপরিচিত কোন বস্তুর সংজ্ঞার সাহায্যে সংজ্ঞা সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ঐ অপরিচিত বস্তুটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের যে সম্পর্কে যে জ্ঞান তাহাই পদ্ধতি তাহাকে বলা হয় উপমান এবং উপমানলব্ধ জ্ঞানকে বলা হয় উপমিতি।

শব্দ (Testimony) :-

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দও যথার্থ জ্ঞানলাভের একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাঁহাদের মতে শব্দ হইল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আগুবাক্য। আগুব্যক্তি হইলেন তিনিই, যিনি সত্য জানেন এবং সত্য বলেন। শব্দ বা আগুবাক্য হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই শব্দ জ্ঞান। যে সব বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমানের দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায় না সেই সব বিষয় সম্পর্কে শব্দের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায়। শব্দ-জ্ঞানের যথার্থ্য একটি প্রধান শর্তের উপর নির্ভর করে এবং সেই শর্তটি হইল, আগুবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা। জ্ঞানের বিষয়ে অনুসারে শব্দ প্রমাণ দুই প্রকারের; যথা, দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আগু-ব্যক্তির যে বচন তাহাই দৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ; যেমন, বিশ্বাসযোগ্য কৃষকের তাঁহার ভূমি সম্পর্কে বচন, বিশ্বাস-যোগ্য কোন সাক্ষীর কোন ঘটনা সম্পর্কে আদালতে দেওয়া সাক্ষ্য ইত্যাদি। আর প্রত্যক্ষযোগ্য নহে এমন কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আগু-ব্যক্তির যে বচন তাহাই অদৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ; যেমন, অণু, পরমাণু প্রভৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বচন; পাপ, পুণ্য, আত্মা, পরজন্ম প্রভৃতি সম্পর্কে মুনিঋষিদের বচন ইত্যাদি। আর এক দিক হইতে শব্দকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; যথা, লৌকিক ও বৈদিক। সাধারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির যে বচন তাহা লৌকিক শব্দ প্রমাণ। আর বেদের যে বচন তাহা বৈদিক শব্দ প্রমাণ।

ন্যায়-জগত তত্ত্ব (The Nyaya Theory of the Physical World) নৈয়ায়িকগণ বলেন, জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে; তাহারা নিছক মনের ধারণা নয়, অর্থাৎ জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব কেবল জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল

নয়। নৈয়ায়িকদের মতে প্রমেয় (জ্ঞানের বিষয়) বারটি। যথা, নৈয়ায়িকেরা বলেন, আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (ইন্দ্রিয় বিষয়), বুদ্ধি বা জ্ঞান, মন, প্রবৃত্তি জগৎ এবং জাগতিক দোষ (মানসিক ত্রুটি), প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম), ফল (সুখ-দুঃখের বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে অনুভব), দুঃখ এবং অপবর্গ (মোক্ষ)। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই সপ্ত পদার্থের অস্তিত্বও নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের মতে এই পদার্থও প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয়। নৈয়ায়িকদের মতে সব প্রমেয় জড়জগতের অংশ নয়; যেমন, আত্মা, বুদ্ধি বা জ্ঞান ও মন ভৌতিক নয় বলিয়া জড়জগতের অংশ নয়। আকাশ, দেশ (Space) ও কাল (Time) নিত্য ও অসীম দ্রব্য। দেশ ও কাল ভৌতিক দ্রব্য নয়, তবে ভৌতিক দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নৈয়ায়িকদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চারিটি মহাভূতের দ্বারা এই জগৎ গঠিত। নৈয়ায়িকেরা সরল বস্তুবাদী দার্শনিক (Naive Realists): তবে তাঁহারা দ্বৈতবাদী, যেহেতু তাঁহারা জড়জগৎ ও আত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

আত্মার মুক্তি

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত ন্যায়দর্শনও জীবাত্মার মুক্তিলাভকে জীবের পরম পুরুষার্থ (চরম লক্ষ্য) বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আত্মার মুক্তি বলিতে নৈয়ায়িকেরা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই (Absolute negation of pain) বুঝিয়াছেন। আত্মার বন্ধাবস্থা (Bondage) তথা দুঃখের কারণ সম্পর্কে নৈয়ায়িকেরা বলেন, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বন্ধাবস্থা সূচনা করে। বন্ধাবস্থায় আত্মার দুঃখভোগ অনিবার্য; কারণ, দেহ থাকিলেই দেহস্থিত ইন্দ্রিয় বিভিন্ন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়; ফলে দেহ নানারকমের দুঃখভোগ করে এবং সেই দুঃখে আত্মাও অভিভূত হয়। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে আত্মার সম্পূর্ণ বিচ্ছাতি না হওয়া পর্যন্ত তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তথা মুক্তি সম্ভব নয়। তাই মুক্তাবস্থায় আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। নৈয়ায়িকদের মতে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞানের। আত্মা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় হইতে যে ভিন্ন, এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে জীবাত্মার মুক্তি সম্ভব নয়।

ন্যায়-ঈশ্বরতত্ত্ব (The Nyaya Theory of God) :

নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং মুক্তিলাভের জন্য ঈশ্বরের করুণার নিতান্ত প্রয়োজন, এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন জীবাত্মার মুক্তি সম্ভব নয়।

(ক) ঈশ্বরের স্বরূপ (The Nature of God) : ন্যায়দর্শন মতে আত্মা, দুই প্রকারের; যথা, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। তিনি জগতের স্রষ্টা, রক্ষক এবং সংহারক। ঈশ্বর আকাশ, মন এবং আত্মার সাহায্যেই ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন ও আত্মা—এইগুলি সবই নিত্য দ্রব্য এবং জগতের উপাদান কারণ। ঈশ্বর এই নিত্য দ্রব্যগুলিকে সৃষ্টি করেন নাই। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের ন্যায় ইহাদেরও অস্তিত্ব ছিল এবং জগৎ ধ্বংসের পরও ইহাদের অস্তিত্ব থাকিবে। সুতরাং ঈশ্বর জগতের উপাদান কারন না, নিমিত্ত কারণ। কুস্তকার যেমন মৃত্তিকারূপ উপাদানের সাহায্যে ঘট নির্মাণ করেন, ঈশ্বরও তেমনি নিত্য দ্রব্যগুলির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎ সৃষ্টির পর তিনিই জগৎকে রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনবোধে তিনিই এই জগৎকে ধ্বংস করেন। তাই তাঁহাকে এই জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক বলা হয়।

বেদান্ত দর্শন(The Vedanta Philosophy)

'বেদান্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'বেদের অন্ত বা শেষ'। বেদান্ত বলিতে মুখ্যতঃ উপনিষদকেই বুঝায়। এখন প্রশ্ন, উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয় কেন? নানাদিক হইতে বিচার করিয়া উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। প্রথমত, বেদের শেষ অংশ হইল উপনিষদ। বেদ চারি প্রকারের; যথা, ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার তিনটি অংশ; যথা: মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। মন্ত্র বা সংহিতা অংশে আছে বেদের মন্ত্রগুলি, ব্রাহ্মণ অংশে আছে সংহিতায় উক্ত যাগযজ্ঞাদির বিবরণ ও ব্যাখ্যা, আর উপনিষদে আছে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা। দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রপাঠের ক্রম অনুসারেও উপনিষদ সর্বশেষ;

প্রথমে মন্ত্র, তারপর ব্রাহ্মণ, তার পরে আরণ্যক এবং সর্বশেষে পাঠ করিতে হয় উপনিষদকে। তৃতীয়ত, উপনিষদগুলিতেই বৈদিক চিন্তাধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। কাজেই উপনিষদ বেদান্ত নামে অভিহিত।

উপনিষদ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায়—উপ-নি-সদ-ক্ৰিপ্। উপ শব্দের অর্থ হইল সমীপে। সুতরাং উপনিষদ শব্দটির অর্থ হইল গুরুর সমীপে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করা। উপনিষদের আরও একটি অর্থ আছে; যাহা মানুষকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায় তাহাকে উপনিষদ বলা হয়। উপনিষদেই বেদের গূঢ় তাৎপর্য নিহিত আছে; তাই উপনিষদকে কখনও কখনও বেদোপনিষদ বলা হয়। উপনিষদ সংখ্যায় বহু। অদ্যাবধি ১১২ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া গিয়াছে।

বেদান্তের প্রধান দুটি শাখা (The two main schools of the Vedanta)

শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়েই অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা দুইজনই সর্বব্যাপী এক পরমতত্ত্বে বিশ্বাসী। উভয়ের মতেই জগৎ জড়ের সৃষ্টি নয়। এমন কি, জড় এবং চেতনের সংযোগেও জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। ঈশ্বর জড় উপাদান দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মত তাঁহারা দুইজনের কেহই বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে অচেতন জড় এবং চেতন জীব পৃথক তত্ত্ব নহে। পরন্তু উভয়েই ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। শঙ্কর এবং রামানুজ সৃষ্টি ব্যাপারে প্রতিপক্ষদের মতবাদকে খণ্ডন করেন।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ :

অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন মতবাদ, ইহার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের নাম বিশেষভাবে জড়িত, শঙ্করাচার্যকে অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক বলা হয়। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের মূল কথা হইল, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীবই ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্যের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত নয়, ব্রহ্মের ভ্রান্ত প্রকাশ। মায়ার প্রভাবেই ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রকাশিত হয়।

জগৎ সম্বন্ধে শঙ্করের মত (Sankara's Conception of The World) :- শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা। জগতের কোন সত্তা নাই। এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তু বা ভ্রম-প্রত্যক্ষের বস্তুর ন্যায় মিথ্যা অবভাস মাত্র (Mere appearance); ইহা মায়ার সৃষ্টি।

এখন প্রশ্ন, এই মায়ার স্বরূপ কি? শঙ্কর বলেন, এই মায়া ব্রহ্মেরই একরকম শক্তি এবং ইহা অবর্ণনীয়। ব্রহ্মের এই মায়াশক্তি যাদুকরের যাদুশক্তির মত মানুষকে ভ্রান্তিতে ফেলিতে পারে। যাদুকর যেমন তাঁহার যাদুশক্তির বলে একটি ব্রহ্মেরই একরকম শক্তি টাকাকে অনেক টাকা দেখাইয়া সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করিতে পারেন, তেমনি ব্রহ্মও তাঁহার এই মায়ারূপ শক্তির দ্বারা অজ্ঞ মানুষকে অসত্য জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করাইতে পারেন। তিনি (শঙ্কর) আরও বলেন, যাদুকর যেমন তাঁহার যাদুশক্তির দ্বারা অন্য একজন যাদুকরকে প্রতারিত করিতে পারেন না এবং নিজেও প্রতারিত হন না, তেমনি ব্রহ্মও তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা কোন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে ভ্রান্তিতে ফেলিতে পারেন না এবং নিজেও ভ্রান্তিতে পড়েন না। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কেবল ব্রহ্মের সত্তাই উপলব্ধি করেন, জগৎ এবং মায়ার সত্তা উপলব্ধি করেন না।

শঙ্করের মতে ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণ হইলে মানুষের অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা (Ignorance)। অবিদ্যার দুইটি শক্তি আছে; যথা, আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তির দ্বারা অবিদ্যা প্রথমে অধিষ্ঠানকে আবৃত করিয়া উহাকে আমাদের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখে যেমন, এখানে রজ্জুকে লুকাইয়া রাখিয়াছে) এবং পরে বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারা মিথ্যা-বস্তুর সৃষ্টি করে (যেমন, এখানে সর্পকে সৃষ্টি করিয়াছে)। শঙ্কর বলেন, অনুরূপভাবে জগতের ব্যাখ্যাও করা যায়। মানুষ তাহার অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম করে। মানুষের অবিদ্যা মানুষ হইতে ব্রহ্মকে লুকাইয়া রাখে এবং তাহার স্থলে জগৎকে বিক্ষেপ করে।

পরিণামবাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতপক্ষে কার্যে পরিণত হয়; যেমন, দুধ দধিতে পরিণত হয়। সুতরাং দধি হইল দুধেরই পরিণাম। আর বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ কার্যে পরিণত হয় না, কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। রামানুজের মতে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং সৃষ্টির মাধ্যমে এই অব্যক্ত জগৎ ব্যক্ত হয়। সুতরাং এই দৃশ্যমান জগৎ কার্য এবং ব্রহ্মই ইহার কারণ। শঙ্কর কিন্তু এই মতের বিরোধী। তিনি বলেন, ব্রহ্ম জগতে পরিণত হন না, জগৎরূপে প্রতিভাত হন মাত্র; যেমন, রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন রজ্জু সর্পে পরিণত হয় না, সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র।

শঙ্করের ব্রহ্মবাদ (Sankara's Conception of God) :- শঙ্করের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ। শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী, কারণ তিনি ব্রহ্মের সত্তা ছাড়া আর কোন কিছুই সত্তা স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত ও নিৰ্গুণ। ব্রহ্ম এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আত্মাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সৎ, চিত্ত ও আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম সৎ অর্থ তিনি অসৎ নহেন, ব্রহ্ম চিত্ত অর্থ জড় নহেন এবং ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ অর্থ তিনি দুঃখস্বরূপ নহেন। ব্রহ্ম ব্রহ্ম সৎ, চিত্ত নিৰ্বিশেষ, অর্থাৎ তাঁহার কোন বিশেষ নাই। শঙ্করের মতে দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্রহ্মকে বর্ণনা করা যায়; যথা, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী (Empirical point of view) ও পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্রহ্মকে বর্ণনা দৃষ্টিভঙ্গী (Transcendental point of view)। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী হইল জ্ঞান-প্রসূত। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে (Empirical point of view) জগৎ সত্য এবং ব্রহ্মই এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং সংহারকর্তা।

শঙ্করের মতে দৃশ্যমান জগৎ সত্যিকারের জগৎ নয়; ইহা অবভাসমাত্র। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি নিৰ্গুণ ও নিরবয়ব। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে (Transcendental point of view) ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, রক্ষক বা সংহারক কিছুই নহেন; তিনি নিরাকার ও নিৰ্গুণ। তাঁহার কোন প্রকারভেদ নাই।

ভেদ তিন প্রকারের, যথা; স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। একই জাতীয় দুই জীবের মধ্যে যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলা হয়; যেমন, দুইটি ঘোড়ার মধ্যে যে ভেদ। ভিন্নজাতীয় দুইটি জীবের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলা হয়; যেমন একটি গরু ও একটি ছাগলের যে ভেদ। একই জীবের শরীরের বিভিন্ন অংশের যে ভেদ তাহাকে বলা হয় স্বগত ভেদ; যেমন, একটি গরুর শরীরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভেদ। এই তিন প্রকারের ভেদের কোনপ্রকার ভেদ ব্রহ্মের নাই। ব্রহ্মের সদৃশ কোন বস্তু নাই বলিয়া তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ চিন্তা করা যায় না; ব্রহ্মের নাই; তিনি সত্য, জ্ঞান অসদৃশ কোন বস্তু নাই বলিয়া তাহার বিজাতীয় ভেদও চিন্তা করা যায় না এবং ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া তাঁহার স্বগত ভেদও থাকিতে পারে না।

শঙ্করের মতে আত্মা, বন্ধন ও মোক্ষ (Sankara's Conception of Soul, Bondage and Liberation)

শঙ্করের মতে আত্মা ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। উপনিষদেও পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, জীব ও ব্রহ্ম এক। শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী। তিনি কোন প্রকারভেদে বিশ্বাস করেন না। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ প্রভৃতি সকল প্রকার ভেদই মায়া কল্পিত ও মিথ্যা।

আত্মার বন্ধন (Bondage of the Self) হইল দেহের সঙ্গে আত্মা একাত্মতাবোধ। আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা-বশতঃ আত্মা নিজেকে দেহের সহিত অভিন্ন মনে করে এবং নিজেকে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা মনে করে। ফলে দেহের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক প্রভৃতিকে নিজের বলিয়া মনে হয়। ইহাই আত্মার বন্ধাবস্থা। বন্ধাবস্থায় আত্মা তাহার ব্রহ্মত্ব বিস্মৃত হয়। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের এই অভাবই তাহার বন্ধাবস্থার কারণ।

এখন প্রশ্ন, আত্মার মুক্তি (Liberation of the Self) কিভাবে সম্ভব? শঙ্কর বলেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে আত্মা তাহার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং তখনই আত্মার মুক্তি হয়। শঙ্করের মতে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মার মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। কেবল আত্মজ্ঞানই, অর্থাৎ আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায়। এখন প্রশ্ন, কি উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়? শঙ্কর বলেন, এই জ্ঞান লাভ করা শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞান খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই ইহার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। তিনি বলেন, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে চতুর্বিধ সাধনার প্রয়োজন; যথা:

- (১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, অর্থাৎ নিত্য বস্তু অনিত্য বস্তু হইতে যে ভিন্ন এই বোধ
- (২) ইহা সূত্রার্থ—ভোগবিরাগ, অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় বস্তুর প্রতি বিরাগ
- (৩) শমদমাদি স্মধন সম্পদ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম অভ্যাস, এবং

(৪) মুমুক্শুত্ব, অর্থাৎ চিন্তে মুক্তি লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

মুক্তিলাভের পরেও আত্মা প্রারদ্ধকর্মবশে কিছুকাল দেহ অবস্থান করিতে পারে। মানুষের কর্ম তিন প্রকার; যথা- প্রারদ্ধ বা আরদ্ধ কর্ম, সঞ্চীত কর্ম এবং সঞ্চীয়মান কর্ম। যে কর্ম ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই কর্মকে 'আরদ্ধ বা মুক্তিলাভের পরেও প্রারদ্ধ কর্ম' বলা হয়। যে কর্ম অতীতে সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মা প্রারদ্ধ কর্মবশে এখনও ফল প্রসব করে নাই, সেই কর্মকে 'সঞ্চীত কর্ম' বলা হয়। কিছুকাল দেহে অবস্থান আর যে কর্ম বর্তমানে করা হইতেছে এবং কোন ফল প্রসব করে নাই, করিতে পারে সেই কর্ম 'সঞ্চীয়মান কর্ম'। মানুষের বর্তমান দেহ ও সুখ-দুঃখ তাহার প্রারদ্ধ কর্মের ফল।

শঙ্করের মতে আত্মার মুক্তি কেবল দুঃখের আতান্তিক নিবৃত্তি নয়, মুক্ত অবস্থায় আত্মা এক দিব্য আনন্দ লাভ করে। কারণ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বের উপলব্ধিই মুক্তি।

জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of Knowledge) :-

প্রমাণ (Source of Knowledge) :

প্রমাণ সম্পর্কে শঙ্করের মতবাদ মীমাংসকদের মতবাদেরই অনুরূপ। মীমাংসকদের ন্যায় তিনিও ছয় প্রকারের প্রমাণ স্বীকার করেন, যথা, প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), শব্দ (Testimony), উপমান (Comparison), অর্থাপত্তি (Postulation) এবং অনুপলব্ধি (Non-Perception)।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ :-

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক। দর্শনের পরব্রহ্মবাদ এবং ধর্মিকের ঈশ্বরবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রামানুজের দর্শনকে উভয়-বেদান্ত নামেও অভিহিত করা হয়। রামানুজ তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'বেদান্ত সংগ্রহ', 'শ্রীভাষ্য', 'বেদান্তদীপ', 'বেদান্তসার' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রামানুজ রচনা করিয়াছেন।

জগৎ সম্বন্ধে রামানুজের মত (Ramanuja's conception of the World) : রামানুজের মতে জগৎ সত্য ও সনাতন, তবে ব্রহ্মাধীন। ব্রহ্মই এই জগতের স্রষ্টা। ব্রহ্মের শক্তি অনন্ত। তাঁহার স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ নাই বটে, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে; কেননা তিনি চিৎ ও অচিৎ এই দুই অবিচ্ছেদ্য অংশের অধিকারী। এই অংশগুলিও ব্রহ্মের ন্যায় সনাতন। মাকড়সা যেমন তাহার দেহ হইতে তন্তু বাহির করিয়া জাল বুনে, তেমনি ব্রহ্মও তাঁহার চিৎ অংশ হইতে জীব এবং অচিৎ অংশ হইতে জড়জগতের সৃষ্টি করেন। সেই কারণে রামানুজ ব্রহ্মের অচিৎ অংশকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকৃতি সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতির ন্যায় অজ এবং নিত্য। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি এবং রামানুজের প্রকৃতির পার্থক্য এই, - সাংখ্যের প্রকৃতি স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র সত্তা; কিন্তু রামানুজের প্রকৃতি স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র সত্তা নহে। ইহা ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্মের কোন অভাব নাই; কোন অভাব পূরণের জন্য তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। জগৎ সৃষ্টি হইল তাঁহার শক্তি ও আনন্দের লীলা।

রামানুজ সংকার্যবাদের সমর্থক। সংকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপন্ন হওয়ার আগে উপাদান কারণের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কার্য কারণের ব্যক্ত রূপ। রামানুজের মতে ব্রহ্মের চিৎ অংশ জীবের এবং অচিৎ অংশ জগতের উপাদান কারণ, যেহেতু জীব ও জগতের আবির্ভাব হয় এই দুই উপাদান হইতে। এই আবির্ভাব ব্রহ্ম নিয়ন্ত্রণ করেন; তাই ব্রহ্মকে জীব ও জগতের নিমিত্ত কারণও বলা হয়। রামানুজের মতে সৃষ্টির আগে জীব ব্রহ্মের চিৎ অংশে, আর জড় জগৎ ব্রহ্মের অচিৎ অংশে বিদ্যমান থাকে।

সংকার্যবাদের দুইটি রূপ, যথা, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ কার্যে পরিণত হয় না, কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র; যেমন, রজ্জুতে যখন সর্প প্রত্যক্ষ করা হয়, তখন রজ্জুই সর্পের কারণ; কিন্তু কারণ হইলেও রজ্জু সর্পে পরিণত হয় না, সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। আর পরিণামবাদ অনুসারে কারণ কার্যে পরিণত হয়; যেমন, মৃত্তিকা হইতে

যখন কলসী তৈয়ারী হয়, তখন মৃত্তিকা কলসীতে পরিণত হয়। রামানুজ এই পরিণামবাদে বিশ্বাসী; শঙ্কর কিন্তু বিবর্তবাদে বিশ্বাসী।

রামানুজের ব্রহ্মবাদ (Ramanuja's conception of God) : রামানুজের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ম)। তিনি চিৎ ও অচিৎ- বিশিষ্ট পরম তত্ত্ব। তাঁহার বাহিরে কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই; কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়) এই দুই সত্তা বিদ্যমান। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মেরই দুইটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ব্রহ্ম যেমন নিত্য, তাঁহার অংশগুলিও নিত্য। রামানুজের মতে এক ব্রহ্মে বহুর স্থান আছে। রামানুজের মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলিবার কারণ এই যে, রামানুজ চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়াছেন।

রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম ভেদহীন নহে। অবশ্য ব্রহ্মের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, যেহেতু তাঁহার একজাতীয় বা ভিন্নজাতীয় কোন বস্তু নাই, কিন্তু ব্রহ্মের স্বজাতীয় ও তাঁহার স্বগত ভেদ (অঙ্গগত ভেদ) আছে, যেহেতু তাহার অভ্যন্তরে জীব ও জড় রহিয়াছে। রামানুজের মতে ব্রহ্ম অসংখ্য সং গুণের অধিকারী।

জীব ও জড়ের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য রামানুজ রাজা-প্রজার উপমাও দিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মকে রাজা এবং জড় ও জীবকে তাঁহার প্রজা বলিয়াছেন। রাজা যেমন প্রজাদের শাসন করেন, কিন্তু প্রজাদের সুখ-দুঃখে বিচলিত হন না; তেমনি ব্রহ্ম ও জীবজগৎকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন; কিন্তু জীবজগতের দোষ-ত্রুটি তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সচেতন পুরুষ। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি করুণা- তাহার বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন, অজ্ঞানীকে জ্ঞান, শক্তিহীনকে শক্তি দান করেন এবং অপরাধীকে ক্ষমা করেন। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবের উপাস্য এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তিই জীবের লক্ষ্য। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া জীবের মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিলেই জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে।

রামানুজের মতে আত্মা, বন্ধন ও মোক্ষ (Ramanuja's conception of the Self, Bondage and Liberation)

আত্মা :

রামানুজের মতে আত্মা ব্রহ্মেরই অংশ, যেহেতু ব্রহ্মের অংশ সেইহেতু আত্মা অসীম নয়, সসীম। আত্মা দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হইতে পৃথক। দেহযুক্ত আত্মাই জীব। জীবের দেহ ব্রহ্মের অচিৎ অংশ হইতে সৃষ্ট; কিন্তু আত্মা সৃষ্ট নয়; আত্মা ব্রহ্মের চিৎ অংশ। আত্মা নিত্য, তাই অজ ও অমর। রামানুজের মতে আত্মা আসলে সর্বব্যাপী নয়। আত্মা অণু পরিমাণ, তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। চৈতন্য আত্মার আকস্মিক গুণ নয়, চৈতন্য আত্মার নিত্য গুণ। সর্বাবস্থাতে চৈতন্য আত্মায় অবস্থান করে। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা হইল ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক।

আত্মার বন্ধন :

রামানুজের মতে কর্মফল ভোগের জন্যই আত্মা দেহের মধ্যে বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। নিজ নিজ কর্ম অনুসারে আত্মা দেহ ধারণ করে। আত্মার দেহ ধারণই হইল আত্মার বন্ধন (Bondage)। আত্মা ও দেহের এই একীকরণের নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের জন্যই আত্মা পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং সকাম কর্ম সম্পাদন করে। ফলে বারবার তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং রামানুজের মতে অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাই আত্মার বন্ধনের কারণ।

আত্মার মুক্তি :—রামানুজের মতে আত্মার মুক্তিলাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন। কর্ম বলিতে রামানুজ বর্ণাশ্রম অনুসারে বেদ-নির্দেশিত যাগযজ্ঞাদি উদযাপন করাকেই বুঝিয়াছেন। কর্ম- মীমাংসা অধ্যয়ন ও নিক্ষেপভাবে যাগযজ্ঞাদি সম্পাদনের পর মুমুক্শু (মোক্ষকামী) বুঝিতে পারেন যে, কেবল কর্মের দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভব নয়, জ্ঞানলাভেরও মুক্তির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। তখন মুমুক্শু ব্যক্তির মধ্যে বেদান্ত পাঠের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মুমুক্শু ব্যক্তি আরও বুঝেন যে, কেবল বেদান্ত পাঠের দ্বারাও মোক্ষলাভ সম্ভব নয়, ঈশ্বরের কৃপারও প্রয়োজন।

রামানুজ বলেন, মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজন যথার্থ জ্ঞানের। যথার্থ জ্ঞান হইল ঈশ্বরের ধ্রুবা-স্মৃতি, অর্থাৎ সব সময় স্মরণ।

জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of Knowledge) :

(১) প্রমাণ (Source of Knowledge) :-

রামানুজ প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference) এবং আগম (Scripture) এই তিন প্রকার প্রমাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ—রামানুজের মতে প্রত্যক্ষ হইল সাক্ষাৎ জ্ঞান।

প্রত্যক্ষ দুই প্রকারের যথা, নিত্য ও অনিত্য

অনিত্য প্রত্যক্ষ আবার দুই প্রকারের যথা যোগজ ও অযোগজ। রামানুজ নির্বিকল্প এবং সবিকল্প—প্রত্যক্ষের এই দুইটি ভাগকেও স্বীকার করেন

অনুমান—রামানুজের মতে সাধারণ সত্য হইতে পাওয়া জ্ঞানই অনুমান। তিনি বলেন, সাধারণ সত্যে পৌঁছিতে একাধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না। বস্তুত একটি দৃষ্টান্ত হইতেই সাধারণ সত্য লাভ করা যায়। একাধিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা আমাদের সংশয়কে দূর করি।

আগম—রামানুজের মতে শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানই আগম; তাঁহার মতে অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান কেবল শাস্ত্রের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। চরম সত্যকে শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৩৬-১৯০২)

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারী নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। নরেন্দ্রনাথ পরে বিবেকানন্দ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতার নাম ভবেন্দ্রী দেবী।

রামকৃষ্ণ মিশন:

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হলো। মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল :

১. জনসাধারণের মানসিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা ২. শিল্প ও কারিগরি বিদ্যার শিক্ষাদান।

৩. জনসাধারণকে বেদান্ত ও ধর্ম চিন্তায় উৎসাহিত করা।

মিশনের কর্মসূচি সম্পর্কে স্পষ্টই বলা হয়-

"The aims and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitanean, it shall have no connection with politics."

বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মঠ। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সকল সন্ন্যাসীকে এর নিয়মাবলি অনুসারে চলতে হবে। প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনকে মঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কার্যকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় একে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হল। প্রচারকার্যের সুবিধার্থে স্বামীজি আলমোড়া থেকে 'প্রবন্ধ ভারত' (১৮৯৯), কলকাতা থেকে 'উদ্বোধন' (১৮৯৯) এবং মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন' (১৮৯৫) নামে তিনটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

দর্শন চিন্তা :

বিবেকানন্দের দর্শনে প্রাচ্যের দুজন দার্শনিকের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এর একজন হলেন শংকর এবং অপরজন গৌতম বুদ্ধ। শংকরের, মায়াবাদের প্রভাব তাঁর দর্শনে পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধদেবের দর্শন দ্বারা পুরাপুরি প্রভাবিত না হলেও বিবেকানন্দ তাঁর বৈশ্বিক মানবতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের ওপর শংকরের প্রভাব মূলত দর্শনগত; পক্ষান্তরে বুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যবহারগত। শংকরের কাছ থেকে তিনি বিশ্ব প্রপঞ্চের স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞানের সন্ধান পান। আর বুদ্ধের কাছ থেকে ইহ জীবনে মানুষের কর্তব্য সম্পর্কিত ব্যবহারিক নির্দেশ পান। বিবেকানন্দের হৃদয় ছিল বুদ্ধের, আর মস্তিষ্ক শংকরের।

বিবেকানন্দ শংকরের বেদান্তকে মানুষের কাছে প্রচার করে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। তিনি শংকরের মায়াবাদের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি বেদান্তের ব্যবহারিক দিকের নির্দেশ করেন। সাধারণত মনে করা হয় যে, মায়াবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কিন্তু মায়াবাদের অর্থ এই নয় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। এটা এরকম

হতে পারে যে, ইন্দ্রিয় ভ্রমের জন্যই আমরা এককে বহু ও বৈচিত্র্যরূপে দেখি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করলেন যে, বেদান্তকে জীবনে সক্রিয় রূপ দিতে হবে। এরই নাম তিনি দিলেন বাস্তব বা ক্রিয়াশীল বেদান্ত, Practical Vedanta। তাঁর প্রচারিত বেদান্ত নব্য-বেদান্ত নামে পরিচিত। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। "ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইব" বলে তিনি অনুভব করেন। ঈশ্বর সকল বস্তুতে বিরাজমান। সর্ববস্তু ও জীবই ঈশ্বর আছেন এবং মানুষের কাছে তিনি মানুষরূপেই প্রকাশিত। এ তত্ত্ব বেদান্তেরই। বেদান্তে সূত্র তিনভাবে দেখা হয়েছে, যথা :

১. প্রাতিভাসিক, অর্থাৎ বাস্তব না হয়েও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন, স্বপ্ন দেখা।
২. ব্যবহারিক, অর্থাৎ অবাস্তব অথচ সাংসারিক বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল্য আছে এমন কিছু।
৩. পারমার্থিক, অর্থাৎ পরম সত্য বা ব্রহ্ম সংক্রান্ত যেটা ব্যবহারিকের বিপরীত।

মানবতাবাদ :

দীর্ঘকাল যাবৎ মানবতাবাদের দুটি ধারা চলে এসেছে। একটি নিরীশ্বরবাদী ধারা এবং অপরটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ধারা। নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদের মতে, মানুষই সব কিছুর কেন্দ্র বিন্দু, প্রেরণার মূল উৎস। মানুষ নিজেই তাঁর ভাগ্য নিয়ন্ত্রা। মানুষের নৈতিক ও যাবতীয় মূল্যবোধের উৎস হলো তার সহজাত যুক্তিবোধ। অপরদিকে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ অনুসারে, সকল কাজ কর্ম ও প্রেরণার উৎস হলো অশরীরী এক আধ্যাত্মিক সত্তা। মানুষ সেই শক্তির অংশ। মানুষের মধ্য দিয়ে ঐশী সত্তার প্রকাশ ঘটে।

উনিশ শতকে বাংলার নব জাগরণে নিরীশ্বরবাদী ও আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের বিকাশ ঘটে। ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীরা ছাড়াও অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদের সমর্থক। অন্যদিকে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর চিন্তা চেতনার মুখ্য উপাদান ছিল মানুষ।

স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি মূলত একজন মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমিক। তাঁর জীবন সাধনা ও দর্শন চিন্তার মূল লক্ষ্যই মানুষ। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বঙ্গীণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর পরম ব্রত। মানবপ্রেমের সাধনাতেই তিনি জীবন ও মননের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে চেয়ে ছিলেন।

তিনি মানবপ্রেমের প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর গুরু শ্রী রামকৃষ্ণের কাছ থেকে। বিবেকানন্দ জীব সেবার মধ্যে ঈশ্বরকে লাভ করার আদর্শ খুঁজে পান। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। তিনি মানুষের মধ্যে উচ্চ, নিচু, অস্পৃশ্যতা, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে পার্থক্য করতে রাজি নন। সব মানুষকেই তিনি নারায়ণ হিসেবে দেখতেন। স্রষ্টা এক এবং তার সৃষ্ট সকল মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এ চেতনা সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে মানব-কল্যাণে পরিচালিত করবে।

ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব The Philosophy of Vivekananda and the future of Man (1963) গ্রন্থে স্বল্প পরিসরে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিবেকানন্দের সর্বজনীন ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০)

বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁর মতে, শ্রীঅরবিন্দ উপমহাদেশের চিন্তাবিদ ও ঋষিপুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে The Life Divine, The Synthesis of Yoga, Secrets of the Vedas, Essays on the Gita বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাভাষায় অরবিন্দের রচনা খুবই সামান্য। কিন্তু যে অল্প সংখ্যক রচনা তাঁর আছে তাদের ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু অনবদ্য। বাংলায় রচিত তাঁর দুর্গা স্তোত্র-কে ছন্দে ও গাভীরে সংস্কৃত রচনার সাথে তুলনা করা যায়। আলিপুর জেলে নিজের

বন্দীজীবনের উপর "কারাকাহিনী" নামে একটি পুস্তিকা তিনি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি 'ধর্ম' নাম দিয়ে বাংলাভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন।

'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা করা হয়। তাতে সমগ্র ভারতবর্ষে ক্ষোভ ও আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। অন্যান্য অনেকের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে রচনা করেন 'নমস্কার' নামক বিখ্যাত কবিতা এবং শ্রীঅরবিন্দকে সম্বোধন করে বলেন : "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি তুমি।" "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায়।

জীবনদর্শন

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন ও দিব্যতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ নিপুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় তাঁর দিব্যজীবন (The Life Divine) নামক অমর গ্রন্থে। এছাড়া যোগপদ্ধতির সমন্বয় (The Synthesis of Yoga) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় তাঁর অখণ্ড যোগ-সাধনার রূপস্বরূপ ও প্রয়োগ-পদ্ধতির বিশদ বিবরণ। তাঁর মতে "ব্রহ্ম হচ্ছেন সমস্ত অস্তিত্বের মূলবিহীন মূল, এবং জীবন তাঁরই একটি মাত্র অভিব্যক্তি। ব্রহ্ম কেবলমাত্র জীবনের উৎসই নন, তার ভিত্তিও, তার সত্তার সর্বৈব সত্য; আবার তার সর্বোচ্চ সামগ্রিক ফলস্বরূপও তিনি। মানবজীবনের শ্রীঅরবিন্দ মানবপ্রকৃতির, বিশেষত আত্মার সীমাহীন শক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, ব্রহ্ম হচ্ছেন সব অস্তিত্বের আদি উৎস এবং জীবন ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তিস্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের মায়াবাদ স্বীকার করেননি, এবং এজন্যই জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেননি। তাঁর মতে ব্রহ্ম যেমন সত্য, ব্রহ্মের অংশ হিসেবে জগৎও সত্য। জগৎ এবং এর সব সসীম সত্তা ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, সুতরাং তারা কিছুতেই অসৎ বা অলীক হতে পারে না। আর জগৎ যদি স্বপ্ন হয়, সেই স্বপ্ন তো পরমসত্যেরই অন্তর্গত।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন : 'বস্তু আসলে চৈতন্যে বিধৃত।' (Matter is another form of the spirit)। নিখিল বিশ্বের ইতিহাস চৈতন্যের ক্রমাভিব্যক্তিরই ইতিহাস। বস্তু, প্রাণ, মন সবই যে এক চৈতন্য শক্তির ক্রমিক অভিব্যক্তি।

মোট কথা, শ্রীঅরবিন্দ জড়জগৎ ও জড়বস্তুর বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন; তাঁর মতে, জড়বস্তু পরমসত্তা নয়, বরং এ বস্তুজগতের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে পরমসত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা। এ সমগ্র জগৎ এক সুদূরপ্রসারী দিব্য-ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। "মহাবিশ্বের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থেকে সৃষ্টি প্রবাহকে তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শ্রেণীর দার্শনিক মত উদ্দেশ্যবাদ (teleology) নামে পরিচিত। ... বিশ্বশক্তি কিভাবে তাঁর ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা দেয়া আছে।"

বিবর্তন ও উদ্দেশ্যবাদ

পাশ্চাত্যের আধুনিক বিবর্তনবাদীদের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দও মনে করেন যে, ক্রমবিবর্তন জগতের এক স্বাভাবিক ধারা। এ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জড়ের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে প্রাণ এবং প্রাণে সঞ্চারিত হচ্ছে চেতনা; আর পরবর্তী পর্যায়ে এ চেতনাই পরিপক্বতা অর্জন করছে আত্মসচেতন মানুষে। ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্য ও ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। জগৎ এবং জগতের বস্তু ও ঘটনাবলিকে বাদ দিয়ে পরমসত্তার সন্ধান লাভ অসম্ভব। জীবনের প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের পরিপূর্ণতা অর্জনের অব্যাহত প্রয়াস; আর জীবন, মন তথা অস্তিত্বকে ঈশ্বরের ছন্দে রূপায়িত করাই বিবর্তনের তাৎপর্য। জীবনসাধনার লক্ষ্য ক্রমশ ওপরের দিকে ওঠা। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বুকে জড়ের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হতে হতে সৃষ্টি হয়েছে মানুষ। মানুষের স্বকীয়তা নিহিত মনে; আর এই মনসম্পন্ন ব্যক্তিকেই বিবর্তিত হতে হবে অতিমানসিক ব্যক্তিতে। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এ মানুষই রূপান্তরিত হয় অতিমানবে। সত্তা ক্রমশ ওপরের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে দিব্যজীবনের (Divine Life) চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। তবে এ উর্ধ্বায়ন প্রক্রিয়া বস্তুজগৎকে অস্বীকার করে ব্রহ্মে স্থিত হতে চায় না, বরং দিব্য জ্যোতি ও দিব্য আনন্দকে উর্ধ্বভূমি থেকে নামিয়ে আনতে চায় মাটির পৃথিবীতে। বস্তুত, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষ শেষ পর্যন্ত জ্ঞানশক্তির এমন এক অবস্থায় উন্নীত হয় যেখানে খোদ পরমসত্তা নেমে এসে তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের পথে আরোহণের শেষ পর্বে মানুষ যে অখণ্ড জ্ঞানের অধিকারী হয়, সে জ্ঞানের পথ যুক্তির নয়, ইন্টুইশন বা স্বাভাবিক জ্ঞানের পথ। “মানুষ তখন স্বতঃপূর্ণের অধিকারী সত্তায় পরিণত হয়। তখন ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিত্ববোধ লোপ পাবে এবং তা মূলসত্তা সচ্চিদানন্দের আবির্ভাবের কেন্দ্ররূপেই সেকাজ করবে। এই হলো আরোহণের চূড়ান্ত অবস্থা এবং বিকাশের পরিণতি। পর্যায়েই মানুষ অর্জন করে অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্ঞান; এখানেই মানুষ রূপান্তরিত হয় অতিমানবে।

পূর্ণযোগ ও অতিমানব

ফরাসি বিবর্তনবাদী দার্শনিক বার্তসোঁ (১৮৫৯-১৯৪১) পৃথিবীকে অভিহিত করেছিলেন দেবত্ব উৎপাদনের বাহন বলে। মাটির পৃথিবীতে দেবত্ব সৃষ্টির এ সম্ভাবনার কথাই ঘোষণা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিবর্তনতত্ত্বে। এ তত্ত্ব অনুসারে, খোদ প্রকৃতির মধ্যেই এমন এক সাধনপ্রণালী ত্রিাশীল যার অনুশীলনে মানুষ অর্জন করে পরিপূর্ণ জ্ঞান, নিজের চেষ্টায়ই পরিণত হতে পারে অতিমানবে। মানুষ যখন এ পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হবে, তখন সমাধান হবে জীবনের ও সমাজের সব আপাত দ্বন্দ্বের, স্বস্তি পাবে দিশেহারা ব্যক্তিসত্তা; শান্তি স্থাপিত হবে জীবনের বুকে, সমাজের বুকে। এটাই বিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণতি। এটাই পূর্ণযোগের মর্মকথা।

শ্রীঅরবিন্দ ‘অতিমানব’ কথাটার চেয়ে ‘বিজ্ঞানপুরুষ’ (gnostic being) কথাটাই ব্যবহার করেছেন বেশি। বিজ্ঞানপুরুষ যথার্থই একজন পরাজ্ঞানসম্পন্ন জ্যোতির্ময় পুরুষ, এমন এক মহাপুরুষ যিনি অর্জন করেছেন যথার্থ জ্ঞান, যাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ মানবকল্যাণের প্রতি, এবং যিনি মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারেন উচ্চতর আদর্শের জন্য। নিজের মধ্যে দেবতাকে লাভ করা মানুষের লক্ষ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : (৩৫-৪৭) তম বিসিএস প্রিলির নৈতিকতা ও সুশাসন অংশের প্রশ্নসমূহ ব্যাখ্যাসহ পড়ে নিবেন, এক্ষেত্রে Live mcq app এ প্রদত্ত বিসিএস প্রিলির প্রশ্নগুলো থেকেও চর্চা করতে পারেন

Some great Philosophers and their Notable works

Plato :

1.The Republic : A foundational work of Western philosophy, this dialogue discusses the ideal state, justice, and the role of philosopher-kings.

2.Symposium:

Explores the nature of love, famously introducing the concept of Platonic love as a longing for the ultimate Form of Beauty.

3.Apology:

Plato's account of Socrates's defence speech at his trial, offering insights into Socrates' character and philosophical mission.

4.Crito:

A dialogue where Socrates discusses civic duty and justice with his friend Crito while imprisoned.

5.Phaedo:

Details Socrates' final conversations with his followers before his death, touching on the immortality of the soul.

6.The Laws:

Aristotle:

1. Nicomachean Ethics:

Aristotle's most famous philosophical work, it defines the concept of happiness (eudaimonia) as an activity of the soul in accordance with virtue, emphasizing the importance of developing good habits and finding the "golden mean" between extremes.

2.The Politics: This work analyzes different forms of government and discusses the ideal constitution based on the needs and desires of citizens.

3. Metaphysics: A comprehensive treatise that explores fundamental aspects of reality, such as existence, substance, causality, and the relationship between matter and form.

4. The Organon: This is the name given to a collection of Aristotle's works on logic, including texts like Prior Analytics and Posterior Analytics, which laid the foundations for Western formal logic.

5. Rhetoric: A work on the art of effective communication, exploring how to persuade an audience.

6. Poetics: Considered the first work of literary criticism, it analyzes the elements of epic and tragic poetry, profoundly influencing the study of literature and other art forms.

7. Physics

8. De Anima (On the Soul)

Bertrand Russell (1872 - 1970)

Russell was awarded the Nobel Prize in Literature in 1950 in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought.

Notable works:

1. The Principia Mathematica: (The Principia is a three-volume work on the foundations of mathematics)

2. The Problems of Philosophy :(This book is an introduction to the central issues of philosophy, discussing topics such as reality, existence, knowledge, freedom, and ethics)

3. A History of Western Philosophy : (This book provides a comprehensive overview of Western philosophy from the pre-Socratic philosophers through the Middle Ages and the Renaissance, up to the early 20th century)

4. Introduction To Mathematical Philosophy

(The book explores the foundational concepts of mathematics from a philosophical perspective, aiming to clarify the logical underpinnings of mathematical principles)

5. Why I Am Not a Christian

6. Logic And Knowledge : ("Logic and Knowledge" is a collection of essays that delve into the philosophical inquiries surrounding logic, mathematics, and epistemology)

7. What I Believe : (Essays on Religion and Related Subjects)

8 . The Conquest Of Happiness : (The book explores the nature of happiness and the various factors that contribute to or detract from it. It

dives into the psychological and societal obstacles that prevent individuals from achieving happiness)

9 . Power: A New Social Analysis

10 . Marriage And Morals

11. The Scientific Outlook

12. Religion And Science

13. The Practice And Theory Of Bolshevism

14. Has Man A Future? (An Inquiry into the Dangers of Nuclear War)

15. The Problems With Philosophy

Immanuel kant (1724 - 1804)

Notable works:

1. The Critique of Pure Reason (1781)

2. The Critique of Practical Reason (1788)

3. The Critique of Judgment (1790)

4. The Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785)

5. Prolegomena to Any Future Metaphysics

6. Religion within the Boundaries of Mere Reason

7. Perpetual Peace (1795)

John Locke (1632 - 1704)

Notable works :

1. An Essay Concerning Human Understanding (1689) (which explores the origins of human knowledge)

2. Two Treatises of Government (1689/90) (a foundational text of liberalism that argues for natural rights and government by consent)

3. A Letter Concerning Toleration (1689)

4. Some Thoughts Concerning Education (1693)

David Hume (1711-1776)

Notable works :

1. A Treatise of Human Nature (1739-1740)

2. An Enquiry Concerning Human Understanding (1748)

3. An Enquiry Concerning the Principles of Morals (1751)

4. Dialogues Concerning Natural Religion (published posthumously in 1779):

5. Essays, Moral, Political, and Literary

6. The History of England

John Stuart Mill:

Notable works -

1. A System of Logic (1843)

2. Principles of Political Economy (1848)

3. On Liberty (1859)

4. Utilitarianism (1861)

5. The Subjection of Women (1869)

Karl Marx (1818- 1883)

1. Das Kapital (1867)

2. The Communist Manifesto (1848)(co-authored with Friedrich Engels)

3. The German Ideology

সোৱেন কিয়ের্কেগার্ড(S. Kierkegaard 1813 - 1855)

Notable works :

1. Either/Or

2. The sickness unto death

3. Fear and Trembling

4. The concept of anxiety

5. The Philosophical Fragments

কার্ল জাসপার্স/ইয়েসপার্স(Karl Jaspers)

Notable works:

1. Man in the modern age

2. Way to wisdom: an introduction
to philosophy

3. Philosophy of Existence

4. Reason and existence

5. The origin and goal of history

গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (Gabriel Marcel)

Notable works:

1. Homo Viator

2. Being and Having

3. The mystery of being

4. On the ontological mystery

5. Man Against mass society

মার্টিন হিডেগার (Martin Heidegger)

Notable works:

1. Being and Time

2. The origin of the work of art

3. Contributions to philosophy

4. Letter on Humanism

5. The question concerning

technology

জ্যা পল সার্ত্রে (Jean Paul Satre, 1905-1980)

Notable works:

Philosophical Works:

1. Being and Nothingness (1943):

exploring existentialist themes of consciousness, freedom, and the nature of being.

2. Existentialism is a Humanism

(1946): A lecture defending existentialism against accusations of nihilism and promoting its humanist aspects.

3. The Transcendence of the Ego (1936):

An early work exploring the nature of the self and consciousness.

4. Critique of Dialectical Reason (1960,

1985): A two-volume work exploring Marxism and its relationship to existentialism.

Literary Works:

5. **Nausea (1938)**: A novel exploring themes of alienation, meaninglessness, and existence through the character of Antoine Roquentin.

6. **No Exit (1944)**: A play exploring existential themes of hell, human relationships, and self-deception.

7. **The Flies (1943)**: A play based on the Greek myth of Orestes, exploring themes of freedom and responsibility.

8. **The Roads to Freedom** (trilogy): A series of novels exploring the lives of individuals in France before, during, and after World War II, including *The Age of Reason*, *The Reprieve*, and *Troubled Sleep*.

9. **The Words (1963)**: An autobiography exploring Sartre's childhood and his relationship with literature.

N.B. In 1964 he declined the Nobel Prize for Literature, which had been awarded to him “for his work which, rich in ideas and filled with the spirit of freedom and the quest for truth, has exerted a far-reaching influence on our age.”

Friedrich Nietzsche :

Notable works:

1. **Thus Spake Zarathustra** : He mentioned about Super human (অতিমানব) in this book.

2. **On the genealogy of morality**

3. **The will to power**

4. **Beyond good and evil**

5. **Daybreak**

6. On truth and untruth

Franz Kafka

Notable works:

1. The Metamorphosis (1915 -published in 1925)

(A novella about a traveling salesman, Gregor Samsa, who wakes up one morning transformed into a monstrous insect, leading to his family's disgust and eventual relief at his death)

2. The Trial(1925)

(A novel following Josef K., who is arrested for an unknown crime and spends the remainder of the

book trying to understand and defend himself against a mysterious, inaccessible legal system)

3. The Castle

4. In the Penal Colony

5. Amerika (also known as The Man Who Disappeared)

6. A Hunger Artist

Albert Camus

Notable works:

1. The Stranger (1942)

2. The Plague (1947)

3. The Fall (1956)

4. Sisyphus (1942)

5. Caligula (1945)

উইলিয়াম জেমস(William James) আমেরিকার একজন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও প্রয়োগবাদী দার্শনিক।

Notable works:

1. The principles of psychology

2. The varieties of religious experience

3. Pragmatism

4. Essays in Radical Empiricism

5. The will to believe

জন ডিউই (John Dewey)

একজন আমেরিকান প্রয়োগবাদী চিন্তাবিদ।

Notable works:

1. Democracy and Education

2. Experience and Education

3. How we think

4. Human nature and conduct

5. Logic: The theory of inquiry

এফ সি এস শিলার (F. C.S Schiller)

জার্মান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রয়োগবাদী দার্শনিক।

Notable works:

1. Riddles of the Sphinx (1891, 1910)
2. Humanism (1903)
3. Studies in Humanism (1907)
4. Formal Logic (1912)

যোশিয়া রয়সে (Josiah Royce) রয়সে আমেরিকান নব্য ভাববাদী ধারার দার্শনিক। তার গ্রন্থ গুলো হলো:

1. Spirit of Modern philosophy
2. The world and the individual
3. The Religious aspect of philosophy
4. The Philosophy of Loyalty

Thomas Hobbes:

1. Leviathan
2. On Man
3. On Bodies

Rousseau (রুশো)

1. Social Contract
2. Confessions

Rene Descartes(রেনে দেকার্ত)

1. Meditations on First Philosophy
2. Discourse on the Method
3. Principles of Philosophy

Francis Bacon:

1. Novum Organum
2. The Advancement of Learning

Henri Bergson :

1. Time and Free Will
2. Creative Evolution
3. The Two Sources of Morality and Religion

A.J Ayer

1. Language, Truth and Logic
2. The Problem of Knowledge
3. The Central Questions of Philosophy

F. H. Bradley

1. Appearance and Reality

2. Essays on Truth and Reality

3. Ethical Studies

G.W.F Hegel

1. Phenomenology of Spirit

2. Encyclopaedia of the Philosophical Sciences

3. Science of Logic

Gottfried Wilhelm Leibniz

1. Monadology

2. Discourse on Metaphysics

3. New Essays on Human Understanding

4. Theodicy

দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ২০০+ mcq

1. দর্শনের জনক থেলিসের দর্শনকে কি নামে অভিহিত করা হয়?

ক) পানি দর্শন খ) অধ্যাত্ম দর্শন

গ) আগুন দর্শন ঘ) ভৌত দর্শন

উত্তর: ক

থেলিসের মতে জগতের আদি ও মূল উপাদান পানি।

তাই তার দর্শনকে পানি দর্শনও বলা হয়।

2. নির্বিচারবাদের মূল ভিত্তি নয় কোনটি?

ক) ধর্মীয় গোঁড়ামি খ) অন্ধ বিশ্বাস

গ) নাস্তিকতা ঘ) পূর্ব পরিকল্পিত ধারণা

উত্তর: গ

নির্বিচারবাদ মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধ বিশ্বাস, পূর্ব

পরিকল্পিত ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়

3. নিচের কোন বক্তব্যটি যথার্থ নয়?

ক) সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিসীমা সংকীর্ণ

খ) দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে আলোচনা

করে

গ) দর্শনের পরিসর বিজ্ঞান এর তুলনায় ব্যাপক

ঘ) বিজ্ঞান ঘটনার বিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ধারণ করে।

উত্তর: ঘ

বিজ্ঞান শুধু ঘটনার(fact) বিশ্লেষণ করে, তার মূল্য

নির্ধারণ বা নৈতিকতা যাচাই করেনা

4. "Sophia" শব্দের অর্থ কি?

ক) Philosophy খ) Loving

গ) Blessing ঘ) Knowledge

Philosophy শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Philos' ও 'Sophia '

থেকে এসেছে, Philos অর্থ Loving, Sophia অর্থ

Knowledge

5. দর্শনকে "No mans land" এর সাথে তুলনা

করেছেন-

ক) Bertrand Russell

খ) Friedrich Nietzsche

গ) Immanuel kant

ঘ) Bradley

উত্তর: ক

বার্ট্রান্ড রাসেল দর্শনকে ধর্ম ও বিজ্ঞান এর মধ্যবর্তী একটি অনধিকৃত প্রদেশ(No mans land) বলেছেন

6. দর্শনের কোন শাখাকে "Methodology " বলা হয়ে থাকে?

ক) Intuitionism

খ) Epistemology

গ) Ontology

ঘ) Psychology

উত্তর: খ

Epistemology(জ্ঞানবিদ্যা) কে Methodology (পদ্ধতিবাদ) বলা হয়ে থাকে

7. "Philosophy aims at the knowledge of the eternal.... " - কার উক্তি?

ক) Socrates

খ) Kant

গ) Aristotle

ঘ) Plato

উত্তর: ঘ

"Philosophy aims at the knowledge of the eternal, of the essential nature of things " - Plato

8. " A system of Logic " is written by-

ক) মিল

খ) জোসেফ

গ) বেহাম

ঘ) এরিস্টটল

উত্তর: ক

জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৪৩ সাথে তার "A system of logic" গ্রন্থটি ২ টি ভলিউমে প্রকাশ করেন।

9. হিউমের অনুষ্ণ নিয়মগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

ক) Laws of succession

খ) Laws of contiguity

গ) Laws of integrity

ঘ) Laws of similarity

হিউমের মতে অনুষ্ণের নিয়ম ৩ টি। যথা:

Contiguity (সান্নিধ্য), Succession

(পারস্পর্য), Similarity (সাদৃশ্য)

10. "An unexamined life is not worth living" কার উক্তি?

ক) প্লেটো

খ) আলেক্সান্ডার

গ) কান্ট

ঘ) সক্রেটিস

উত্তর: ঘ

An unexamined life is not worth living(অপরীক্ষিত জীবন যাপনের যোগ্য নয়) - সক্রেটিসের উক্তি

11. "Symbolic Logic"- গ্রন্থটির লেখক কে?

ক) J.S Mill

খ) I.M Copi

গ) Joseph

ঘ) Aristotle

উত্তর: খ

I.M Copi রচিত গ্রন্থসমূহ: Symbolic Logic, Introduction to Logic, Artificial Languages

12. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত..... যুক্তিবাক্য।

ক) সংশ্লেষক

খ) বিশ্লেষক

গ) বিশেষ

ঘ) প্রাকল্পিক

উত্তর: ক

যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয় নতুন তথ্য দেয় তা সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য। আরোহের সিদ্ধান্ত সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য।

13. " সাদৃশ্যানুমান" কোন প্রকারের আরোহ?

ক) অপ্রকৃত

খ) পূর্ণাঙ্গ

গ) প্রকৃত

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: গ

প্রকৃত আরোহ ৩ প্রকার: বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক ও সাদৃশ্যানুমান

14. "Organon"- বইটির লেখক কে?

ক) প্লেটো

খ) এরিস্টটল

গ) মিল

ঘ) জোসেফ

উত্তর: খ

যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত " Organon " বইটির লেখক এরিস্টটল

15. সহানুমানের সিদ্ধান্তের বিধেয় পদকে কি বলে?

ক) মধ্যপদ

খ) অপ্রধান পদ

গ) সংযোজক পদ

ঘ) প্রধান পদ

উত্তর: ঘ

সহানুমানের সিদ্ধান্তের বিধেয় পদকে প্রধান পদ বলে

16. "Logic is the essence of Philosophy" - কার উক্তি?

- ক) Aristotle খ) Russell
গ) Plato ঘ) Kant

উত্তর: খ

"Logic is the essence of Philosophy"(দর্শনের সারসত্তা হলো যুক্তিবিদ্যা) - বার্ট্রান্ড রাসেল

17. অমধ্যম অনুমানে কয়টি আশ্রয়বাক্য থাকে?

- ক) ৪ খ) ৩
গ) ২ ঘ) ১

উত্তর: ঘ

অমধ্যম অনুমানে ১ টি আশ্রয়বাক্য ও ১ টি সিদ্ধান্ত থাকে, অর্থাৎ মোট ২ টি যুক্তিবাক্য থাকে।

18. Who introduced Scientific Realism?

- ক) Richard Montague খ) David Hume
গ) John Locke ঘ) Jean Paul Satre

উত্তর: গ

লৌকিক বাস্তববাদের ত্রুটি দূর করে বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ(scientific realism) বা প্রতীকবাদের প্রবর্তন করেন জন লক।

19. Understanding makes nature - who said this?

- ক) Immanuel kant খ) John Locke
গ) Hegel ঘ) Descartes

উত্তর: ক

কান্টের মতে "বোধ প্রকৃতি গঠন করে" (understanding makes nature), দেশ-কালের মধ্যে দিয়ে আসা সংবেদনের উপরে বোধজাত আকার আরোপিত হয়ে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়ে।

20. "কিছু মানুষ নয় সং" - কোন প্রকারের যুক্তিবাক্য?

- ক) O যুক্তিবাক্য খ) A যুক্তিবাক্য
গ) I যুক্তিবাক্য ঘ) E যুক্তিবাক্য

উত্তর: ক

গুণ ও পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্য ৪ প্রকারে। A,E,I,O এর মাঝে O যুক্তিবাক্য বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য - কিছু মানুষ নয় সং।

21. কোনো সহানুমাণে ৩ টর বেশি পদ ব্যবহৃত হলে কোন ধরনের অনুপপত্তি হয়?

- ক) দ্ব্যর্থক অনুপপত্তি
খ) অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি
গ) চতুষ্পদী অনুপপত্তি
ঘ) অবৈধ প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি

উত্তর: গ

কোনো সহানুমাণে ৩ টির বেশি পদ ব্যবহৃত হলে চতুষ্পদী অনুপপত্তি সংঘটিত হয়।

22. Which of the following is not a character of Evolution by Herbert spenser?(হারবার্ট স্পেন্সারের মতে নিচের কোনটি বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য নয়?)

- ক) Differentiation (পৃথকীকরণ)
খ) Mitigation (প্রশমিতকরণ)
গ) Concentration (ঐক্য বিধান)
ঘ) Determination (নিয়ন্ত্রণ)

উত্তর: খ

হারবার্ট স্পেন্সারের মতে বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য ৩ টি।

যথা: ১. পৃথকীকরণ ২. ঐক্য বিধান ৩. নিয়ন্ত্রণ

23. Darwins famous book "Origin of Species" first published in _____.

- ক) 1858 খ) 1857
গ) 1859 ঘ) 1869

উত্তর: গ

১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থ "Origin of species" প্রথম প্রকাশিত হয়।- এর এক যুগ পর তার আরেকটি গ্রন্থ "The descent of Man" প্রকাশিত হয়।

24. The Greek word "Telos" means _____.

- ক) End (পরিণতি) খ) Purpose (উদ্দেশ্য)
গ) Creation (সৃষ্টি) ঘ) Both (ক) & (খ)

উত্তর: ঘ

গ্রীক শব্দ Telos অর্থ পরিণতি(end) বা উদ্দেশ্য (purpose)। এটি থেকেই ইংরেজি Teleology শব্দটি এসেছে।

25. Who wrote the book " Emergent evolution "?

- ক) Herbert spenser খ) Henry Bergson
 গ) Samuel Alexander ঘ) Lloyd Morgan
 উত্তর: ঘ

লয়েড মর্গান উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের একজন প্রচারক। তার বিবর্তন সম্পর্কে অভিমত "Emergent Evolution " নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

26. Who is the pioneer of "Dialectical Materialism"? (দ্বন্দ্বিক জড়বাদের প্রবর্তক কে?)

- ক) Engels খ) Marx
 গ) Lenin দঘ) Darwin
 উত্তর: খ

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস(১৮১৮-১৮৮৩) হেগেলের দ্বন্দ্বিক দর্শনের বামপন্থী ধারার অনুসারী।- তিনি দ্বন্দ্বিক জড়বাদের প্রবর্তক।

27. Who is the pioneer of Abstract monism? (অমূর্ত একত্ববাদের সমর্থক কে?)

- ক) Leibniz খ) Spinoza
 গ) Hegel ঘ) Wolf
 উত্তর: খ

পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা অমূর্ত একত্ববাদের অন্যতম ধারক। স্পিনোজার মতে একমাত্র পরমসত্তাই সত্য, এই জগৎ মিথ্যা।

28. Which one of the followings is not a characteristic of Monad? (নিচের কোনটি মোনাডের বৈশিষ্ট্য নয়?)

- ক) Windowless(গবাক্ষহীন)
 খ) Spiritual (আধ্যাত্মিক)
 গ) Dividable (বিভাজ্য)
 ঘ) Active (সক্রিয়)

উত্তর: গ

জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ মোনাডবাদ তথা চিৎপরমানুবাদের প্রবর্তক। মোনাডের বৈশিষ্ট্য গুলো হলো: অবিভাজ্য, গবাক্ষহীন, সক্রিয় ও আধ্যাত্মিক।

29. The word "Solipsism " means_____.

- ক) Benevolent খ) Self- centered

- গ) Omnipotent ঘ) Optimistic

উত্তর: খ

Solipsism শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Solus থেকে যার অর্থ alone-একা, ipse অর্থ self। - সম্মিলিত অর্থ আত্মকেন্দ্রিক (Self-centered)

30. Hegel died in _____.

- ক) 1831 খ) 1841
 গ) 1851 ঘ) 1821

উত্তর: ক

জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিখ হেগেল ১৭৭০ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পরে দর্শনে হেগেলীয় বাম ও ডান ধারা তথা হেগেলোত্তর দর্শনের সূচনা হয়।

31. Two Treatises of Government - গ্রন্থটির লেখক?

- ক) Hume খ) Locke
 গ) Kant ঘ) Hobbes

জন লকের লেখা দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ: An essay concerning human understanding, Two treatises of government.

32. "Elan Vital" (প্রাণ প্রবাহ) এর উল্লেখ কোন মতবাদে পাওয়া যায়?

- ক) উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদ
 খ) যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ
 গ) সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ
 ঘ) উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ

উত্তর: গ

হেনরি বার্গসঁ তার সৃজনমূলক বিবর্তনবাদে Elan Vital এর উল্লেখ করেন।

33. " Ex nihilo nihil fit " - means.....

- ক) Nothing comes out of everything
 খ) Everything comes out of nothing
 গ) Something comes out of nothing
 ঘ) Nothing comes out of nothing

উত্তর: ঘ

Bain এর মতে, "Ex nihilo nihil fit " - Nothing comes out of nothing.

34. The book "An introduction to Ethics " - is written by-

- ক) W.T Stace খ) Mackenzie
গ) G.E Moore ঘ) William Lillie

উত্তর: ঘ

An introduction to ethics - নামের গ্রন্থটি ব্রিটিশ নীতিবিদ William Lillie লিখেছেন, যেটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

35. Who introduced the theory of Pre-established harmony regarding mind-body relationship? (দেহ-মন সম্পর্কিত পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ মতবাদের প্রবক্তা কে?)

- ক) Descartes খ) Spinoza
গ) Kant ঘ) Leibnitz

উত্তর: ঘ

লাইবনিজ দেহ ও মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদের প্রবর্তন করেন।

36. Thou oughtest means thou can - said by- (তোমার কর উচিত, তার মানে তুমি করতে পারো- কার উক্তি?)

- ক) Hegel খ) James
গ) Kant ঘ) Russell

উত্তর: গ

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট নৈতিক আদর্শের ভিত্তি হিসেবে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন

37. Soul is defined as "Stream of consciousness" by- (আত্মাকে চৈতন্যপ্রবাহ বলেছেন-)

- ক) William James খ) Spinoza
গ) Hegel ঘ) John Locke

উত্তর: ক

মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস এর মতে মন সংবেদনের সমষ্টি নয় বরং মন হচ্ছে চৈতন্যের অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। যাকে তিনি "Stream of consciousness " হিসেবে অভিহিত করেছেন।

38. According to Descartes Mind & Body interact through- (দেকার্তের মতে দেহ ও মন পারস্পরিক ক্রিয়া করে কিসের মাধ্যমে?)

- ক) Heart (হৃদপিণ্ড)
খ) Pancreas gland (অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি)
গ) Pineal gland (পিনিয়াল গ্রন্থি)
ঘ) Lungs (ফুসফুস)

উত্তর: গ

দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের প্রবর্তক ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত। তার মতে দেহ ও মন দুটি স্বতন্ত্র সত্তা, যারা মস্তিষ্কের একটি গ্রন্থি, পিনিয়াল গ্রন্থির মধ্যে দিয়ে একে অপরের উপরে ক্রিয়া করে।

39. Panpsychism - অর্থ কি?

- ক) সর্বমানসবাদ খ) সর্বেশ্বরবাদ
গ) উদারতাবাদ ঘ) সর্বধরেশ্বরবাদ

উত্তর: ক

Panpsychism একটি দার্শনিক মতবাদ যার অর্থ সর্বমানসবাদ বা সর্বচৈতন্যবাদ। এই মত অনুসারে যেখানে বিস্তৃতি আছে সেখানেই চেতনা আছে। গ্রীক শব্দ Pan অর্থ All বা সব, Psych অর্থ soul বা আত্মা।

40. Who among the followings doesn't support "Parallelism"? (নিচের কে সমান্তরবাদের সমর্থক নন?)

- ক) Leibnitz খ) Spinoza
গ) Herbert spenser ঘ) Stout

উত্তর: ক

দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক সমান্তরবাদ মতবাদের সমর্থক হলেন স্পিনোজা, হারবার্ট স্পেন্সার, মনোবিজ্ঞানী স্টাউট প্রমুখ।

41. Who introduced the theory "Occasionalism"? (প্রয়োজনবাদ মতবাদের প্রবর্তক কে?)

- ক) Descartes খ) Malebranche
গ) Geulincx ঘ) Both (খ) & (গ)

উত্তর: ঘ

দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক প্রয়োজনবাদ বা

উপলক্ষবাদ মতবাদের প্রণয়ন করেন

ম্যালেব্রাশ(Malebranche) ও গুয়েলি(Geulincx)।

42. Socrates thought on Immortality can be found in- (আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে সক্রেটিসের মত পাওয়া যায়-)

ক) The Republic

খ) World of Ideas

গ) Apology

ঘ) Meditations

উত্তর: গ

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো কর্তৃক রচিত "Apology

" নামক ডায়ালগে সক্রেটিসের পরকাল ও আত্মা

সম্পর্কিত মতামত তুলে ধরা হয়েছে। সক্রেটিসের মতে

আত্মা আধ্যাত্মিক ও অমর সত্তা।

43. Kant's moral arguments for the immortality of soul is found in- (আত্মার অমরত্বের পক্ষে কান্টের নৈতিক যুক্তি পাওয়া যায়-)

ক) Critique of practical reason

খ) Critique of pure reason

গ) The conflict of the faculties

ঘ) Critique of judgement

উত্তর: ক

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট রচিত Critique of practical reason ১৭৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি নৈতিক আদর্শ, ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে তার ধারণা ব্যক্ত করেন।

44. The book " The Ethics " regarding the immortality of soul is written by- (আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে The Ethics নামের গ্রন্থটি লেখেন-)

ক) Descartes

খ) Aristotle

গ) Spinoza

ঘ) Plato

উত্তর: গ

দার্শনিক স্পিনোজার লেখা বিখ্যাত একটি গ্রন্থ The

Ethics - যেটি তার মৃত্যুর পর ১৬৭৭ সালে প্রথম

প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি নৈতিক আদর্শ, ঈশ্বর ও

আত্মার প্রকৃতি, আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত

আলোচনা করেন।

45. Who is the pioneer of "Behaviourism "?

ক) Hegel

খ) Pavlov

গ) Stout

ঘ) Watson

উত্তর: ঘ

মন বা আত্মা সম্পর্কে আধুনিক সাম্প্রতিককালের

মতবাদগুলোর মধ্যে অন্যতম ব্যবহারবাদ বা

আচরণবাদ(Behaviourism)। মনোবিজ্ঞানী জে.বি

ওয়াটসন এর প্রবক্তা।

46. According to Plato, how many functions does soul/mind has? (প্লেটোর মতে আত্মা বা মনের ক্রিয়া কয় ধরনের?)

ক) 3

খ) 2

গ) 4

ঘ) 5

উত্তর: ক

প্লেটোর মতে মন বা আত্মা ৩ রকমের মৌলিক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যথা: প্রজ্ঞা, কামনা ও শক্তি।

47. "A treatise of human nature " is written by-

ক) John Locke

খ) Thomas hobbes

গ) Spinoza

ঘ) David hume

উত্তর: ঘ

ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম "A

treatise of human nature " রচনা করেন। এটি

১৭৩৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

48. Who introduced the concept of " World of Ideas"? (ধারণার জগতের -কথা কে বলেন?)

ক) Aristotle

খ) Locke

গ) Descartes

ঘ) Plato

উত্তর: ঘ

গ্রীক চিরায়ত দার্শনিক প্লেটো তার দর্শনে ধারণার

জগতের কথা বলেন। তার মতে ধারণার জগতই আসল

জগত, সকল সার্বিক ও আসল সত্তা ধারণার জগতেই

বিদ্যমান।

49. Who considered soul as will power?

(আত্মাকে ইচ্ছা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন কে?)

- ক) Bradley খ) Martineau
গ) Plato ঘ) Schopenhauer

উত্তর: ঘ

শোপেনহাওয়ার তার বিখ্যাত গ্রন্থ The world as will and ideas গ্রন্থে বলেন মন বা আত্মার সারসত্তাই হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি (will power)।

50. Alexander was the student of-
(আলেকজান্ডার কার শিষ্য ছিলেন?)

- ক) Aristotle খ) Socrates
গ) Plato ঘ) Bacon

উত্তর: ক

মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল নিজে প্লেটোর শিষ্য ছিলেন, এবং প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। সক্রেটিস > প্লেটো > অ্যারিস্টটল > আলেকজান্ডার

51. According to the Law of conservation of energy - (শক্তির নিত্যতার সূত্র অনুসারে-)

- ক) Energy can be transformed
খ) Total amount of Energy in Universe is unchanged
গ) Energy can't be created
ঘ) All of the above are correct

উত্তর: ঘ

শক্তির নিত্যতার সূত্র অনুসারে বিশ্বজগতে মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয়। শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস হয়না তবে এক শক্তি থেকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। এই শক্তির নিত্যতার নীতির সাহায্যে মার্টিনিউ ও হফডিং আত্মার অমরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

52. Who wrote the dialogue - "Phaedo"?

- ক) Socrates খ) Aristotle
গ) Plato ঘ) Protagoras

উত্তর: গ

আত্মা সম্পর্কে সক্রেটিসের ধারণার অস্পষ্টতা দূর করে আত্মার অমরত্ব প্রমাণের চেষ্টায় দার্শনিক প্লেটো "Phaedo" নামক সংলাপ রচনা করেন।

53. What is the ideal of thought? (চিন্তার আদর্শ কী?)

- ক) Goodness (শিব) খ) Beauty (সুন্দর)
গ) Reason (বুদ্ধি) ঘ) Truth (সত্য)

উত্তর: ঘ

চিন্তা(Thinking), অনুভূতি (Feeling), ইচ্ছা (Willing) মনের তিন বৃত্তি। চিন্তার আদর্শ সত্য, ইচ্ছার আদর্শ শিব বা মঙ্গল ও অনুভূতির আদর্শকে সুন্দর বলা হয়।

54. Which of the followings has intrinsic value? (নিচের কোনটির স্বতঃমূল্য রয়েছে?)

- ক) Money খ) Wealth
গ) Knowledge ঘ) None of them

উত্তর: গ

বিদ্যা(knowledge) এর নিজস্ব মূল্য আছে, যার মূল্য অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করেনা। তাই বিদ্যা স্বতঃমূল্য।

55. Value is both Subjective & Objective - according to- (কার মতে মূল্য একই সাথে বিষয়ীগত ও বিষয়গত?)

- ক) Lotza খ) Alexander
গ) Rabindranath Tagore
ঘ) Stout

উত্তর: খ

ইংরেজ দার্শনিক আলেকজান্ডারের মতে মূল্য একই সাথে বিষয়ীগত ও বিষয়গত।

56. Which theory is known as "Common sense theory" regarding Truth?(সত্যতা সম্পর্কিত কোন মতবাদকে লৌকিক মতবাদ বলা হয়?)

- ক) The Correspondence theory
খ) The Coherence theory
গ) The Pragmatic theory
ঘ) The Self evidence theory

উত্তর: ক

সত্যতা সম্পর্কিত অনুরূপতাবাদ(Correspondence) মতবাদকে লৌকিক মতবাদ(Common sense theory) বলা হয়ে থাকে।

57. Who wrote the book "Pragmatism "?

ক) John Dewey খ) Williams James
 গ) F.C.S Schiller ঘ) Hegel
 উত্তর: খ
 প্রয়োগবাদী দার্শনিক উইলিয়াম জেমস "Pragmatism" নামক গ্রন্থ লেখেন।

58. "Values" is discussed in which branch of philosophy? (মূল্য- দর্শনের কোন শাখায় আলোচিত হয়?)

ক) Epistemology খ) Cosmology
 গ) Ontology ঘ) Axiology

উত্তর: ঘ
 Values তথা মূল্য সম্পর্কে দর্শনের শাখা Axiology (মূল্যবিদ্যা) তে আলোচনা করা হয়।

59. John Dewey belongs to which country?

ক) America খ) Germany
 গ) England ঘ) France

উত্তর: ক
 জন ডিউই(১৮৫৯-১৯৫২) একজন আমেরিকান প্রয়োগবাদী দার্শনিক ও মনোবিদ।

60. "নজরুলের অগ্নিবীণা সকলের নিকট মহান সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত" - এই উক্তির দ্বারা মূল্যের কোন দিকটি ফুটে উঠে?

ক) বিষয়গত খ) বিষয়ীগত
 গ) সর্বজনীনতা ঘ) (ক) ও (গ) উভয়ই

উত্তর: ঘ
 উপর্যুক্ত উক্তিটির দ্বারা নজরুলের অগ্নিবীণা কাব্যের সবার নিকট গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে কাব্যটির বিষয়গত মূল্যের দিকটি ফুটে উঠেছে। একই সাথে তা সর্বজনীন হিসেবেও স্বীকৃত হচ্ছে।

61. আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে "- রবীন্দ্রনাথের এই পঙক্তির মাধ্যমে মূল্যের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক) Subjectivity (বিষয়ীগত দিক)
 খ) Objectivity (বিষয়গত দিক)

গ) Universality (সর্বজনীনতা)
 ঘ) Neutrality (নিরপেক্ষতা)

উত্তর : ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "আমি" কবিতার প্রথম দুটি চরণ "আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠলো রাঙা হয়ে "- এর মাধ্যমে ব্যক্তি মনের উপরে মূল্য তথা সৌন্দর্য এর নির্ভরশীলতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

62. "All is God, God is All" - is the theme of.....

ক) Panentheism খ) Pantheism
 গ) Theism ঘ) Deism

উত্তর: খ
 "All is God, God is All" অর্থাৎ সবই ঈশ্বর, ঈশ্বরই সব - এই উক্তি সর্বেশ্বরবাদের মূল বক্তব্য।

63. Who wrote the book, "Proslogium"?

ক) Descartes খ) Thomas Aquinas
 গ) Saint Augustine ঘ) Saint Anselm

উত্তর: ঘ
 মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান দার্শনিক সেইন্ট আনসেলম ১০৭৮ সালে তার বিখ্যাত Proslogium গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

64. Who said, "God is dead"?

ক) Russell খ) David Hume
 গ) Jean paul satre ঘ) Nietzsche

উত্তর: ঘ
 The phrase "God is dead" was said by the German philosopher Friedrich Nietzsche.

65. Who among the following philosophers is a Pessimistic?

ক) Baruch Spinoza
 খ) Schopenhauer

গ) Herbert Spenser
 ঘ) None of the above

উত্তর: খ
 জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার হলেন নৈরাশ্যবাদের(Pessimism) প্রধান সমর্থক।

66. "Tractatus Theologico-Politicus"- is written by?

ক) Spinoza খ) Descartes
 গ) Hegel ঘ) Wittgenstein

উত্তর: ক

Baruch Spinoza wrote "Tractatus Theologico-Politicus"

67. God is the only substance - said by?
(ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য- কে বলেছেন?)

- ক) Spinoza খ) Leibnitz
গ) Democritus ঘ) Hume

উত্তর : ক

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে প্রখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা হলেন সর্বেশ্বরবাদের একজন প্রধান সমর্থক। তাঁর মতে, ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। এ দ্রব্যের অসংখ্য গুণের মাঝে দুটি গুণ হলো—চেতনা ও বিস্তৃতি।

68. Who provided the cosmological proof for the existence of God? (ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণ দেন কে?)

- ক) Descartes খ) Kant
গ) Martineau ঘ) Dr. Flint

উত্তর: ঘ

Dr. Flint ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি প্রদান করেন। এই যুক্তি অনুসারে পুরো জগতের আদিকারণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তিনি।

69. Athiesm means.....

- ক) Belief in the omnipotence of god
খ) Belief in the existence of god
গ) Disbelief in the existence of god
ঘ) Secularism

উত্তর: গ

The term "atheist" describes a person who does not believe in God or in a divine being & this practice called Atheism.

70. According to Deism, what is the primary cause? (অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী মূখ্য কারণ কি?)

- ক) God himself (ঈশ্বর নিজেই)
খ) Evil (অকল্যাণ)

গ) Forces created by God (ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট শক্তিসমূহ)

ঘ) Pre-established elements of earth (জগতের পূর্বস্থিত উপাদান সমূহ)

উত্তর: ক

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (deism) অনুযায়ী ঈশ্বর জগতের সৃষ্টির সময় কিছু প্রয়োজনীয় শক্তিও (forces) সৃষ্টি করেন যেগুলোর উপরে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেন। এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর মূখ্য কারণ ও সৃষ্ট শক্তিগুলোকে গোপন কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

71. Who among the followings isn't an atheist existentialist? (অস্তিত্ববাদের নিরীশ্বর ধারার অনুসারী নন কে?)

- ক) Friedrich nietzsche
খ) Jean Paul Satre
গ) Gabriel Marcel
ঘ) Hideeggar

উত্তর: গ

ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বরবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী নামে দুটো ধারার উদ্ভব হয়েছে। প্রথম দলে কিয়ের্কেগার্ড, জাসপার্স, মার্সেল এবং লুইলাভেল (ফ্রান্সের একজন অধ্যাপক) দ্বিতীয় দলে হিডেগার, ব্যাটলি, নীটশে, বেভিয়ার এবং সার্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

72. "Principia Ethica" by G.E Moore was published in.....

- ক) 1903 খ) 1913
গ) 1901 ঘ) 1904

উত্তর: ক

জি. ই. ম্যুর কর্তৃক রচিত Principia Ethica গ্রন্থটি ১৯০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

73. Who wrote the essay- "Refutation of Idealism"?

- ক) Edmund Husserl খ) C.S Pierce
গ) F.H. Bradley ঘ) G.E Moore

উত্তর: ঘ

১৯০৩ সালে জি ই মুর 'Mind' পত্রিকায় 'ভাববাদ খণ্ডন' (Refutation of Idealism) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

74. Who is the author of the book, "Democracy and Education"?

- ক) C.S Pierce খ) William James
গ) John Dewey ঘ) F.C.S Schiller

উত্তর: গ

জন ডিউই এর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ:

১. Democracy and Education ২. Experience and Education ৩. How we think

75. "The Plague" - is written by?

- ক) Franz Kafka খ) Bertrand Russell
গ) Albert Camus ঘ) Jean Paul Satre

উত্তর: গ

Albert Camus was an Algerian-born French philosopher. Famous books:- "The Myth of Sisyphus, and the novels "The Stranger, The Plague, and The Fall.

76. Which philosopher declined Nobel prize?

- ক) Bertrand Russell
খ) Soren Kierkegaard
গ) Martin Heidegger
ঘ) Jean Paul Satre

উত্তর: ঘ

In 1964 Jean Paul Satre declined the Nobel Prize for Literature.

77. Existence precedes essence - অর্থ কি?

- ক) অস্তিত্ব সারসত্তার পশ্চাদগামী
খ) সারসত্তা অস্তিত্বের পূর্বগামী
গ) অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্বগামী
ঘ) অস্তিত্ব সারসত্তার সহগামী

উত্তর: গ

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান উক্তি, " অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্বগামী" (Existence precedes essence)।

78. "Volo ergo sum" - means.....

- ক) I think therefore I am
খ) I desire, therefore I am
গ) I am , therefore I desire
ঘ) None of the above

উত্তর: খ

"Volo ergo sum" is a Latin phrase meaning "I desire, therefore I am". It was coined by the French philosopher Maine de Biran as a counterpoint to Rene Descartes' more famous "Cogito ergo sum" ("I think, therefore I am")

79. Homo Viator - is written by?

- ক) Martin heidegger খ) Gabriel Marcel
গ) Jean Paul Satre ঘ) Karl jaspers

উত্তর: খ

মার্সেল ফরাসি দার্শনিক। গ্রন্থসমূহ : 1. Homo Viator 2. Being and Having 3. The mystery of being

80. "The roads to freedom " is written by.....

- ক) Kafka খ) Nietzsche
গ) Satre ঘ) Schiller

উত্তর: গ

The Roads to Freedom - is a series of novels exploring the lives of individuals in France before, during, and after World War II. Jean Paul Satre is the author of this.

81. Which of the followings isn't a stage of life according to Kierkegaard? (নিচের কোনটি কিয়ের্কেগার্ডের মতে জীবনের স্তর নয়?)

- ক) Aesthetic stage খ) Economical stage
গ) Religious stage ঘ) Ethical stage

উত্তর: খ

কিয়ের্কেগার্ড জীবনের ৩ টি স্তরের কথা বলেন:

১. সৌন্দর্য্যানুভূতির স্তর(Aesthetic stage) ২. নৈতিক স্তর(Ethical stage) ৩. ধর্মীয় স্তর(Religious stage)

91. বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কে?

ক) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

খ) দেওয়ান আজরফ

গ) ড. মফিজউদ্দিন আহমেদ

ঘ) জিসি দেব

উত্তর: খ

দেওয়ান আজরফ ১৯৪৯ সালে তমদুন মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আজীবন ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সভাপতি ছিলেন।

92. বাংলাদেশে মার্ক্সবাদী দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কে?

ক) জিসি দেব

খ) আরজ আলী মাতুব্বর

গ) নির্মলেন্দু গুণ

ঘ) বদরুদ্দীন ওমর

উত্তর : ঘ

বাংলাদেশে মার্ক্সবাদী দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে বদরুদ্দীন ওমর, রনেশ দাসগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত, সত্যেন সেন, অজয় রায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

93. "গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান" - নজরুলের এই লেখনীতে কোন ধারার দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে?

ক) ভাববাদী

খ) মানবতাবাদী

গ) জড়বাদী

ঘ) মরমীবাদী

উত্তর : খ

কাজী নজরুল ইসলাম একজন মানবতাবাদী কবি যিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, শোষণ ও অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

94. বাউলদের মতে সব তত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তি কী ?

ক) মানবদেহ

খ) আত্মা

গ) ইচ্ছাশক্তি

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ক

বাউলদের মতে সব তত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তি মানবদেহ। দেহই সকল জ্ঞান ও কর্মের উৎস। নিজের মধ্যেই পরমসত্যের অবস্থান।

95. "পারস্য প্রতিভা" গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক) দেওয়ান আজরফ

খ) আবুল হাশিম

গ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

ঘ) আরজ আলী মাতুব্বর

উত্তর: গ

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর দার্শনিক গ্রন্থ "মানুষের ধর্ম" ১৯৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় মোসলেম ভারত ও সওগাত পত্রিকায়। "পারস্য প্রতিভা" তার আরেকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

96. আরজ আলী মাতুব্বরের কোন গ্রন্থটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিলো?

ক) মুক্তমন

খ) স্মরণিকা

গ) অনুমান

ঘ) সত্যের সন্ধান

উত্তর: ক

স্বশিক্ষিত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের এর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো: সত্যের সন্ধান, সৃষ্টি রহস্য, অনুমান ও স্মরণিকা। তার মৃত্যুর কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয় "মুক্তমন"।

97. নিচের কোন রাজনৈতিক দল মার্ক্সবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত?

ক) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

খ) বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি

গ) জাতীয় নাগরিক দল

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর : খ

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সীয় কমিউনিস্ট মতবাদ ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল।

98. নিচের কোনটি মরমী ধারার দর্শন?

ক) বাউলবাদ

খ) বৈষ্ণববাদ

গ) সূফীবাদ

ঘ) সবগুলোই

উত্তর : ঘ

সহজিয়া, মরজিয়া দর্শন, বাউল দর্শন, বৈষ্ণব দর্শন, ভক্তিবাদ, সুফিবাদ প্রতিটিই মরমী ধারার।

99. "যুক্তির আলোকে" বইটির লেখক কে?

ক) ড. মফিজউদ্দিন আহমেদ

খ) আরজ আলী মাতুব্বর

গ) জিসি দেব

ঘ) আবদুল মতীন

উত্তর: ঘ

বাংলাদেশে বিশ্লেষণী দর্শনের বিশেষজ্ঞ হলেন অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন। যুক্তিবাদী হিসাবে নিজস্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে তিনি প্রথম যে বইটি লেখেন সেই বইটির নাম হলো " যুক্তির আলোকে "।

100. Who wrote the book, " The Conquest Of Happiness "?

- ক) জ্যা পল সার্ভে খ) রাসেল
গ) কান্ট ঘ) রুশো

উত্তর: খ

বার্ট্রান্ড রাসেল " The Conquest Of Happiness " গ্রন্থটি রচনা করেন।

101. "Logical Syntax of Language"- গ্রন্থটি কার লেখা?

- ক) অটো নিউরথ খ) ভিটগেনস্টাইন
গ) রুডলফ কারনাপ ঘ) মরিজ শ্লিক

উত্তর: গ

"Logical Syntax of Language"- গ্রন্থটি যৌক্তিক দৃষ্টবাদী দার্শনিক রুডলফ কারনাপের

102. বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকের(২০২৫) সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত তম?

- ক) ৩২ খ) ৩৫
গ) ৩৩ ঘ) ৩০

উত্তর: খ

২০২৫ সালের গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই) সূচকে ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৩৫তম স্থানে রয়েছে।

103. The term "Land ethics " first used by-

- ক) Peter singer খ) Bentham
গ) Stout ঘ) Leopold

উত্তর: ঘ

লিওপল্ড ১৯৪৯ সনে তাঁর " দ্য ল্যান্ড এথিক্স "শীর্ষক প্রবন্ধে ভূমি নীতিবিদ্যা কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

104. The book "Animal Liberation " by Peter singer was first published in-

- ক) 1975 খ) 1972

গ) 1970

ঘ) 1971

উত্তর: ক

পিটার সিংগারের মতে, মানবের প্রাণীকুল তথা নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী স্বাধীনভাবে চিন্তা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তার "Animal Liberation" গ্রন্থ রচনা করেন, যা ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

105. ২০২৪-২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশ কোনটি?

- ক) বুরকিনাফাসো খ) আফগানিস্তান
গ) পাকিস্তান ঘ) সোমালিয়া

উত্তর: ক

২০২৫ সালের গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই) সূচকে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশ বুরকিনাফাসো।

106. Who wrote the book "Practical Ethics"?

- ক) Tom Regan খ) Peter Singer
গ) Leopold ঘ) Descartes

উত্তর: খ

Peter Singer (born in 1946, Melbourne, Australia) is an Australian ethical and political philosopher. His famous works are: Animal Liberation (1975) and Practical Ethics (1979)

107. Who is the author of the book, "La Suicide"?

- ক) Emile Durkheim খ) David Hume
গ) Immanuel Kant ঘ) Bertrand Russell

উত্তর: ক

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিলি ডুরখেইমে(১৮৫৮-১৯১৭) ১৮৯৭ সনে ল্য সুইসাইড (La Suicide) গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

108. গর্ভপাতের বিপক্ষে রক্ষণশীলদের যুক্তি কি?

- ক) গর্ভপাত নরহত্যার সমতুল্য
খ) গর্ভপাত মন্দ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে
গ) গর্ভপাত নারীদের মানসিক ঝুঁকি বাড়ায়

ঘ) উপরের সবগুলোই

উত্তর: ঘ

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের' অনুসারীগণ গর্ভপাতের বিরোধিতা করে গর্ভপাতকে একটি অনৈতিক কাজ বলে অভিহিত করেন।

109. আত্মহত্যাকে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী এবং অপরাধমূলক কাজ বলে অভিহিত করেছেন কে?

- ক) Aristotle খ) Plato
গ) Socrates ঘ) Augustine

উত্তর: ক

এরিস্টটল আত্মহত্যাকে সমর্থন করেননি। তিনি এটিকে কাপুরুষোচিত কাজ, রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী এবং অপরাধমূলক কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

110. জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনের নাম কি?

- ক) জেনেভা কনভেনশন
খ) আইএলও কনভেনশন
গ) মেরিডা কনভেনশন
ঘ) রামসার কনভেনশন

উত্তর: গ

দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক এজেন্ডা:এজেন্ডার নাম: মেরিডা কনভেনশন (Merida Convention)UNCAC জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী সনদ।

111. "বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ "- এটি কোন সংস্থার অভিমত?

- ক) বিশ্বব্যাংক খ) আইএমএফ
গ) টিআইবি ঘ) জাতিসংঘ

উত্তর: ক

বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

112. কত সালে আমেরিকায় গর্ভপাত আইনত বৈধ হিসেবে স্বীকৃত হয়?

- ক) ১৯৬৩ খ) ১৯৭১
গ) ১৯৭৩ ঘ) ১৯৭৫

উত্তর: গ

১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র গর্ভপাতের পক্ষে রায় দিয়ে ফেডারেল জাস্টিস কমিশন কর্তৃক আইন হিসাবে গৃহীত হয়।

113. পশুর অধিকার সংক্রান্ত সমান মর্যাদা তত্ত্বের সমর্থক কে?

- ক) পিটার সিংগার খ) দেকার্ত
গ) টম রেগান ঘ) লিওপল্ড

উত্তর: গ

সমান মর্যাদাতত্ত্ব : এ মতানুসারে মানুষ ও প্রাণীর জীবনের মূল্য ও অধিকার সমান।

114. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, শুধুমাত্র কোন ক্ষেত্রে গর্ভপাত আইনত বৈধ?

- ক) ধর্ষণের স্বীকার হলে
খ) মায়ের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে
গ) গর্ভের সন্তান প্রতিবন্ধী হলে
ঘ) গর্ভবতী নারী সন্তান গ্রহণে অনিচ্ছুক হলে

উত্তর: খ

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, শুধুমাত্র মায়ের জীবন রক্ষায় গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া যায়।

115. Who wrote the book, "Nicomachean Ethics"?

- ক) Aristotle খ) Plato
গ) Bertrand Russell ঘ) G.E Moore

উত্তর: ক

Some famous books of Aristotle:1. The Nicomachean Ethics · 2. The Politics · 3. Poetics

116. Before 1967 Abortion was legal only in-

- ক) The USA খ) England
গ) Sweden ঘ) India

উত্তর: গ

১৯৬৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র সুইডেন ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিলো।

117. Who among the followings isn't a member of Vienna circle? (ভিয়েনা সার্কলের সদস্য নন কে?)

উত্তর: ক

গ্রিক দার্শনিক অরিস্টিপাস (Aristippus)-এর মতবাদের মধ্যে স্থূল আত্মসুখবাদের মূল বক্তব্যের আভাস পাওয়া যায়। তিনি সিরেনিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।

126. বেস্থাম প্রদত্ত ৪ প্রকার নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

- ক) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ খ) পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ
গ) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ঘ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

উত্তর: খ

বেস্থাম চার প্রকার নৈতিক নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করেছেন।

যথা- (১) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ, (২) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, (৩) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং (৪) ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ

127. পূর্ণতাবাদের অপর নাম কি?

- ক) কল্যাণবাদ খ) উপযোগবাদ
গ) পরার্থবাদ ঘ) নিয়ন্ত্রণবাদ

উত্তর: ক

পূর্ণতাবাদকে কল্যাণবাদও (eudaimonism) বলা হয়ে থাকে। eudaimonia গ্রিক শব্দ eudaimonism থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

128. Who introduced the concept of "Paradox of hedonism"? (সুখবাদের কূটাভাসের ধারণার প্রবর্তক কে?)

- ক) Bentham খ) Rashdall
গ) Sidgwick ঘ) Spenser

উত্তর: গ

ড. সিগউইক(Sidgwick) এর মতে, যতই আমরা সুখ পেতে চাই ততই আমরা সুখ হারাই।

129. Who introduced, "hedonistic calculus method"? (সুখবাদের গণনা প্রণালীর প্রবর্তক কে?)

- ক) J.S Mill খ) Sidgwick
গ) Bentham ঘ) Herbert spenser

উত্তর: গ

বেস্থাম সুখের ৭ টি মানের কথা তুলে ধরেন। এই ৭ টি মানের সাহায্যে সুখের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতিকে সুখবাদের গণনা-প্রণালি (hedonistic calculus) বলা হয়ে থাকে।

130. Who said, "Die to live"? (মরে বাচো - কে বলেছেন?)

- ক) Bradley খ) Hegel
গ) Kant ঘ) Green

উত্তর: খ

পূর্ণতাবাদের অন্যতম বিখ্যাত সমর্থক হেগেল

আত্মোপলব্ধির দুটি নিয়ম নির্দেশ করেছেন। যথা-

- (১) নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত কর (Be a person)
(২) মরে বাঁচো(Die to live)

131. How many imperatives are there, according to Kant?(কান্টের মতে আদেশ কত প্রকার?)

- ক) 4 খ) 2
গ) 3 ঘ) 5

উত্তর: গ

কান্ট ত্রিবিধ আদেশের (imperatives or comands)

উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) শর্তাধীন আদেশ

(Hypothetical imperative), (২) উক্তিমূলক আদেশ

(Assertorial imperative) এবং (৩) শর্তহীন

আদেশ (Categorical imperative)।

132. Who introduced the concept of, "Golden mean"? (সুবর্ণ মধ্যক- ধারণাটির প্রবর্তক কে?)

- ক) Aristotle খ) Plato
গ) Kant ঘ) Socrates

উত্তর: ক

অরিস্টটল দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী অবস্থাকে সত্যতা

বা সুবর্ণ মধ্যক(Golden mean) বলেছেন।

133. "The greatest happiness of the greatest number"- this statement denotes the theory of.....(সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ- এই বক্তব্য কোন মতবাদের নির্দেশ করে?)

- ক) Utilitarianism
খ) Egoistic hedonism
গ) Altruistic hedonism
ঘ) Both (ক) & (গ)

উত্তর: ঘ

পরসুখবাদকে উপযোগবাদ ও (utilitarianism) বলা হয়। কেননা কোনো কার্য ভালো কি মন্দ তা কার্যটির উপকারিতা বা উপযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

134. "Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct"- said by? (আচরণের ভালো বা ঠিকত্বের আলোচনাই নীতিশাস্ত্র-কে বলেছেন?)

- ক) William Lillie খ) Mackenzie
গ) J.S Mill ঘ) Bentham

উত্তর: খ

এটি নীতিশাস্ত্রবিদ ম্যাকেনজি প্রদত্ত নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা। তার গ্রন্থ A manual of ethics

135. The word, "Moral" derived from.....

- ক) French word, "moras"
খ) Greek word, " mores"
গ) Greek word "ethos"
ঘ) Latin word "mores"

উত্তর: ঘ

নীতিশাস্ত্রের এক নাম 'নীতিদর্শন' (moral Philosophy)। এই 'মরাল' শব্দটি লাতিন 'মোরস' (mores) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

136. "Man is by nature a social and political animal and a man who is not a member of a state is either a beast or a God" - who said this?

- ক) Thomas Hobbes খ) Aristotle
গ) Plato ঘ) John Locke

উত্তর: খ

পদার্থনিক এরিস্টটল, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপর্যুক্ত উক্তিটি করেন।

137. Who introduced the concept of, "Duty for duty's sake"? (কর্তব্যের জন্য কর্তব্য - ধারণাটির প্রবর্তক কে?)

- ক) John Locke খ) Immanuel Kant
গ) Hegel ঘ) G.E Moore

উত্তর: খ

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নীতিবিদ্যার মূল বিষয়গুলো হলো: সদৃচ্ছা(সং ইচ্ছা), কর্তব্যের জন্য কর্তব্য এবং শর্তহীন আদেশ।

138. Which of the followings is a natural evil?(নিচের কোনটি একটি প্রাকৃতিক অকল্যাণ?)

- ক) Earthquake খ) Deforestation
গ) Nuclear war ঘ) All of the above

উত্তর: ক

প্রাকৃতিক অনিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া, এটা প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর নির্ভরশীল। যেমন: ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ঝড়িকা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, প্রভৃতি।

139. মনোঃসমীক্ষণের সাহায্যে অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের কথা বলেন কে?

- ক) ম্যাকেনজি খ) ইমানুয়েল কান্ট
গ) সিগমান্ড ফ্রয়েড ঘ) উইলিয়াম জেমস

উত্তর: গ

মনোবিদ সিগমান্ড ফ্রয়েডের মতে অপরাধমূলক কাজ নিবারণের উপায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নয়, মনোঃসমীক্ষণের সাহায্যে অপরাধের মূল কারণ আবিষ্কার করে তার যথাযথ প্রতিকার করাই অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণের উপায়।

140. Which theory of punishment is based on Justice? (শাস্তি সম্পর্কিত কোন মতবাদ ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত?)

- ক) The preventive theory
খ) The Retributive theory
গ) The Reformatory theory
ঘ) All of them

উত্তর: খ

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (The retributive theory) : এই মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির অর্থ হলো দুষ্টকারীকে তার অন্যায় কাজের ফল ভোগ করানো।

141. "চোখের বদলে চোখ(an eye for an eye)" কোন মতবাদের আদর্শ?

- ক) প্রতিরোধাত্মক মত
খ) সংশোধনাত্মক মত

গ) কঠোর প্রতিশোধাত্মক মত

ঘ) লঘু প্রতিশোধাত্মক মত

উত্তর: গ

কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (The rigoristic form of the retributive theory) : এই মতানুসারে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত। অপরাধ যদি গুরুতর হয়, তবে শাস্তিও গুরুতর হওয়া উচিত। আর অপরাধ যদি লঘু হয়, তবে শাস্তিও লঘু হওয়া উচিত।

142. শাস্তি সম্পর্কিত কোন মতবাদ অপরাধীকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করে শুধু উপায় হিসেবে গ্রহণ করে?

ক) সংশোধনাত্মক মতবাদ খ) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ

গ) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ ঘ) উপরের সবগুলোই

উত্তর: খ

প্রতিরোধাত্মক মতবাদ অপরাধীকে উদ্দেশ্য হিসাবে মনে না করে উপায় হিসাবে মনে করে।

143. শাস্তিকে নেতিবাচক পুরস্কার হিসেবে অভিহিত করেন কে?

ক) Aristotle

খ) Plato

গ) Freud

ঘ) Hume

উত্তর: ক

অ্যারিস্টটল শাস্তিকে নেতিবাচক পুরস্কার বলে মনে করেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করেছে সমাজ তাকে পুরস্কার না দিয়ে পারে না। শাস্তিই এই পুরস্কার।

144. Who is the author of the book, "The Metamorphosis"?

ক) Bertrand Russell

খ) Franz Kafka

গ) G.E Moore

ঘ) Mackenzie

উত্তর: খ

Some famous books of Franz Kafka :1. The Trial · 2. The Metamorphosis · 3. The Castle · 4. Franz Kafka · 5. Amerika ·

145. "Man is born free and everywhere he is in chains"- quoted by?

ক) Rousseau

খ) Locke

গ) Kant

ঘ) Voltaire

উত্তর: ক

Man is born free and everywhere he is in chains,' উক্তিটি করেছেন জাঁ জ্যাক রুশো।

146. শাস্তি সংক্রান্ত কোন মতবাদ মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে না?

ক) সংশোধনাত্মক মতবাদ খ) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ

গ) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ক

শাস্তির সংশোধনাত্মক মতবাদ মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে না।

147. বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা- কোন ধরনের কর্তব্য?

ক) দৈহিক

খ) অর্থনৈতিক

গ) জ্ঞানমূলক

ঘ) নৈতিক

উত্তর: ঘ

নৈতিক কর্তব্য (moral duty) : প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনাকে বিচারবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন করে বুদ্ধিময় সত্তাকে উপলব্ধি করা মানুষের নৈতিক কর্তব্য।

148. পিটার সিংগার তার কোন গ্রন্থে গর্ভপাতকে

নৈতিকভাবে অনুমোদিত বলে মনে করেন?

ক) Animal Liberation

খ) Practical Ethics

গ) Reasons and persons

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: খ

পিটার সিংগার তার Practical Ethics গ্রন্থে গর্ভপাতকে নৈতিকভাবে অনুমোদিত বলে মনে করেন।

তার মতে জন্মক্রটি যুক্ত শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের মরতে দেওয়া দোষের কিছু নয়।

149. অবৈধ মজুদ(Illicit Hoarding) কি?

ক) ন্যায্যতার ভিত্তিতে সম্পদ বন্টন

খ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ

গ) দুর্যোগ মোকাবেলায় পণ্য মজুদ

ঘ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি মজুদ

উত্তর: ঘ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করাই অবৈধ মজুদকরণ।

150. Which Muslim philosopher is called, "Second Aristotle"?

ক) Al Ghazali খ) Ibn Rushd

গ) Allama Iqbal ঘ) Al Farabi

উত্তর: ঘ

আল-ফারাবীকে "দ্বিতীয় অ্যারিস্টটল" বা "দ্বিতীয় শিক্ষক" বলা হয় কারণ তিনি গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাকে মুসলিম বিশ্বে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন।

151. Justice is nothing other than the advantage of the stronger - who said this?
("ন্যায়পরতা হচ্ছে শক্তিমানের স্বার্থ রক্ষা"- কে বলেছেন?

ক) Socrates খ) Thrasymachus

গ) Cephalus ঘ) Polemarchus

উত্তর: খ

প্লেটোর "দি রিপাবলিক" (The Republic) গ্রন্থটির মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল ন্যায়পরতা- এর সংজ্ঞা দিতেই থ্র্যাসিমেকাস উপযুক্ত উক্তি দেন।

152. What is the main statement of Egoism?
(আত্মবাদের প্রধান বক্তব্য কি?)

ক) ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করা

খ) সমাজের সকল মানুষের মঙ্গলের চিন্তা করা

গ) সর্বদা নিজের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করা

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: গ

আত্মবাদ (Egoism) : আত্মবাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে নিজের স্বার্থ বা মঙ্গল অনুসন্ধান করা।

153. প্লেটো কত প্রকার মৌলিক সদগুণের উল্লেখ করেন ?

ক) ৪ খ) ৩

গ) ২ ঘ) ৫

উত্তর: ক

প্রজ্ঞা, সাহস, সংযম ও ন্যায়পরতা, এ চারটি মৌলিক সদগুণ প্লেটোর যুক্তিতে প্রধানত একটি সদগুণে পরিণত হয়, যা প্রজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন।

154. "কিতাব- আল- শিফা" গ্রন্থটি কার লেখা?

ক) ইবনে রুশদ খ) ইবনে সিনা

গ) আল ফারাবী

ঘ) আল গাজালী

উত্তর: খ

ইবনে সিনার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কিতাব আল-শিফা', 'কিতাব আল-নাজাত', 'কানুন ফিতাব', 'দানেশ নামা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

155. কোন মতবাদ আত্মোৎসর্গের কথা বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে?

ক) Egoism

খ) Altruism

গ) Universalism

ঘ) None of the above

উত্তর: খ

পরার্থবাদ (Altruism) : ব্যক্তির নিজের স্বার্থ বা মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না রেখে সমাজের অপর ব্যক্তির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়াই ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য বলে পরার্থবাদ মনে করে।

156. আল ফারাবীর মতে সত্তা (Being) কত প্রকার?

ক) ৪

খ) ৫

গ) ২

ঘ) ৩

উত্তর: গ

আল ফারাবীর মতে, সত্তা দু'রকমের—সম্ভাব্য ও অনিবার্য

157. Ibn Sina discussed Logic in which book? (ইবনে সিনা তার কোন গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন?)

ক) Al Najat

খ) Qanun Fit-tib

গ) Al Ishrat

ঘ) Both (ক) & (গ)

উত্তর: ঘ

আল-নাজাত' ও 'আল-ইশরাত' গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে ইবনে সিনা তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।

158. আল গাজালীর পুরো নাম কি?

ক) মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল-গাজালী

খ) হামিদ বিন মুহম্মদ ইবনে আল-গাজালী

গ) আবু হামিদ মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল-গাজালী

ঘ) আব্দুল হামিদ মুহম্মদ ইবনে হামিদ আল গাজালী

উত্তর: গ

আল গাজালীর পুরো নাম আবু হামিদ মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল-গাজালী।

159. তাহাফাতুল ফালাসিফা - অর্থ কি?

ক) সত্যের অনুসন্ধান খ) দার্শনিকদের জীবনী
 গ) দার্শনিকদের খণ্ডন ঘ) দর্শন চর্চা

উত্তর: গ

আল গাজালী 'তাহফাতুল ফালাসিফা (দার্শনিকদের খণ্ডন) শীর্ষক গ্রন্থে দার্শনিকদের মতবাদের সমালোচনায় অবতীর্ণ হন

160. Ibn Rushd was born in-

ক) Spain খ) Iran
 গ) Syria ঘ) France

উত্তর: ক

ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রিঃ) স্পেনের কর্ডোভার এক আইনশাস্ত্রবিদ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি নিজেও ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক।

161. আল গাজালীর তাহফাতুল ফালাসিফার প্রত্যুত্তর হিসেবে ইবনে রুশদ কোন গ্রন্থটি লেখেন?

ক) কিতাবুল ফালাসিফা খ) তাহফাতুল তাহাফুত
 গ) কিতাবুল রেহালা ঘ) তাহফাতুল মারেফাত

উত্তর: খ

ইবনে রুশদ প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে 'তাহফাতুল তাহাফুত' (খণ্ডনে খণ্ডন), 'কিতাবুল ফালাসিফা' উল্লেখযোগ্য। 'তাহফাতুল তাহাফুত' গ্রন্থটি গাজালীর 'তাহফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থের প্রত্যুত্তর।

162. ইবনে রুশদের মতে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় কোন আমলে?

ক) আব্বাসীয় আমলে
 খ) ক্রুসেড পরবর্তী সময়ে
 গ) মুয়াবিয়ার আমলে
 ঘ) খেলাফায়ে রাশেদীন আমলে

উত্তর: ঘ

ইবনে রুশদের মতে, প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন, খেলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই তার পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছিল। মুয়াবিয়া কর্তৃক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ বিনষ্ট হয়ে যায়।

163. আল ফারাবী কত প্রকারের দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের কথা বলেন?

ক) ৩ খ) ২

গ) ৪ ঘ) ৫

উত্তর: গ

আল ফারাবী চার প্রকারের দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের বিবরণ দেন। তাঁর মতে, এগুলো হচ্ছে -(এক) অজ্ঞতার নগরী; (দুই) একগুয়ে নগরী; (তিন) স্বধর্ম ত্যাগী নগরী এবং (চার) ভ্রান্তিকর নগরী।

164. Which of the following books by Ibn Sina is known as the Bible of medical science? (ইবনে সিনা রচিত নিচের কোন গ্রন্থটি চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল হিসেবে খ্যাত?)

ক) Qanun Fit-tib খ) Kitab Al Shifa
 গ) Kitab Al Najat ঘ) Danish nama

উত্তর: ক

ইবনে সিনার কানুন ফিতিব্ব" গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বা বাইবেল হিসেবে খ্যাত। গ্রন্থটি ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

165. নিচের কোনটি সফ্রেটিস প্রদত্ত নাগরিকের শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক) শাসক খ) দার্শনিক
 গ) সৈনিক ঘ) উৎপাদক

উত্তর: খ

ন্যায়পরতার সংজ্ঞা দেয়ার আগে রাষ্ট্রের নাগরিকদের শাসক, সৈনিক ও উৎপাদক, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে প্রজ্ঞাকে(reason/wisdom) শাসকের প্রধান সদগুণ, সাহসকে(courage) সৈনিকদের প্রধান সদগুণ এবং সংযম বা মিতাচারকে(temperance) উৎপাদক শ্রেণীর প্রধান সদগুণ বলে অভিহিত করেন।

166. নিচের কোনটি বৌদ্ধ দর্শনের আর্য সত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক) দুঃখ আছে খ) দুঃখের পরিণাম আছে
 গ) দুঃখের নিবৃত্তি আছে ঘ) দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গ আছে

উত্তর: খ

চারটি আর্য-সত্য (The Four Noble Truths) : (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের

নিবৃত্তি আছে, এবং (৪) দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গ বা পথও আছে। এই চারটি সত্যকে আর্য-সত্য বলা হয়।

167. গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায়?

- ক) অভয়নগর খ) লুম্বিনী
গ) তক্ষশীলায় ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: খ

গৌতম বুদ্ধের আদি নাম ছিল গৌতম বা সিদ্ধার্থ। কপিলাবস্ত্র থেকে পিতার রাজ্যে যাবার পথে লুম্বিনী গ্রামে (অধুনা নেপালের অন্তর্গত) সিদ্ধার্থের জন্ম দেন।

168. নিচের কোনটি আল্লামা ইকবালের "পরম খুদীর" বৈশিষ্ট্য নয়?

- ক) পরম খুদী সর্বশক্তিমান
খ) পরম খুদী অনাদি ও অনন্ত
গ) পরম খুদীর সাথে সসীম খুদীর সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব নয়
ঘ) পরম খুদী নিত্য

উত্তর: গ

পরম খুদীর সাথে সসীম খুদীর সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব।

169. সাংখ্য মতে প্রমাণ কত প্রকার?

- ক) ২ খ) ৪
গ) ৩ ঘ) ৫

উত্তর: ৩

সাংখ্য মতে প্রমাণ তিন প্রকার : প্রত্যক্ষ(Perception), অনুমান(Inference) ও শব্দ (Testimony)।

170. বুদ্ধদেব দ্বিতীয় আর্য সত্যতে কার্যকারণের নিয়মকে কি নামে অভিহিত করেন?

- ক) প্রতীত্যসমুৎপাদ
খ) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার নিয়ম
গ) সম্যক নিয়ম
ঘ) দ্বাদশ নিদান

উত্তর: ক

কার্য-কারণ নিয়মে বুদ্ধদেব বিশ্বাসী, সেই নিয়মকে তিনি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বলিতেন। এই নিয়ম অনুসারে তিনি দুঃখের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।

171. "আমাকে যদি একটি মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক করা হতো,তাহলে প্রথমে সেই রাষ্ট্রকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতাম" - উক্তিটি কার?

- ক) আল্লামা ইকবাল খ) আল ফারাবী
গ) ইবনে রুশদ ঘ) শাহ ওয়ালীউল্লাহ

উত্তর: ক

ইকবাল চরম পুঁজিবাদের(extreme capitalism) বা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। তিনি একধরনের সমাজতন্ত্রের সমর্থন করেন।

172. কোন দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শন বলা হয়?

- ক) ন্যায় দর্শন খ) বেদান্ত দর্শন
গ) সাংখ্য দর্শন ঘ) মীমাংসা দর্শন

উত্তর: ক

'ন্যায়দর্শনের' প্রতিষ্ঠাতা হইলেন মহর্ষি গৌতম; তাঁহার আর এক নাম ছিল অক্ষপাদ। তাই ন্যায়দর্শনকে 'অক্ষপাদ-দর্শন'ও বলা হয়।

173. ন্যায় মতে পদার্থ কত প্রকার?

- ক) ৮ খ) ১৬
গ) ১২ ঘ) ৬

উত্তর: খ

পদের অর্থের নাম পদার্থ, অর্থাৎ কোন পদ দ্বারা যে অর্থ নির্দিষ্ট হয়, তাহাই পদার্থ। ন্যায়'-মতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার

174. বুদ্ধের মতে দুঃখ হতে নিবৃত্তির মার্গের স্তর কয়টি?

- ক) ৮ খ) ১২
গ) ৬ ঘ) ৪

উত্তর: ক

বুদ্ধদেবের চতুর্থ আর্য-সত্য হইল 'দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গ' বা পথও আছে। এই পথের আটটি অঙ্গ বা স্তর আছে। তাই এই পথকে বৌদ্ধদর্শনে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' (Eight-fold_path) বলা হয়।

175. বেদের কোন অংশে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা রয়েছে?

- ক) মন্ত্র খ) উপনিষদ
গ) ব্রাহ্মণ ঘ) সংহিতা

উত্তর: খ

প্রত্যেক বেদের আবার তিনটি অংশ; যথা: মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। মন্ত্র বা সংহিতা অংশে আছে বেদের মন্ত্রগুলি, ব্রাহ্মণ অংশে আছে সংহিতায় উক্ত যাগযজ্ঞাদির বিবরণ ও ব্যাখ্যা, আর উপনিষদে আছে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা।

176. শ্রীভাষ্য - গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

- ক) রামানুজ খ) শংকর
গ) গৌতম বুদ্ধ ঘ) মহাবীর

উত্তর: ক

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক। ‘বেদান্ত সংগ্রহ’, ‘শ্রীভাষ্য’, ‘বেদান্তদীপ’, ‘বেদান্তসার’ প্রভৃতি গ্রন্থ রামানুজ রচনা করেছেন।

177. বৌদ্ধমতে দুঃখের মূল কারণ কি?

- ক) সংস্কার খ) অবিদ্যা
গ) ভবব ঘ) তৃষ্ণা

উত্তর: খ

বৌদ্ধমতে দুঃখের কারণ ১২ টি (দ্বাদশ নিদান)। অবিদ্যা দুঃখের মূল কারণ।

178. বুদ্ধের শিষ্যগণ ত্রিপিটক গুলো কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন?

- ক) পালি খ) সংস্কৃত
গ) অসমিয়া ঘ) উড়িয়া

উত্তর: ক

বুদ্ধদেবের তিনজন প্রিয় প্রিয় শিষ্য তাঁহার উপদেশাবলীকে তিনটি গ্রন্থে পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এই তিনটি গ্রন্থ ‘ত্রিপিটক’ (তিনটি পেটিকা) নামে খ্যাত। এই পিটকগুলির নাম—বিনয় পিটক, সুত্ত-পিটক এবং অভিধম্ম-পিটক।

179. The Reconstruction of Religious Thought in Islam - গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

- ক) শাহ ওয়ালীউল্লাহ খ) ইবনে রুশদ
গ) আল্লামা ইকবাল ঘ) আল গাজালী

উত্তর: গ

আল্লামা ইকবালের গ্রন্থ: “আসরারে খুদী” (১৯২৫) এবং রুমুজ-ই-বিখুদী (১৯২৭), The Reconstruction of Religious Thought in Islam.

180. হুজ্জাতুল ইসলাম - অর্থ কি?

ক) ইসলামের সাক্ষী খ) ইসলামের অনুসারী

গ) ইসলামের রক্ষক ঘ) ইসলামের ভিত্তি

উত্তর: গ

ইমাম আল গাজালীর উপাধি, “হুজ্জাতুল ইসলাম - ইসলামের রক্ষক”

181. আল গাজালী নফস(আত্মাকে) কয় ভাগে ভাগ করেন?

- ক) ২ খ) ৪
গ) ৩ ঘ) ৫

উত্তর: গ

আলা গাজালীর মতে নফস ৩ রকমের:

১. ন্যাসে আম্মারা(প্রবৃত্তি প্রবণ) ২. ন্যাসে লাওয়ামা(অনুশোচনামূলক), ৩. ন্যাসে মুতমাইন্না (প্রশান্ত আত্মা)

182. আল গাজালীর কার্যকারণ সম্পর্কিত ধারণার সাথে কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়?

- ক) দেকার্ত খ) হিউম
গ) লক ঘ) রাসেল

উত্তর: খ

আল গাজালীর দার্শনিক পদ্ধতির(সংশয় দিয়ে শুরু)

দিক থেকে দেকার্তের সাথে মিল থাকলেও তার কার্যকারণ তত্ত্বের সাথে হিউমের মতে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাদের মতে কার্য ও কারণের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই

183. ন্যায় দর্শনের মূল গ্রন্থের নাম কি?

- ক) ন্যায়শাস্ত্র খ) ত্রিপিটক
গ) তত্ত্বচিন্তামনি ঘ) ন্যায়সূত্র

উত্তর: ঘ

ন্যায় দর্শনের মূল গ্রন্থ মহর্ষি গৌতম রচিত “ন্যায়সূত্র”

184. নৈয়ায়িকদের মতে অনুমানে কয়টি পদ থাকে?

- ক) ৪ খ) ৩
গ) ৫ ঘ) ২

উত্তর: খ

নৈয়ায়িকদের মতে অনুমানে ৩ টি পদ থাকে: পক্ষ, সাধ্য ও হেতু বা লিঙ্গ বা সাধন

185. ন্যায় দর্শনে ব্যক্তি অনুসারে অনুমানকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক) ৪

খ) ২

গ) ৫

ঘ) ৩

উত্তর: ঘ

ন্যায় দর্শনে ব্যক্তি অনুসারে অনুমানকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে: পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

186. দ্বৈত বেদান্তের প্রবর্তক কে?

ক) শংকর

খ) রামানুজ

গ) মহাবীর

ঘ) মাধ্বাচার্য

উত্তর: ঘ

বেদান্তের প্রধান মত তিনটি: শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত ও মাধ্বাচার্যের দ্বৈত বেদান্ত

187. বেদান্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) বাদ্ নারায়ণ

খ) রামানুজ

গ) মহাবীর

ঘ) মাধ্বাচার্য

উত্তর: ক

বেদান্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি বাদ্ নারায়ণ (বেদব্যাস)

188. "ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা" - কোন মতের মূল কথা?

ক) দ্বৈত বেদান্ত

খ) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

গ) অদ্বৈত বেদান্ত

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: গ

শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের মূলকথা- "ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা"

189. শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে "মায়ার আবরণশক্তির" কাজ কি?

ক) জগৎ সৃষ্টি

খ) সত্য প্রকাশ করা

গ) সত্যকে আড়াল করা

ঘ) সবগুলোই

উত্তর: গ

শংকরের মতে জগৎ মায়ার সৃষ্টি, মায়ার আবরণ শক্তি ব্রহ্ম তথা সত্যকে আড়াল করে।

190. "মানুষের অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই, সমগ্র মহাবিশ্বের এমন কিছু নেই, যা দর্শনের আওতায় পড়ে না বা যা নিয়ে দার্শনিক অনুসন্ধান চালানো হয় না" - কার উক্তি?

ক) প্লেটো

খ) রাসেল

গ) কেয়ার্ড

ঘ) কান্ট

উত্তর: গ

দর্শনের উপর্যুক্ত সংজ্ঞা কেয়ার্ড(Caird) প্রদত্ত।

191. "Groundwork of the Metaphysics of Morals" গ্রন্থটির লেখক কে?

ক) রাসেল

খ) মিল

গ) ম্যুর

ঘ) কান্ট

উত্তর: ঘ

"Groundwork of the Metaphysics of Morals" - গ্রন্থটি ইমানুয়েল কান্ট কর্তৃক রচিত।

192. জিসি দেবের দর্শনকে কি নামে অভিহিত করা হয়?

ক) বাস্তববাদ

খ) পরম ভাববাদ

গ) সমন্বয়ী ভাববাদ

ঘ) জড়বাদ

উত্তর: গ

গোবিন্দ চন্দ্র দেবের ভাববাদকে সমন্বয়ী ভাববাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

193. সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা কে?

ক) মিল

খ) বেত্তাম

গ) এরিস্টটল

ঘ) রুশো

উত্তর: ঘ

জন লক, হবস ও রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা। এ সংক্রান্ত রুশোর গ্রন্থ The Social Contract

194. The Life Divine - গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক) অরবিন্দ

খ) বিবেকানন্দ

গ) রামমোহন রায়

ঘ) রামকৃষ্ণ

উত্তর: ক

অরবিন্দ ঘোষের গ্রন্থসমূহ: The Life Divine, On Himself, The Synthesis of Yoga

195. অরবিন্দের দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?

ক) মোক্ষ লাভ

খ) জ্ঞান লাভ

গ) দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠা

ঘ) জাগতিক সুখ লাভ

উত্তর: গ

অরবিন্দের দর্শনের মূখ্য বিষয় পৃথিবীতেই দিব্যজীবন দর্শন।

196. ন্যায়দর্শন মতে ঈশ্বর জগতের.....

ক. উপাদান কারণ

খ. নিমিত্ত কারণ

গ. কারণ নয়

ঘ. উভয় কারণ

উত্তর: খ

ন্যায়দর্শন মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নয়।

